শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীবিধুভূষণ সরকার।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীবিধুভূষণ সরকার প্রণীত।

—:*:—

প্রথম খণ্ড।

—:*:—

কলিকাতা,—নং ৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে

শ্রীঅধরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২২ সাল।

[মূল্য দেড় টাকা।

ফেণী নোয়াখালি হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচনা।

—০ঃ✻ঃ০—

বেশীদিনের কথা নয়, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যিনি আমাদের এই বাংলাদেশে নদীয়ানগরে আবির্ভূত হইয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের ধর্ম্ম-প্রচারের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহার পুণ্যকাহিনী জীবমাত্রেরই আস্বাদনের বস্তু। শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তি। তন্মধ্যে যে শক্তি দ্বারা জীবকে আহ্লাদ দেওয়া হয়, যে শক্তির সাহায্যে মানব জড়জগতের অনিত্য আমোদ ভুলিয়া যাইয়া, শ্রীভগবানের সঙ্গজনিত নিত্যশুদ্ধ আনন্দ-রস প্রাপ্ত হয়, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই এই শক্তি আংশিকরূপে বর্ত্তমান; শ্রীভগবানে ইহা পূর্ণরূপে বিরাজমান। ভগবদ্ভজনের যে বিভিন্ন পন্থা আছে, তাহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, একটী ঐশ্বর্য্যের পন্থা, অন্যটী মাধুর্য্যের পন্থা। ঐশ্বর্য্যের পন্থানুসরণকারী ভক্তবর্গ শ্রীভগবান্‌কে ভয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনে করেন, পাপ করিলে তিনি কঠোর দণ্ড প্রদান করেন, এবং পুণ্য করিলে তাহার যথোচিত পুরস্কার দিয়া থাকেন। তাই, তাঁহারা পুরুষকার ও স্বাবলম্বন দ্বারা নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রতিদান স্বরূপ শ্রীভগবানের নিকট স্বীয় সুখসাধনের বস্তু দাবী করিয়া থাকেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভজন নহে, প্রকারান্তরে আত্মভজন। ইহাতে জীব নিত্য আনন্দ প্রাপ্ত হয় না মাধুর্য্যের পন্থানুসরণকারী ভক্তগণ শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকেন ও তাঁহাকে অহৈতুক ভালবাসেন। এই শ্রেণীর ভাগবতগণ মনে করেন, শ্রীভগবান্ প্রেমময়, তিনি লীলার নিমিত্ত জগৎখানি বিচিত্র করিয়া সৃজন করিয়াছেন, জীব তাঁহার হাতে ক্রীড়াপুত্তলি। ইঁহারা পাপ-পুণ্য এবং ভালমন্দ বিচারের অতীত। ইঁহারা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন যে, শ্রীভগবান্ জীবকে বড় ভালবাসেন, তাই, তাঁহারা প্রাণখানি

শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিয়া দেন ও তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসেন। এখানে ভীতি নাই,—শুদ্ধ প্রীতি। ইহাতেই জীবের পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, এ আনন্দের অবধি নাই। ঈদৃশ প্রীতির ভজন জীবের গোচর করিবার নিমিত্ত, শ্রীভগবান্ যে জীবের অতি নিজজন, তাহা জীবকে জানাইবার জন্য, এই শুদ্ধ মধুর ভজন যে, কোন বিধি নিষেধের অপেক্ষা করে না, তাহা জীবের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য, শ্রীগৌরাঙ্গ এই মরজগতে আগমন করেন ও তাঁহার পূর্ণ হ্লাদিনীশক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে নদীয়ানগরে আবির্ভূতা হন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ যে ভগবদ্ভজনের মধুর পন্থা জগতে স্থাপন করেন, তাহার সহায়তা করেন। সুতরাং শ্রীভগবান্‌কে নিজজন মনে করিয়া যাঁহারা প্রেম দ্বারা মধুর ভাবে ভজনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের এই নবদ্বীপময়ী বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত হইতে হইবে। কতশত পতিব্রতা রমণী আছেন, তাঁহাদের পূত-চরিত পাঠ করিয়া, সেই আদর্শে জীবন গঠন করিলে রমণীগণ ইহজগতে উন্নতি লাভ এবং সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন, এবং পরজগতে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে অথবা জন্মান্তরে বাঞ্ছিত পতি প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিলে ভগবৎসঙ্গ-জনিত পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইবেন। ইনি যে কেবল রমণীকুলেরই আদর্শ, তাহা নহে, ইনি জীবমাত্রেরই অনুসরণীয়া। ভূলোকে অবস্থান করিয়া সংসারের মধ্য দিয়া কিরূপ সহজ মধুর ভাবে শ্রীভগবানের সঙ্গসুখ উপভোগ করা যায়, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তাহা পূর্ণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার আখ্যায়িকা পাঠে ইহার যাথার্থ্য সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। তাঁহার কার্য্যাবলী পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা জীবের অসাধ্য। তবে নিজকে পবিত্র করিবার জন্য তাঁহার পরম পুণ্যকাহিনীর একদেশ মাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। অলমতিবিস্তরেণ।
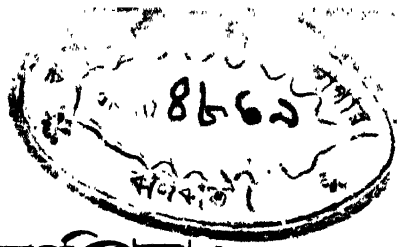
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

১

বসন্ত পঞ্চমী বড় মধুর তিথি। এই দিনে প্রকৃতি নূতন মাধুরী লইয়া জীবের মনোরঞ্জন করে এবং প্রাণে অপ্রাকৃত নব নব ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়। এই জন্য এই তিথিকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়। এই দিন কোকিল পঞ্চম স্বরে গাহিয়া প্রেম জাগাইয়া দেয়, মলয় পবন প্রবাহিত হইয়া অপ্রাকৃত প্রেমময় রাজ্যের সংবাদ লইয়া আইসে, বিচিত্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য ঘোষণা করে, নবকিশলয় উদ্গত হইয়া চিরসুন্দরের নবীন মাধুর্য্য বিকাশ করে, সুনীল নির্ম্মল আকাশ আপন শোভা বিস্তার করিয়া হৃদয়খানি পরম পবিত্র করিয়া দেয় এবং অনন্তের দিকে লইয়া যায়, স্রোতস্বিনীসমূহ ধীর মধুর নৃত্য করিয়া কুলুকুলুনাদে প্রেমময়ের কীর্ত্তন করে। এ হেন মধুময়ী তিথিতে পরম প্রেমমূর্ত্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জগতে অবতীর্ণ হন। এই দিনে সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী পরমজ্ঞানস্বরূপিণী দেবী সরস্বতীর পূজা হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবী জীবের অজ্ঞানতমঃ নাশ করিয়া জ্ঞানালোক প্রদান করেন। ইঁহার কৃপায় জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইলে, শ্রীভগবান্ কি বস্তু, জীব তাহা জানিতে সমর্থ হয়, এবং তাহার পরই জীবের ভক্তি ও প্রেমের উদ্রেক হয়, তখন মানব পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম পাইয়া ধন্য হইয়া যায়। শ্রীশ্রীভগবদ্ভজনের এই স্তর বুঝাইবার জন্যই এই সরস্বতী পূজার দিনে জ্ঞানালোক প্রকাশের পর পরিপূর্ণ প্রেমস্বরূপিণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া জগতে প্রকাশিত হইলেন; এবং এই জড়জগত যে চিদানন্দ রাজ্যেরই ছায়ামাত্র, ও জগতে যে কামমিশ্রিত প্রেমের খেলা দেখা যায়, তাহারই পরিপক্কাবস্থায় যে কাম-

গন্ধহীন নির্ম্মল, বিশুদ্ধোজ্জ্বল প্রেম রহিয়াছে, তাহা জীবকে জানাইবার নিমিত্তই এই মধুময়ী তিথিতে প্রকৃতির মধ্য দিয়া অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য বিস্তার করাইয়া ও জীবের হৃদয়ে গোলোকের অপার প্রেম জাগাইয়া দিয়া পরম প্রেমময়ী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জীবের গোচর হইলেন। তাই, এই তিথি জীবের নিকট পরম শুভ তিথি, এই দিনের স্মরণে পর্য্যন্ত প্রাণে অপার আনন্দের সঞ্চার হয়।

১৪১৭ শকে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দেবী জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সনাতন মিশ্র, মাতার নাম মহামায়া। সনাতন পণ্ডিতও মহাভাগবত ছিলেন এবং দেবী মহামায়াও অতিশয় ভক্তিমতী ও শুদ্ধাচারিণী বলিয়া সকলের শ্রদ্ধার্হ ছিলেন, পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের জন্মস্থান বরিশাল জেলায় ছিল। ইনি সাধন ভজনের সৌকর্য্যার্থে সুরধুনীতীরে নবদ্বীপনগরে সপরিবারে যাইয়া বসতি করেন। এই নদীয়াধামেই তাঁহার সকল সাধন ভজনের ফলস্বরূপ জীবের পরম কল্যাণদায়িনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া অবতীর্ণ হন।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স দশ বৎসর, এই দশ বৎসরের মধ্যে নবদ্বীপ নগরে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। বালক নিমাই ক্রন্দনচ্ছলে নরনারী সকলকে হরিনাম লওয়াইয়াছেন। নিমাই যখন পঞ্চমবর্ষের শিশু, তখন তিনি 'হরিবোল' বলিয়া হাতে তালি দিয়া, কখন বা বাহু তুলিয়া মধুর নৃত্য করিতেন, আর নদীয়াবাসী বালকবৃন্দ সেই নৃত্যে যোগদান করিতেন; তাহাতে এক অপূর্ব্ব আনন্দের অবতারণা হইয়াছে। অনেকস্থলে বৃদ্ধগণও সকল গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং এক অব্যক্ত আনন্দরসের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়াছেন। নগরের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বালকবৃন্দের মধ্যে "হরিবোল" ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছে। নদীয়ার বালকগণ তাহাদের খেলার

সাথী নিমাইচাঁদ ছাড়া আর কিছু জানে না। শুধু বালকগণ কেন, নিমাইয়ের "হরিবোল" ধ্বনিতে, মধুর নৃত্যে এবং ভুবনদুর্লভ রূপমাধুরীতে নরনারী মাত্রেরই হৃদয়ক্ষেত্র কোমল ও নির্ম্মল হইয়াছে। কেবল যে সকল যুবকবৃন্দ শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া শুষ্কতর্ক করিতে করিতে কর্কশ হৃদয় হইয়াছে, তাহারা তখনও শাস্ত্র লইয়াই রহিল, প্রাণের প্রিয়বস্তুর সঙ্গ-জনিত আনন্দরসের আস্বাদন আর প্রাপ্ত হইল না। এই গৌর-গোপাল-বিগ্রহ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। আবার নবমবর্ষ বয়সে যজ্ঞোপবীতের সময় ইঁহার শ্রীঅঙ্গ দিয়া যখন অপার জ্যোতিঃ বহির্গত হইল এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য, ন্যায়-শাস্ত্রে অতিশয় পারদর্শী পণ্ডিত জগদীশ চন্দ্র, বৈদ্যকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীমন্ মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি সুধীবর্গ এই জ্যোতির অভ্যন্তরে একটী পরম রমণীয় বস্তু দর্শন করিয়া ইঁহাকেই অনন্ত জ্যোতির আধার পরমপুরুষ মনে করিয়া ইঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন, তখন নদীয়াবাসী সকলেই ইঁহাকে একটী অপার্থিব বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু, তথাপি বহুকালের সংস্কারবশতঃ এবং শ্রীভগবানেরই ইচ্ছাক্রমে তাহারা বস্তুটী তখন সম্পূর্ণ-রূপে চিনিতে পারে নাই। সকলেরই চিত্ত ইঁহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু, কেহ বা কর্ম্মের শৃঙ্খলে বদ্ধ বলিয়া, কেহ বা বিদ্যার গৌরবে মত্ত হইয়া, কেহ বা ধন-লিপ্সা প্রভৃতি পার্থিব আকাঙ্ক্ষায় বহির্ম্মুখ বলিয়া এই আকর্ষণের হেতু নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্য দিকে আবার এই দশ বৎসর বয়সে শ্রীগৌরচন্দ্র শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া বিদ্বজ্জন-সমাজে এরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য, অশেষ বুদ্ধিমত্তা ও অপার জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সকলেই তাঁহার অলৌকিকত্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। নবদ্বীপ ভারতবর্ষের মধ্যে তখন বিদ্যার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রস্থল। শাস্ত্রের কূট তর্ক লইয়াই সকলে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিত, এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ প্রদর্শন

করিয়া যুক্তিতর্কদ্বারা এক শাস্ত্র অন্য শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করাই তখন পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ছিল। এই সময়ে সর্ব্বশাস্ত্রের সুমীমাংসা শচীর দুলাল নিমাইচাঁদের অলৌকিক ধীশক্তি দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বে যে নিমাইয়ের অপ্রাকৃত রূপমাধুরীতে ও মধুরাতিমধুর চাপল্যে সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং এই আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কি এক অজানিত শক্তি দ্বারা অনেকেরই ভগবদ্ভক্তি জাগরিত হইয়াছিল, নিমাই-চাঁদের অলৌকিক জ্ঞানৈশ্বর্য্য দর্শনে উহা আরও দৃঢ় বদ্ধমূল হইল।

বালকগণ কত খেলাই খেলে। কিন্তু নিমাইচাঁদ এক নূতন খেলার সৃষ্টি করিলেন। এই খেলার নাম "হরিবোল" খেলা। তিনি "হরিবোল" বলিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেন, আর নদীয়ার বালকবৃন্দ অপূর্ব্ব এই ক্রীড়ায় যোগদান করিতেন এবং শত শত বালক লইয়া নিমাইচাঁদ "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে নদীয়া নগরে বেড়াইতেন। শত শত বালক যখন এইরূপ বাহু তুলিয়া অতি মধুরকণ্ঠে "হরিবোল" ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে নগরে ভ্রমণ করিতেন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত; নিমাইয়ের 'হরিবোল' শব্দ দিয়া যেন এক অপার্থিব শক্তি চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইত এবং সেই ধ্বনিতে সকলে এক অমৃতরসে সিঞ্চিত হইত। নদীয়াধামে তাই কঠোরতার পরিবর্ত্তে প্রফুল্লতা আসিয়াছে এবং নগরটী এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। এই সময় দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া জগতে আগমন করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার আগমনে নদীয়ায় একটী প্রবল তরঙ্গ সমুত্থিত হইল—নদীয়ায় ভক্তিস্রোত উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। প্রতিবেশী পুরনারীগণ আনন্দে অধীর হইলেন।

জ্যোতিঃসমুদ্ভাসিত এই মধুর মূর্ত্তিটী দেখিয়া সকলেই মনে করিল, ইনি এ জগতের বস্তু নহেন। স্বভাবতঃই সকলের চিত্ত এই শিশুটীর

দিকে আকৃষ্ট হইল। ইঁহার মাতা দেবী মহামায়ার সমবয়স্কা নারীগণ সন্তান অপেক্ষা এই শিশুটীর প্রতি অধিকতর স্নেহ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বীয় সন্তানকে এতদিন ভাল বাসিয়াছেন ; কিন্তু, সে স্নেহে হৃদয় এ পর্য্যন্ত পূর্ণ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় নাই, সেই স্নেহে কি এক সংকীর্ণতা ছিল। জগতের সেই মলিন স্নেহে তাহাদের হৃদয় তৃপ্ত হইত না। অপত্য স্নেহে অল্পাধিক পরিমাণে আত্মত্যাগ বা আত্মবিস্মৃতি আছে বটে ; কিন্তু স্নেহময়ী পুরনারীগণ এ পর্য্যন্ত এরূপ আত্মবিস্মৃতিজনিত পরমানন্দ উপভোগ করেন নাই ; তাঁহাদের অপত্যস্নেহ ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে স্বীয় সুখবাঞ্ছাও ছিল ; অল্পই হউক, অধিকই হউক, এই সুখবাঞ্ছাই শুদ্ধ, নিত্য আনন্দ প্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায় ; তাই, নারীগণ প্রকৃত আনন্দ প্রাপ্ত হন নাই, অথচ রমণী হইলেও বিদ্বজ্জন সমাজে শাস্ত্রালোচনার মধ্যে থাকিয়া পার্থিব স্নেহের অসারত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু, তাই বলিয়া তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে কঠোর শুষ্ক বৈরাগ্য ও জগতের প্রতি অশ্রদ্ধা স্থান পায় নাই। মায়িক ভালবাসায় যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর এবং অধিকতর চিত্তাকর্ষক প্রেমানন্দ লাভের জন্য হৃদয়ে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে ; এ পর্য্যন্ত এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু, আজ বিষ্ণুপ্রিয়ার দর্শনে তাঁহাদের হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত হইয়া গেল ; প্রাণ ভরিয়া বস্তুটী ভালবাসিতে সাধ হইল, এবং প্রাণে প্রাণে তাঁহারা বুঝিলেন যে, এ ভালবাসায় মায়ার লেশমাত্র নাই ; নরনারী সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, হৃদয় সরস রাখিয়া ভগবদ্ভজনের সহায়তার নিমিত্ত এই বস্তুটীর সমুদয় হইয়াছে।

পণ্ডিত সনাতন মিশ্র অতিশয় ধনবান্। এইটি তাঁহার প্রথম সন্তান। তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। নদীয়ায় অসংখ্য পণ্ডিতের বসতি। আজ কাল পণ্ডিতকে অনেকে লৌকিকতা রক্ষার নিমিত্ত অথবা সমাজে সুনাম

অর্জ্জন করিবার জন্য উপেক্ষার সহিত দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তখন পণ্ডিতগণও লোভপরায়ণ ছিলেন না, অর্থলিপ্সা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না, কারণ তাঁহারা সর্ব্বদাই শাস্ত্রালোচনায় বিব্রত থাকিতেন; ধনবান্‌গণও তাই এই নিরাকাঙ্ক্ষ শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণকে অতিশয় আগ্রহ সহকারে প্রচুর দান করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন; তদুপরি আবার যদি কোন পারিবারিক উৎসব হইত, তখন পরিবারের কর্ত্তা পণ্ডিত-গণকে আহ্বান করিয়া স্বীয় সাধ্যানুযায়ী যথোচিত দান করিতেন। সনাতন মিশ্রও তাই নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে মর্য্যাদানুরূপ অর্থ প্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ সজ্জনগণকে ধেনুদান, ভূমিদান প্রভৃতি দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন, দীনহীন ব্যক্তিবর্গকে বস্ত্রাদি দান করিলেন ও উদর পূর্ণ করাইয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি নানাবিধ দ্রব্য দ্বারা ভোজন করাইলেন। পণ্ডিতের গৃহে মহা-সমারোহের সহিত শিশুর জন্মোৎসব ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। সুমধুর গীতবাদ্যে এ উৎসব মধুরাতিমধুর হইয়াছিল। এই উৎসব এ জগতের নহে, তাই গন্ধর্ব্বগণ অলক্ষ্যে থাকিয়া এই গীতিকায় যোগদান করিয়াছিল, এবং দেবতাগণ এই সময় অশেষ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া নিজেরাও ধন্য মনে করিয়াছিল। আর এক কথা, এই উৎসব একমাত্র সনাতন মিশ্রের নহে। যিনিই উৎসবে আসিয়াছেন, তিনিই মনে করিয়াছেন যে, এই উৎসব তাঁহার। এ কন্যাটী কেবল মাত্র সনাতন মিশ্র ও মহামায়ার নহে। এটী সকলেরই স্নেহের পাত্রী। দশ বৎসর পূর্ব্বে নদীয়ার লোক জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীগৌরচন্দ্রের জন্মোৎসবে যে মহাসমারোহ দেখিয়াছিল, আজ পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহেও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মোৎসবে সেইরূপ মহোৎসব পরিদৃষ্ট হইল। জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি সেখানে আনন্দের অবধি ছিল না।

(২)

দিনের পর দিন যতই অতীত হইতে লাগিল, ততই কন্যাটীর শ্রীঅঙ্গ দিয়া এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। এ দিকে সমস্ত নদীয়ানগরে রাষ্ট্র হইল যে, সনাতন মিশ্রের গৃহে একটী অপার্থিব বস্তুর সমুদয় হইয়াছে, ইহার ভুবনদুর্লভ রূপ, দেবদুর্লভ জ্যোতিঃ, অলৌকিক মধুরিমা ; যে দেখে, সে-ই এক অপ্রাকৃত ভাবে আকৃষ্ট হয়। নদীয়া নগরে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি। কত পণ্ডিত, কত ধনী, কত জমীদার, কত রাজতুল্য অপার ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি বাস করেন, কার খবর কে নেয়। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময় মানুষের হৃদয় এক প্রকার নীরস হইয়া গিয়াছে। কেহ বা শাস্ত্রের কঠোর তর্ক লইয়া ব্যস্ত, কেহবা কর্ম্মের শৃঙ্খলে বদ্ধ এবং বিষহরি মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতির পূজা বা কোন ব্রত অথবা কোন কাম্য কর্ম্মকেই ধর্ম্ম মনে করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিত ; অন্যদিকে আবার মুসলমানগণের আধিপত্যে ও উৎপীড়নে হিন্দুগণ জর্জ্জরিত, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও ঘৃণিত হওয়ায় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে ; এবং মুসলমানগণের বিলাসিতায় প্রলুব্ধ হইয়া অনেকেই, এমন কি, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণও তাহাদের দাসত্ব করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। শাস্ত্র লইয়া, অর্থ লইয়া, সম্মান লইয়া, রাজ্য লইয়া, সেই বিরোধের দিনে সকলেই স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা স্থাপনে ব্যস্ত। তাই, প্রায় সকলের হৃদয়ই নীরস, কর্কশ হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্তিতে সকলে যেন এক নূতন রসে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। সকলে যেন এক অপ্রাকৃত রাজ্যের সংবাদ পাইল, তাই, উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর নরনারীগণই দলে দলে সনাতন মিশ্রের বাড়ী আসিয়া এই অপূর্ব্ব বস্তুটী দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

কন্যাটী সনাতন মিশ্রের প্রথম সন্তান। আরও ইনি পণ্ডিত মানুষ ;

তাই, তিনি পুত্র ও কন্যায় কোন প্রভেদ করিলেন না। বর্ত্তমান সময় দেখা যায় বটে যে, পুত্রের মুখ দর্শনে পিতার যেরূপ আহ্লাদ হয়, কন্যার জন্মগ্রহণে তদ্রূপ হয় না, কারণ পুত্র দ্বারা ইহকালে ভরণপোষণের আকাঙ্ক্ষা এবং পরকালে তদ্দত্ত পিণ্ড পাইয়া পরিতৃপ্ত হওয়ার আশা আছে। পিতার এই স্বার্থপরতাবশতঃ পুত্র তাঁহার নিকট যত প্রিয়, কন্যা তত প্রিয় নহে। তাই অনেক সময় দেখা যায়, পুত্রের উৎসবাদি যত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়, কন্যার উৎসবে তাহার তুলনায় কিছুই সমারোহ হয় না। কিন্তু, পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের মনে এরূপ পার্থক্যের ভাব উদয় হয় নাই। তিনি জানেন, পুত্র ও কন্যা একই উপাদানে গঠিত, সুখ দুঃখ উভয়েরই তুল্য, জগতে উভয়েরই প্রয়োজন, পুত্র কন্যা উভয়েরই সৃজন বিধির বিধান; এ বিধান উপেক্ষা করা অনুচিত। তাই, স্বার্থের অনুরোধে কাহাকেও তুচ্ছ করা আর কাহাকেও আদর করা সঙ্গত নহে। পণ্ডিতের ঈদৃশ জ্ঞান ছিল, তদুপরি আবার কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া যে শক্তি দ্বারা নদীয়াবাসী বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নরনারী সকলকে আকর্ষণ করিয়াছেন, পিতা সেই শক্তিতে ততোধিক আকৃষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং তিনি শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী অন্নপ্রাশনাদি কন্যার যাবতীয় উৎসবই মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গ যে রঙ্গ করিয়াছেন, বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াও এই বয়সে সেই লীলা করিলেন। তিনি 'হরিবোল' বলিয়া বাহু তুলিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেন, আর প্রতিবেশী বালকবৃন্দও সেই সঙ্গে মধুরকণ্ঠে 'হরিবোল' বলিয়া বাহু তুলিয়া অপ্রাকৃতভাবে নৃত্য করিতেন। তাঁহাদের এতাদৃশ অপার্থিব ভাব দেখিয়া জীব মাত্রেই মুগ্ধ হইত। তাঁহাদের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর ধ্বনিতে জীবের কর্ণে যেন সুধাধারা ঢালিয়া দিত। বালিকাটীর অপূর্ব্ব ভাব ও মধুরিমা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিল যে, এ বস্তুটী কালে অতিশয় ভক্তিমতী হইবে; কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞ, শাস্ত্রদর্শী, তাঁহারা ইঁহার

"হরিবোল" ধ্বনিতে এত মাদকতা ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষতা এবং হরিনামে ইঁহার এতাদৃশ প্রীতি অবলোকন করিয়া শাস্ত্রের কথা স্মরণ করিলেন, এবং মনে মনে ঠিক করিলেন যে, পূর্ব্বকালে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে শ্রীরাধা বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অধীরা হইয়া নিশিদিন অশ্রুপাতে কাল কাটাইয়া ছিলেন ও হরিনামের ধ্বনিতে আকুল-চিত্তা হইতেন, ইনিই সেই শ্রীরাধা হইবেন! তাই পিতা মাতা স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ পূর্ব্বেই ইঁহার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া রাখিয়াছেন! ফলতঃ বালিকাটির হরিনামে অপূর্ব্ব প্রীতি এবং অপার্থিব জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হাসি মাখা মুখখানি অবলোকন করিয়া অনেকেরই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, জীবের অন্তর্নিহিত হরিভক্তি জাগ্রত করিবার জন্য, এই ভক্তি ও প্রীতির মূর্ত্তিটী জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে রসের অবতরণা করিয়া নদীয়ার বালকবৃন্দকে লইয়া নদীয়াবাসী জনগণের মধ্যে বিস্তার করিতেছিলেন, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া বালিকাবৃন্দ লইয়া নারীগণের মধ্যে সেই রস আরও চিত্তাকর্ষক করিয়া উহার পরিপুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। সেই বিদ্যা ও অর্থের গৌরবের দিনে, পার্থিব সম্মান লইয়া ব্যতিব্যস্ততার যুগে, ভগবদ্বহির্ম্মুখতার কালে, এই দুইটী বস্তুর দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের দৃষ্টি নিপতিত হইল, ইহা একটু ভাবিবার বিষয় বটে। এই দুইটী বস্তুর একটী নিমাই, অপরটী বিষ্ণুপ্রিয়া।

বালিকাটীর মধ্যে যতই কেন অলৌকিক শক্তি ও অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ পরিদৃষ্ট হউক না, পিতা মাতা কখনও তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী অপ্রাকৃত দেবী বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। তাঁহারা বাৎসল্যরসে অভিভূত, তাই বালিকাটীর প্রতি তাঁহাদের সন্তানভাব ব্যতীত আর কোন ভাবের উদয় হইত না। কিন্তু তাঁহাদের অপত্যস্নেহ অতি গভীর, অতি উচ্চ, অতি পবিত্র। এ স্নেহে সংকীর্ণতার লেশ নাই, আত্মসুখবাসনার গন্ধ নাই। এ স্নেহে

কেবল নিজেরাই তৃপ্ত নহেন, ইহাতে অন্যকেও পরিতৃপ্ত করে এবং অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দরস আস্বাদনের অধিকার দেয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হিন্দুরমণীগণের মধ্যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল। তখন সংস্কৃত শিক্ষার প্রাবল্য ছিল। উচ্চবংশীয় বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রায় প্রত্যেক রমণীই শাস্ত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করিতে পারিতেন। যিনি সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন না করিয়াছেন, তিনিও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের নিকট শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতেন। গঙ্গার ঘাটে রমণীগণ স্নানার্থ, কিম্বা জল আনিবার নিমিত্ত মিলিত হইলে শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। বিদুষী রমণীগণ সম্মিলিত হইয়া অধ্যাত্মচর্চ্চা করিতেন। ভারতের মধ্যে তখন শিক্ষার প্রধানকেন্দ্র নদীয়ানগরে শিক্ষিতা রমণীর সংখ্যা অধিক ছিল। বিদ্বান্ ব্যক্তির সন্তান মূর্খ হইলে তাঁহারই ত্রুটীর নিমিত্ত তিনি পণ্ডিতসমাজে নিন্দার ভাজন হইতেন। পণ্ডিত সনাতন মিশ্র অতিশয় বিদ্বান, শাস্ত্রে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তাই তাঁহার পরম আদরের ধন, স্নেহের পুত্তলী, কন্যারত্নের শিক্ষার ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত ইঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করিতে পিতা যেরূপ যত্ন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে পণ্ডিত করিতে পারিলে পিতা যেরূপ স্বীয় কার্য্য সম্পাদন-জনিত আনন্দ অনুভব করেন, সনাতন মিশ্রও কন্যার শিক্ষাবিষয়ে তদনুরূপ যত্ন করিতে লাগিলেন এবং বালিকাটী শিক্ষায় যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, পিতাও ততই সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন। বালিকাটীর এই একটী বিশেষত্ব ছিল যে, ইনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠ আয়ত্ত করিতে পারিতেন এবং একবার ইঁহাকে যাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইত, তাহা তিনি অতিশয় মনোযোগের সহিত শুনিতেন বলিয়া

সম্যক্‌রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। শুধু তাহাই নহে, ইনি পিতার নিকট যাহা শিক্ষা করিতেন, ইঁহার সমবয়স্কা বালিকাগণকে তিনি সেই শিক্ষা প্রদান করিতেন। সেই সময় কোন বালিকা-বিদ্যালয় ছিল না। পুত্রগণ টোলে পড়িতেন, কন্যাগণ স্ব স্ব পিতা মাতা বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া বালিকাগণের শিক্ষার নিমিত্ত একটী নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন। তিনি টোল বা বিদ্যালয় খুলিলেন না বটে, কিন্তু প্রতিবেশী বালিকাগণ তাঁহার রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া ও তাঁহার মধুর প্রীতিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট সকলে মিলিত হইত, তিনি পিতার নিকট যাহা শিখিতেন তাহাই অতি যত্ন ও আগ্রহ সহকারে সকলকে শিখাইতেন। বালিকাগণও তাঁহার গুণে এত মুগ্ধ যে, তাঁহারা নির্ব্বিচারে তাঁহার কথা শুনিতেন। এই শিক্ষাটী তাঁহারা কঠোর মনে না করিয়া বরং অতি আনন্দপ্রদ বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপে বালিকাগণের মধ্যে শিক্ষার এক নূতন প্রণালী প্রচলিত হইল। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ইহার প্রবর্ত্তয়িত্রী।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপলাবণ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, অন্যদিকে আবার তেমনি গুণরাশি ও বিদ্যা এবং জ্ঞান বিকাশ পাইতে লাগিল। শরীরের কান্তি শুদ্ধ কাঞ্চন বর্ণ। সেই সময়ের একজন গ্রন্থকার বলেন যে, স্বর্ণ লক্ষবার পোড়াইয়া শুদ্ধ করিলে তাহা হইতে যে এক উজ্জ্বল দীপ্তি নির্গত হয়, তাহার বর্ণ যেরূপ মধুর, বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীঅঙ্গের রূপলাবণ্য সেই দীপ্তি ও সেই বর্ণকে পর্য্যন্ত পরাজয় করে। চক্ষুঃ দুইটী পদ্মপলাশসদৃশ, ইহা হইতে যেন এক অপূর্ব্ব তেজঃ বহির্গত হয়। ভ্রূযুগল অতি সুন্দর, ললাট উন্নত, কেশ কুঞ্চিত, মুখখানি যেন কুন্দে কাটা। ইহার উপরে আবার সুরঙ্গ অধরে সর্ব্বদাই মধুর হাসি, প্রতি অঙ্গ দিয়া লাবণ্য ক্ষরিত হইতেছে।

তিনি যে স্থান দিয়া হাটিয়া যান, সে স্থান রক্তিম আভায় রঞ্জিত হয়, মধুর চঞ্চলতাবশতঃ তিনি যখন দৌড়িয়া যান তখন যেন বিদ্যুৎ খেলিতে থাকে। বিদ্যুতের আভায় মানবের চক্ষুঃ ঝলসিয়া যায় কিন্তু ইঁহার শ্রীঅঙ্গের আভায় জীব মধুরভাবে আকৃষ্ট হয়, পরন্তু ইহা এক অজ্ঞানিত অপ্রাকৃত, রাজ্যের খবর আনিয়া দেয়। কোন রূপে আকর্ষণ আছে, তাহাতে স্থায়িত্ব নাই, কোন লাবণ্যে মাদকতা আছে, তাহাতে প্রাণের আরাম নাই, কারণ তাহা ভাবপরিশূন্য জগতের মলিন, পরিপূর্ণ, কোন রূপকান্তিতে মোহ আছে, তাহা বন্ধনের কারণ। কিন্তু দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপলাবণ্যে এক মাধুর্য্য রহিয়াছে, উহাতে জীবের চিত্ত নির্ম্মল হয়, এক অপ্রাকৃত চিন্ময় ভাবের উদয় করিয়া দেয়। যিনিই রূপখানি দর্শন করিতেন, তিনিই প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন, এ রূপ এ জগতের নয়, স্বর্গেও এরূপ সম্ভবে না, ঊর্দ্ধে—অতি ঊর্দ্ধে এ রূপের অবস্থান ; সেই রূপের আদর্শ হইতেই জগতের যাবতীয় রূপ উদ্ভূত হইয়াছে, এই মায়িক জগতে পরিদৃশ্যমান যাবতীয় রূপ সেই রূপেরই ছায়া মাত্র ; কিন্তু জড়জগতে আসিয়া সেই রূপ মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই জীবকে রূপের প্রকৃত আস্বাদন করাইবার জন্য শুদ্ধ, নিত্য অপার রূপলাবণ্যরাশি মূর্ত্তির আকারে জীবের গোচর করা হইয়াছে।

মানুষ যতই কেন সুন্দর হউক না, রূপের সহিত গুণরাশির সমাবেশ না হইলে প্রকৃত সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় না। গুণরাশি আবার ভক্তিপ্রীতি-মণ্ডিত না হইলে কোন গুণই চিত্তাকর্ষক হয় না। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এক দিকে যেমন রূপের অনন্ত উৎস ছিলেন, অন্যদিকে আবার তেমনি তাঁহাতে গুণরাশির অনন্ত বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার পিতৃমাতৃ-ভক্তি, গুরুজনে সম্মান, শিশুদের প্রতি স্নেহ, সমবয়স্কাগণের সহিত প্রীতি, মধুর বিনয়, বিদ্যায় অনুরাগ, বালিকাসুলভ চপলতামিশ্রিত লাজুকতা, কর্ত্তব্যকার্য্য

সম্পাদনে দৃঢ়তা, দীনজনে দয়া এবং সর্ব্বোপরি শ্রীভগবানে ভক্তি,—সকলই অপূর্ব্ব। তাঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ হইত। যিনিই ইঁহার গুণের পরিচয় পাইতেন, তিনিই প্রাণ দিয়া ইঁহাকে ভালবাসিতেন। ইঁহার এখন দশ বৎসর। এই বয়সে তিনি প্রত্যহ তিনবার সুরধূনীতে স্নান করেন; তুলসীর অর্চ্চনা করেন, শ্রীভগবানের নিকট করজোড়ে ভক্তি প্রার্থনা করেন এবং পিতার প্রতিষ্ঠিত গৃহ-দেবতার সেবা করিয়া থাকেন।

কন্যার এতাদৃশ রূপলাবণ্য, গুণরাশি এবং শ্রীভগবদ্ভক্তি দেখিয়া পিতা মাতা যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। এখন তাঁহারা উপযুক্ত বর সন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন পণ্ডিতের প্রতি সকলেরই সমধিক শ্রদ্ধা ছিল। পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট কন্যা সমর্পণ করিতে পারিলে পিতা নিজকে নিজে ধন্য মনে করিতেন এবং সমাজেও তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হইতেন। ঈদৃশ রূপবতী, বিদুষী, গুণশালিনী এবং সর্ব্বোপরি ভক্তিমতী কন্যার উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিয়া পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। পণ্ডিত সনাতন মিশ্র তাই একটু চিন্তিত হইলেন। কিন্তু সনাতনও পরম ভক্তিমান্। শ্রীভগবানে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। তিনি জানেন, শ্রীভগবানই সকলের নিয়ন্তা; তিনি যখন কৃপা করিয়া তাঁহাকে এতাদৃশ কন্যারত্নের পিতা হইবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন, তখন উপযুক্ত জামাতা পাইবার সুযোগও তিনি প্রদান করিবেন। পণ্ডিত সনাতন মিশ্র, তাই, নিমিত্তমাত্র হইয়া পাত্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

(৩)

এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স বিংশতি বৎসর। ইতোমধ্যে তিনি ভুবনবিদিত পণ্ডিত হইয়াছেন। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া বিদ্যার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপনগরে অগণিত বিদ্বজ্জন-সমাজে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া টোল সংস্থাপন করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বে এত

অল্প বয়সে কেহ অধ্যাপক হইয়া অন্যের শিক্ষার ভার লইতে সাহস করেন নাই। তাঁহার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তায় নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী স্তম্ভিত। অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া বিদ্যার ভাণ্ডার খুলিয়া দেন। অন্য অধ্যাপকের নিকট ছাত্রগণ যাহা এতদিন বহুকাল ধরিয়া শিক্ষা করিতে পারে নাই, ইঁহার নিকট তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিখিয়া লইল। শাস্ত্রের যে জটিল মীমাংসা এ পর্য্যন্ত কেহ স্থির করিতে পারে নাই, ইনি তাহা অতি সহজে অল্প কথায় বুঝাইয়া দিলেন। শুধু জ্ঞানের ভাণ্ডার কেন, তিনি ভক্তির স্রোতে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ প্লাবিত করিলেন। তখনও তিনি নবদ্বীপ-নগরে শ্রীভগবান্‌রূপে সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকাশিত হন নাই। কেবলমাত্র তাঁহার পঞ্চমবর্ষ বয়সে বালগোপালের উপাসক একজন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ উঁহাদের বাড়ীতে অতিথি হইলে তিনি তাঁহার নিকট অষ্টভুজমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন সকলের নিকট প্রকাশিত হইবার সময় হয় নাই বলিয়া তিনি সেই ব্রাহ্মণকে ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাই ব্রাহ্মণও ইহা তখন কাহারও নিকট না বলিয়া নবদ্বীপনগরে মহা-প্রকাশের সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তেইশ বৎসরের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ পরিপূর্ণ ভগবান্‌রূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন; সাত প্রহর পর্য্যন্ত এই প্রকাশ ছিল, ইহাকেই মহাপ্রকাশ বলে। ইহার পূর্ব্বে তিনি মুরারি গুপ্ত, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তের নিকট মাত্র প্রকাশ পাইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন এবং পুনরায় ছাত্রগণ লইয়া পড়াইতে আরম্ভ করেন। এই সময় কাশ্মীর দেশ হইতে কেশব নামক জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আগমন করেন। তাঁহার বাসনা তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রের বিচারে পরাজয় করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে জয় করিতে পারিলে কাশীতে যাইবেন।

কাশীও তখন প্রায় নবদ্বীপের মতই বিদ্যায় একটী প্রধান কেন্দ্র। নবদ্বীপ ও কাশী এই দুই স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীকে জয় করিতে পারিলেই তিনি ভারতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেন। কাশ্মীরদেশে বাস বলিয়া এই পণ্ডিতটী কেশব কাশ্মীরী নামে আখ্যাত হইতেন। কেশব কাশ্মীরীর আগমনে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল। কেশব কাশ্মীরীর সগর্ব্ব চালচলনে ও আলাপ পরিচয়ে পণ্ডিতগণ নবদ্বীপের মানরক্ষা বিষয়ে বড়ই সন্দিহান হইলেন। তাঁহারা ভয় পাইলেন যে, তাঁহারা পরাজিত হইলেই নবদ্বীপ গৌরবহীন ও হীনশ্রী হইয়া যাইবে। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত বা বিচলিত না হইয়া ইঁহাকে অতি অল্প কথায় পরাস্ত করিলেন। নবদ্বীপের মানরক্ষা হইল। পণ্ডিতমণ্ডলী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট সকলেই ঋণী হইলেন। তাঁহার যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গকে না জানে নবদ্বীপনগরে এমন লোক নাই। তাঁহার বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া অনেকেই আনন্দানুভব করেন। শুধু পাণ্ডিত্য কেন, তাঁহার ভুবনদুর্লভ রূপেও নদীয়াবাসী মুগ্ধ হইয়াছেন। সনাতন মিশ্র তাঁহার কন্যার জন্য আর পাত্র কি অনুসন্ধান করিবেন! অন্যত্র তাঁহার মন চলে না। শ্রীগৌরাঙ্গেই তাঁহার কন্যা সমর্পণ করিতে সাধ হইয়াছে। তাই তিনি দিনযামিনী শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার কন্যারত্নটী পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করেন। সনাতন মিশ্রের গৃহিণী দেবী মহামায়াও এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের কেহই তাঁহাদের মনোগত ভাব সমাজে কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে, কিম্বা, শ্রীগৌরাঙ্গের মাতা শচীদেবীর নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে সাহস করেন না। কারণ, পণ্ডিত সনাতন মিশ্র সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি উচ্চশ্রেণীর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে

তাঁহার সমকক্ষ লোক নবদ্বীপে বিরল। তিনি প্রস্তাব করিবেন, অথচ, যদি তদনুযায়ী কার্য্য না হয়, তবে তিনি সমাজে একটু সম্মান হারাইবেন, তাঁহার পদগৌরবের একটু হানি হইবে এবং তাঁহার দুঃখের অবধি থাকিবে না। তিনি জানেন, নিমাই পণ্ডিত তেজিয়ান্ পুরুষ, তিনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তাঁহার কৃপাই একমাত্র ভরসা মনে করিয়া তিনি নীরব রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভূত সম্পত্তিশালী নহেন, কিন্তু তাঁহার সংসারে কোন অভাব নাই। আর পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, কারণ তিনি কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ স্বীয় সম্পত্তির কিয়দংশ মাত্র দিলেও জামাতার চিরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। আবার শ্রীগৌরাঙ্গ তখন পিতৃহীন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র নিমাইএর এগার বৎসর বয়সের সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে সনাতন মিশ্রের বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই, কারণ তিনি ভাবিলেন যে, তিনি কন্যার যেমন পিতা, বিবাহ হইলে জামাতারও তিনি পিতৃস্থানীয় হইবেন, ইহাতে কন্যার কিছুই দুঃখের কারণ হইতে পারে না। মোটকথা, নিমাই পণ্ডিতের সহিত ক্রিয়া করিতে পণ্ডিত সনাতন মিশ্র ও তদীয় পত্নী দেবী মহামায়া একান্ত আগ্রহান্বিত। শ্রীভগবানের নিকট এইজন্য তাঁহারা দিবানিশি প্রার্থনা করেন।

এদিকে বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াও শ্রীগৌরাঙ্গে দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। দশ বৎসরের বালিকা, বিবাহের কি জানে! কিন্তু, ইহা ত পার্থিব বিবাহ নয়—ইহা জগতের মলিন সম্বন্ধ নহে; অথবা, এ সম্বন্ধ নূতনও নহে। আবহমানকাল হইতে ইঁহারা নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাই বিষ্ণুপ্রিয়া দশ বৎসরের বালিকা হইলেও স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আমরা পুরাণে দেখিতে পাই রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া এত মুগ্ধা হন যে, তাঁহাকে তিনি দেহ, মন, প্রাণ

সকল সমর্পণ করেন এবং অবশেষে তাঁহাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট একজন ব্রাহ্মণ দিয়া এই বলিয়া পত্র লিখিয়া পাঠান যে, তিনি যেন কৃপা করিয়া আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যান ও শ্রীচরণে স্থান দেন। কৃষ্ণও তাহাই করিয়াছিলেন এবং এইজন্য তাঁহার চেদীরাজ শিশুপালকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে হইয়াছিল। আবার, শ্রীরাধার বিষয় দেখিতে পাই যে, তিনি কৃষ্ণনাম শুনিয়া নামের শক্তিতে এত মুগ্ধ হন এবং কিছুদিন পরে যমুনায় যাইতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী অবলোকন করিয়া এত আকৃষ্ট হন যে, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত জগতের সর্ব্বস্ব পণ করিলেন এবং অবশেষে বাস্তবিকই তিনি জগতকে একদিকে রাখিয়া, জগতের প্রতিকূলতার দিকে কিঞ্চিন্মাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত পাগল হইলেন। শেষে দৃঢ়নিষ্ঠার নিকট জগত পরাজয় স্বীকার করিল, প্রতিকূল জগৎ অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র জগৎ শ্রীকৃষ্ণ ভজনের জন্য শ্রীরাধার নিকট ঋণী হইল। বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের রূপগুণের কথা শুনিয়াছেন ; নবদ্বীপময় এ কথা রাষ্ট্র হইয়াছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গের মত ভুবনমোহন রূপ জগতে আর নাই, কেহ কখন এ দেবদুর্লভ রূপ নয়নগোচর করে নাই ; বিষ্ণুপ্রিয়াও এই কথা শুনিয়াছেন। তিনি আরও শুনিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে সকলে গৌরহরি বলিয়া ডাকে, কারণ হরিনামে তাঁহার এত অশেষ প্রীতি যে, জীবে ইহা সম্ভবে না। অনেকেই অনুমান করিয়াছেন যে, স্বয়ং শ্রীহরি সেই ধর্ম্মের বিপ্লবের দিনে হরিনাম বিতরণ করিবার জন্য এবং জীবে কিরূপে হরিনাম আস্বাদন করে, নিজে জীবভাব অবলম্বন করিয়া তাহা আস্বাদন করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গৌরহরি নাম তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করায় তিনি আনন্দে অধীর হইলেন। স্বভাবতঃই বিষ্ণুপ্রিয়ার হরিনামে অশেষ প্রীতি। শিশুকালে তিনি বালিকাবৃন্দ লইয়া 'হরিবোল' বলিয়া

হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিয়াছেন। এখনও তিনি হরিগুণগানে, হরিকথা আস্বাদনে বড় আনন্দ অনুভব করেন এবং অন্যকেও আনন্দের অংশ প্রদান করেন। 'গৌরহরি' নাম শুনিয়া তাঁহার শরীর পুলকিত হইল, তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, বিদ্যুতের মত আনন্দলহরী সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া খেলিয়া গেল। হরিনামে তাঁহার স্বভাবতঃই আনন্দ। কিন্তু, আজ 'গৌরহরি' নামে তাঁহার এক নূতন অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। হরিনাম ত তিনি কত শুনিয়াছেন, নিজেও কত হরিনাম করিয়াছেন, পুরাণে তাঁহার যে লীলা বর্ণিত আছে, তাহাও তিনি কত আস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু, আজ 'গৌরহরি' নামে তাহার কর্ণে যত সুধা ঢালিয়া দিল, এরূপ সুধার আস্বাদন ত তিনি এতকাল পান নাই, এই 'গৌরহরি' নাম তাঁহার মরমে এরূপভাবে প্রবেশ করিল যে, এইরূপ অনুভূতি তাঁহার ইতঃপূর্ব্বে হয় নাই। এই নাম তিনি যতই আস্বাদন করিতে লাগিলেন, ততই কত কথা তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, শ্রীহরি গৌররূপে জগতে আসিয়াছেন, এ আবার তাঁহার কিরূপ লীলা, এ লীলার উদ্দেশ্যই বা কি? আবার ভাবিলেন, শ্রীহরি যে অবতীর্ণ হইবেন, এ কথা তাঁহার পিতা ত তাঁহাকে জানান নাই, কিন্তু, পরক্ষণেই আবার এই কথা মনে হইল যে, তিনি বালিকা, তাঁহার নিকট এই সব কথা বলিবার এখনও অবসর হয় নাই। এইরূপ কত কথাই মনে উদিত হইল আর বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু, সর্ব্বোপরি একটী চিন্তাই প্রবল হইল। চিন্তাটী এই, 'গৌরহরি' নাম শুনিয়াই তাঁহার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়াছে—এ ব্যাকুলতা এ জগতের বলিয়া বোধ হয় না, বস্তুটীও তাই অপার্থিব বলিয়া মনে হয়; যাঁহার নামের শক্তিতে হৃদয়টী এইরূপ করিয়া ফেলিল, তাঁহার সঙ্গ না জানি কত মধুর! কত রসায়ন! এই বস্তুটীর সঙ্গ কি তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া

উঠিবে! তিনি কি ইহার সঙ্গিনী হইয়া জগত সংসার ভুলিতে পারিবেন! তিনি সর্ব্বদাই এই চিন্তায় বিভোর আছেন। নামটী তাঁহার এত মধুর লাগিয়াছে যে, তিনি সর্ব্বদা এই নাম জপ করেন। এইভাবে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

বালিকাটী প্রত্যহ তিনবার গঙ্গাস্নান করেন। তিনি গৌরহরির নামটি শুনিয়াছেন, এখন ভাবেন, একবার যদি বস্তুটীর দর্শন পান, তবে নয়ন সার্থক করিয়া লয়েন। তিনি কখন ভাবিতে পারেন নাই যে, বস্তুটীর দর্শন পাইলে তিনি আরও বিপদে পড়িবেন। যে বস্তু সত্য এবং যাহা পরম কল্যাণপ্রদ, তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইলে উহার প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তাহা প্রদর্শন করিলেন। তিনি 'গৌরহরি' নাম জপ করিতেছেন, তিনবেলা গঙ্গাস্নান করেন, আর তাঁহার মন সর্ব্বদা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুল। একদিন তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছেন, এমন সময় শ্রীগৌরচন্দ্র বয়স্য সমভিব্যাহারে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের উন্নত বপু, ভুবনমোহন রূপ, অমিয় কান্তি, চাচরচিকুর, অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ সম্বলিত দেহ, পরিধানে সূক্ষ্ম পীতবসন, গলে শুভ্র যজ্ঞসূত্র, সুরঙ্গ-অধরে মধুর হাসি, আকর্ণবিস্তৃত চঞ্চল-নয়ন, মৃদুল গমন—সকলই মধুর, সকলই চিত্তাকর্ষক, সকলই ভুবন-ভুলান। বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন ভরিয়া মাধুরীটী দেখিয়া লইলেন; কিন্তু ইহা চকিতের মত, কারণ, লাজুকতাবশতঃ একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গও সোণার প্রতিমাখানি দেখিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের তরে চারি চক্ষের মিলন হইল। বালা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণখানি শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে সমর্পণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

গৌররূপ হেরিয়া নয়ন সার্থক করিতে যাইয়া তিনি বিষম বিপদে পড়িলেন। কিন্তু, তাই বলিয়া তিনি রুক্মিণীর মত পত্র দিয়া ব্রাহ্মণ প্রেরণ

করিলেন না, অথবা শ্রীরাধার মত অভিসারেও গেলেন না। এ যুগে তিনি আর এক ভাবে লীলা করিবেন। প্রেমের বল কত মহৎ তাহা তিনি দেখাইবেন। তিনি দেখাইবেন, প্রেমে বিশ্ব জয় করা যায়, তাই, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণে প্রাণে শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা করিতে লাগিলেন, বাহিয়ে প্রাণের কথা ব্যক্ত করিলেন না। কিন্তু, এই ঘটনার পর তিনি গঙ্গাস্নানে যাইয়া শচীমাকে দেখিলেন, তিনিও প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে আইসেন. শচীমাকে দেখিয়া আপনার জন বলিয়া চিনিয়া লইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-জননী বলিয়া শচীমার নাম সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু যে সকল বৃদ্ধানারী শ্রীনিমাইকে পুত্রভাবে স্নেহ করেন, তাঁহারা এবং প্রতিবেশিবর্গ ভিন্ন কেহ শচীমাকে দেখেন নাই ও তাঁহাকে চিনেন নাই। নদীয়ার অল্পবয়স্ক কুল-বধূগণ ও বালিকাগণেরও শচীমাকে দেখিবার ও চিনিবার অবসর হয় নাই। তাঁহারা তাঁহার নাম শুনিয়াছেন মাত্র। নদীয়ার ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করেন, তাহার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাকে আপনার জন বলিয়া চিনিয়া লইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া এ জগতের বস্তু নহেন বটে; কিন্তু জীবের কল্যাণের জন্য জগতে আসিয়া মানুষরূপে ইহা আচরণ করিয়া দেখাইলেন যে, ভজনীয় বস্তু স্থির করিয়া লইয়া তাহাতে একনিষ্ঠ হইলে অন্তশ্চক্ষুঃ খুলিয়া যায়, তখন দিব্যদৃষ্টি দ্বারা জগতের যাবতীয় বস্তুরই স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রধানতঃ প্রয়োজন শ্রীগৌরাঙ্গকে, এবং এই শ্রীগৌরাঙ্গকে পাওয়ার জন্যই তাঁহার নিজজনকে পাওয়া আবশ্যক, কারণ তাঁহার নিজ-জনের সঙ্গ করিলে প্রেম পরিপুষ্ট হয়। ভক্তগণ সেইজন্যই ভক্তের সঙ্গ করিয়া থাকেন। শচীমা শ্রীগৌরাঙ্গের অতি নিজজন—তাঁহার মা। তাঁহাকেই বিষ্ণুপ্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন, তাই তিনি গঙ্গার ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে শচীমাকে বাছিয়া বাহির করিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে বিনয়-ভক্তিপূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন। শচীদেবী এই সোণার পুত্তলীটী

দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি পরিচয় লইয়া জানিলেন, ইনি দেবী মহামায়ার কন্যা, রাজপণ্ডিত সনাতনমিশ্র ইঁহার পিতা। শেষে তিনি আরও পরিচয় লইয়া জানিলেন যে, এই সনাতন মিশ্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ. বেদশাস্ত্রে বিশারদ এবং পরম ভাগবত। কন্যাটীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। কন্যাটীকে দেখিবামাত্রই তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, এ বস্তুটী যেন অতি বহুকালের পরিচিত, অতি নিজজন। এখন এই বিষ্ণুপ্রিয়া-নাম শুনিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। ইঁহার রূপলাবণ্যের কথা নদীয়া-বিশ্রুত। শচীমাও ইঁহার অসামান্য গুণ ও অলৌকিক ভগবদ্ভক্তির কথা শুনিয়াছেন। শুনিয়া আকৃষ্টও হইয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। আজ দেখিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। শচীমা বালিকাটীর মুখখানি ধরিয়া সোহাগ জানাইলেন এবং গায়ে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে উভয়ে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এইরূপে বালা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া শচীমাকে প্রণাম করেন, শচীমাও ইঁহাকে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করেন। তিনি বলেন "তুমি ভুবনদুর্লভ বর প্রাপ্ত হও এবং চিরকাল এয়ো স্ত্রী হইয়া থাক।"

ঘরে বধূ নাই বলিয়া শচীমার বড় দুঃখ। গৃহখানি শূন্য। নিমাই সর্ব্বগুণে ভূষিত এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে সর্ব্বজনসমাদৃত হইলেও উপযুক্ত বধূ না থাকায় গৃহখানির সৌন্দর্য্য নাই। শচীমার অনেকদিন হইতেই বড় সাধ, পুত্রবধূ আনিয়া ঘরখানি সাজান। কিন্তু নিমাইএর যোগ্যপাত্রীর সংঘটন করা ত সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। এ পর্য্যন্ত তিনি সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন দেখিলেন, বিধি একটী অপূর্ব্বরত্ন মিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সাধ হইল, এই রত্নটী আনিয়া গৃহখানি আলোকিত করেন—শূন্যগৃহ পূর্ণ করেন। বালিকাটী দেখিয়া তাঁহার

এতই প্রীতি হইয়াছে যে, পারেন ত তখনই কোলে করিয়া লইয়া আইসেন।

এইভাবে কিছুকাল অতীত হইল। অবশেষে শচীমা সাত পাঁচ ভাবিয়া কাশী মিশ্র নামক জনৈক ঘটক ব্রাহ্মণকে ডাকিলেন। ডাকাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া একবার পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের বাড়ী যাউন। তিনি রাজপণ্ডিত, পরম ভাগবত এবং অতিশয় ধনবান্। তাঁহার কন্যা অতি সুরূপা এবং পরম লাবণ্যবতী। কন্যাটী বিদুষী ও অত্যন্ত ভক্তিমতী বলিয়াও সমগ্র নবদ্বীপ নগরে উহার সবিশেষ খ্যাতি আছে। বংশমর্য্যাদায়ও তাঁহারা উচ্চ। আমার নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁহাদের এই সম্বন্ধ সর্ব্বথা যোগ্য। নিমাইয়ের সম্বন্ধে আমি কি বলিব! আপনারা সকলেই ত তাহাকে জানেন। সকলেই ত বলিয়া থাকেন, এমন বিদ্বান, রূপবান্ ও সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত জগতে আর দ্বিতীয় নাই। পণ্ডিত সনাতন মিশ্রও অবশ্যই ইহা অবগত আছেন। আপনি মধ্যস্থ হইয়া এই সম্বন্ধ স্থির করিয়া কন্যাটীকে আনিয়া আমার গৃহলক্ষ্মী করিয়া দিউন।"

ঘটক কাশী মিশ্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের বাড়ী গেলেন। সেখানে যাইয়া সনাতন মিশ্রের নিকট নিমাইয়ের যথাযথ রূপ গুণ ও বংশ পরিচয় বর্ণনা করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলে পণ্ডিত সনাতন আনন্দে অধীর হইলেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে কোন মতামত জ্ঞাপন না করিয়া কাশী মিশ্রকে বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আমি গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া আসি। তার পর যাহা হয় আপনাকে বলিব।" এই বলিয়া তিনি গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। কাশী মিশ্র উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সনাতনের আনন্দের আবেগ এত উদ্বেলিত হইয়াছে যে, তিনি রুদ্ধ-

কণ্ঠ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এত দিনে বুঝি শ্রীভগবান্ আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। আমাদের এতদিনের আশা আজ ফলবতী হইতে চলিল। শচী দেবী শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সম্বন্ধ করিবার জন্য ঘটক পাঠাইয়াছেন।"

দেবী মহামায়াও আনন্দোৎফুল্ল-হৃদয়ে বলিলেন, "আমাদের আর ইহাতে বিশেষ বলিবার কি আছে! যাহাতে শীঘ্র একার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

পণ্ডিত সনাতন মিশ্র আর বিলম্ব না করিয়া পত্নীর সম্মতি লইয়া আসিয়া কাশী মিশ্রকে বলিয়া দিলেন, যে, এই কার্য্যে তাঁহাদের উভয়েরই সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। যত শীঘ্র সম্ভব, এই শুভকার্য্য সম্পাদন করিতে তাঁহাদের একান্ত বাসনা। কন্যার সহিত কি যৌতুক দিতে হইবে এবং জামাতাকেই বা কি উপঢৌকন দিবেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা বার্ত্তা নিষ্প্রয়োজন, কারণ, এইটী যখন তাঁহার প্রথম সন্তান ও পরম আদরের ধন এবং শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার অবস্থা যখন বেশ সচ্ছল, তখন কন্যার সঙ্গে স্বীয় অবস্থোচিত যৌতুকাদি প্রদান করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। আরও বিশেষতঃ, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন পিতৃহীন, তখন জামাতা ও কন্যা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, সে বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতেই হইবে। কাশী মিশ্র আহ্লাদের সহিত এই শুভ সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত অতি দ্রুতবেগে শচীমার নিকট গমন করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় আজ কালকার মত পুত্র কন্যা বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল না। আজ কাল দেখা যায়, পুত্র কিঞ্চিৎ বিদ্যার্জ্জন করিলেই বিবাহের বাজারে তাহার দর হইতে থাকে। পুত্রের পিতা, মাতা কিম্বা আত্মীয় স্বজন যেখানে বেশী অর্থ পান, সেখানেই

পুত্রটীকে দাসের মত বিক্রয় করিয়া ফেলেন। পুত্রটীও এইরূপে বিক্রীত হইয়া দাস বংশই সৃজন করেন। উহার বংশধরগণ উন্নত আকাঙ্ক্ষা, উন্নত বাসনা কাহাকে বলে বড় একটা জানে না। ইহারাই আবার আজ কাল সমাজে শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে ও তদুচিত সম্মান দাবী করে। আর এক দিকে আবার, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ কন্যা ক্রয় করিয়া দাসী পুত্রের সৃজন করেন। ইঁহারাই সমাজে ব্রাহ্মণ—শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার জন্য স্পর্দ্ধা করেন। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত সমাজে এই ঘৃণিত প্রথা প্রচলিত ছিল না। পণ্ডিতগণ যখন হিন্দু সমাজের নেতা ছিলেন, তখন পণ্ডিতগণের আদর্শে কায়স্থ এবং অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যেও এই অতি জঘন্য ক্রয় বিক্রয় প্রথা স্থান পায় নাই। পাত্র ও পাত্রী দেখিয়া উভয় পক্ষের মনোনীত হইলেই কথাবার্ত্তা স্থির হইত। অর্থদান-গ্রহণের কোন কথা উত্থাপন হইত না।

নিমাই চাঁদ নবদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। রূপে গুণে তিনি অতুলনীয়। বংশ-গৌরবেও তিনি অতি উচ্চ; কিন্তু, শচী মা ইহার বিনিময়ে কন্যা পক্ষের নিকট হইতে কিছু দাবী করিলেন না। কন্যাটী তাঁহার মনে লাগিয়াছে। আর কি তিনি দাবী করিবেন? কাশী মিশ্র যখন আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, সনাতন মিশ্র আহ্লাদের সহিত স্বীয় কন্যা নিমাই পণ্ডিতকে অর্পণ করিবেন, তখন আনন্দিত হইলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে বিবাহের উদ্যোগাদি করিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহে বিবাহের সাড়া পড়িয়া গেল। খুব ধূমধামের সহিত আয়োজন করা হইতে লাগিল। নবদ্বীপ তখন প্রকাণ্ড সহর। লক্ষ লক্ষ লোকের সেখানে বসতি। নানা শ্রেণীর লোক বাস করেন; সনাতন মিশ্রও অতিশয় সমৃদ্ধিশালী। সুতরাং জাঁকজমকের সহিত

বিবাহ কার্য্য সমাধা করিবার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করিতে তাঁহার বেশী সময় লাগিল না এবং কোন অসুবিধায়ও পড়িতে হইল না। বিবাহের প্রায় সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। বাড়ীখানি অতি সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। এখন বিবাহের লগ্ন স্থির করিবার জন্য লগ্নাচার্য্যের নিকট লোক প্রেরণ করা হইল। লগ্নাচার্য্য সংবাদ পাইয়া সনাতন মিশ্রের বাড়ী আসিলেন, পথে পণ্ডিত নিমাইচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল; আচার্য্য নিমাইকে কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পণ্ডিত, আমি কোথায় যাইতেছি জান?' নিমাই বলিলেন 'না'। আচার্য্য বলিলেন, 'আমি পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের বাড়ী যাইতেছি, তোমার বিবাহের লগ্ন স্থির করিবার জন্য।'

নিমাই বলিলেন, 'বটে? কই, আমার বিবাহ! আমি ত জানি না!'

এই বলিয়া নিমাই চলিয়া গেলেন। লগ্নাচার্য্য কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণমনে সনাতন মিশ্রের বাড়ী আসিলেন। পণ্ডিত সনাতন মিশ্র তাঁহাকে লগ্ন স্থিব করিতে বলিলে আচার্য্য বলিলেন, 'লগ্ন স্থির করিতে বিশেষ সময়ের প্রয়োজন হইবে না, তাহার পূর্ব্বে আপনি স্থির করুন, এই বিবাহে নিমাই পণ্ডিতের সম্মতি আছে কিনা?'

সনাতন মিশ্র যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "মহাশয়! সে কি, আপনি বলেন কি? নিমাইয়ের মাতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইয়াছে, এবং তাঁহার আজ্ঞা পাইয়াইত আমি কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং সমস্ত আয়োজন করিতেছি।"

লগ্নাচার্য্য বলিলেন, 'আমি আসিবার সময় পথে নিমাই পণ্ডিতের দর্শন পাইলাম। তাঁহার সহিত আলাপে বুঝিতে পারিলাম, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। তিনি ত মিথ্যা কথা কহেন না। তাঁহার বিবাহ তিনি

জানেন না! তবে আপনারা কিরূপ স্থির করিলেন, তাহা আপনারাই জানেন! এখন আপনাদের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহাকে এই বিষয় যথাযথ জ্ঞাপন করাইয়া এবং শচীমা যে ইহা স্থির করিয়াছেন, ইহা তাঁহাকে বলিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করা। মাতৃভক্ত নিমাই পণ্ডিত কখনও মাতার কথার অবাধ্য হইবেন না।'

সনাতন মিশ্র দেখিলেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনিও কাজটী পাকা করেন নাই। আর শচীদেবী যে নিমাইয়ের মত লয়েন নাই, তাহাই বা তিনি জানিবেন কিরূপে! মোট কথা, এই সংবাদে সনাতনের গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল। সনাতন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সকল সাধে আজ বাদ পড়িল। কত সাধ করিয়া তাঁহার বড় আদরের ধন বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের কত প্রকাণ্ড আয়োজন করিয়াছেন, আর মুহূর্ত্তের মধ্যে সব পণ্ড হইয়া গেল! কিন্তু তিনি ভাবিলেন, ইহা কি সম্ভবপর! শ্রীভগবান্ ত কখন নিষ্ঠুর নহেন! মানুষ ত তাঁহার হাতেরই ক্রীড়াপুত্তলী! তিনি ত অগ্রণী হইয়া এ কর্ম্মে ব্রতী হন নাই! শ্রীভগবানের কৃপায় এই সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তিনিই তাঁহাকে এই আনন্দের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার বাসনা যদি শুদ্ধ হয়, তবে তিনি ইহা কার্য্যে ও পরিণত করিবেন। গৌরাঙ্গ এই বিবাহ সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখেন না, ইহাইত বলিয়াছেন, তিনি বিবাহ করিবেন না, তাহাত বলেন নাই। আর যদি এই বিবাহ না হইবার হইত, তবে শচী দেবী পূর্ব্বেই জানাইতেন। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রবোধ পাইলেন। তিনি ভাগবত, শ্রীভগবানের উপর সব ভার ফেলিয়া দিয়া চিন্তার লাঘব করিলেন।

দেবী মহামায়ার শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি কাঁদিলেন। নিজকে নিজে কত দীন মনে করিলেন। ভাবিলেন, 'শ্রীগৌরাঙ্গের মত

জামাতা কি তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে! শচী কতই না ভাগ্যবতী! নিমাইএর মত পুত্র পাইয়াছেন! বিষ্ণুপ্রিয়ার জননী বলিয়া আমাকেও লোকে ভাগ্যবতী বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহাকে সৎপাত্রস্থা না করিতে পারিলে আমার সে ভাগ্যের মূল্য কোথায়? নিমাইয়ের মত পাত্র জগতে আর কোথায় মিলে? আমার প্রাণের পুত্তলী বিষ্ণুপ্রিয়া ত আর কাহারও যোগ্যা নহে!' এইরূপ কত কি ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। পণ্ডিত সনাতন মিশ্র ইঁহাকে প্রবোধ দিয়া সুস্থ করিলেন।

বালা বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা অবর্ণনীয়। বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে অবধি তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন। তিনি যে তিনবেলা গাঙ্গাস্নান করিয়াছেন ও শ্রীভগবানের নিকট অবিরত প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা ফলবতী হইতে চলিল বলিয়া তিনি শ্রীভগবানকে হৃদয়ের সহিত কত কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। তাঁহার বয়স তখন এগার বৎসর। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী। সকলই বুঝেন। আজ অকস্মাৎ এই হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইয়া তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, আমরা তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। একদিকে তাঁহার নিজের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, আর একদিকে তাঁহার জন্য যে তাঁহার মাতা কষ্ট পাইতেছেন ও অবিরলধারে অশ্রুপাত করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ছিন্ন হৃদয় আরও শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রাণের পরম ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত না হইলে স্বতঃই হৃদয় ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাতে আবার যদি উহা প্রাপ্তির সকল সুযোগ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও অকস্মাৎ নিরাশ হইতে হয়, তবে হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়, এ দুঃখের আর অবধি থাকে না। এই দুঃখের সাগরে পড়িয়া বালা বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা বর্ণনা করা জীবের অসাধ্য। এই সময় হঠাৎ একটী ভাব আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে রক্ষা করিল। সে ভাবটী শুধু বিষ্ণুপ্রিয়াতেই সম্ভবে। ভাবটী এই—বিষ্ণুপ্রিয়া এই দুঃখের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতেছেন,

তিনি শ্রীগৌরাঙ্গে মনঃপ্রাণ সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি ত আর এখন স্বতন্ত্র নহেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ণ অনুগতা। এখন তিনি যদি তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া এবং শ্রীচরণে স্থান না দিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তাহাতেই তাঁহার সন্তোষ। ইহাতে তাঁহার দুঃখপ্রকাশ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ণ আনুগত্য থাকে না। এইভাবে হৃদয়ে অপার বলের সঞ্চার হইল। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া স্থিরচিত্তা হইলেন।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গও গণকের নিকট ঐ কথা বলিয়া আসা অবধি অস্থিরচিত্ত হইয়াছেন। মা'র কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তিনি এ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারই কথার উপর নির্ভর করিয়া সনাতন মিশ্র সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। নিমাইয়ের বয়স তখন একুশ বৎসর বটে, কিন্তু তথাপি শচীমা তাঁহাকে দুধের ছেলে বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার বাৎসল্যরস এত প্রগাঢ়, এতই গভীর! তাই তিনি ছেলেকে এ বিষয় কিছু না জানাইয়া নিজেই সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, নিজেই কথাবর্ত্তা সুস্থির করিয়াছেন। তিনি যখন বলিবেন, পুত্র তখন বিবাহ করিতে যাইবে। ইহাতে পুত্রের মতামত নেওয়ার প্রশ্ন তাঁহার মনেই সমুদিত হয় নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ জানেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার চিরসঙ্গিনী এবং অচিরেই তিনি আসিয়া তাঁহার গৃহে বিরাজ করিবেন। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে যখন উভয়ের রাস্তায় মিলন হইয়াছিল, তখনও তিনি চক্ষে চক্ষে হৃদয়ের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু, লৌকিক ভাবে তিনি এ বিষয় জ্ঞাত নহেন বলিয়াই গণকের নিকট এরূপ বলিয়াছিলেন। ইহা বলার এই উদ্দেশ্য হইতে পারে যে, উপেক্ষা করিলে সনাতন মিশ্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। অন্যদিকে আবার লোকশিক্ষার্থ এইরূপ লৌকিক আচরণ করিয়া দেখাইলেন যে, বিবাহ ব্যাপারটী পুতুলক্রীড়া নহে, ইহা জীবনে একটী অতিশয় পবিত্র ঘটনা। ইহা সামাজিক বা লৌকিক আচার

রক্ষা করার জন্য অথবা পার্থিব সুখসাধনের নিমিত্ত সংঘটিত হয় না। সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা বা ধন উপার্জ্জন করা বিবাহের উদ্দেশ্য নহে। বিবাহের পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ হইয়া যাহাতে স্বামী স্ত্রী উভয়ে শ্রীভগবানের পথে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইতে পারে, উভয়ে যাহাতে সমবেত সাধনা দ্বারা শ্রীভগবদ্ভজনানন্দ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য পাত্র ও পাত্রী পরস্পর পরস্পরের যোগ্য হওয়া আবশ্যক। পাত্র বয়স্ক হইলে স্বয়ং তাঁহার সঙ্গিনী মনোনীত করিয়া লইতে পারেন, কন্যাও বুদ্ধিমতী হইলে স্বীয় মনোমত বর স্থির করিয়া লইতে সমর্থ। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এইজন্য একদিকে যেমন স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল, অন্যদিকে আবার পাত্রেরও পাত্রী অন্বেষণ করিয়া লইবার অধিকার ছিল। সমাজের অবস্থানুসারে শিক্ষার অভাবে সেই প্রথা এখন সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু, তাই বলিয়া পুত্রকন্যার অগোচরে পিতামাতা কিম্বা আত্মীয়স্বজন সমাজে প্রতিষ্ঠার লোভে বা ধনার্জ্জনের আশায় পাত্র বা পাত্রীর রূপগুণ ও যোগ্যতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সম্বন্ধ স্থির করিলে তাহাও অনুমোদনীয় হইতে পারে না। শচীমা ও নিমাইয়ের কথা স্বতন্ত্র। শচীমা নিমাই ছাড়া কিছু জানেন না। এরূপ অপত্যস্নেহ জগতে আর হয় না। তিনি যে নিমাই এর অনুরূপ পাত্রী আনিবেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গেরও ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা হইতে পারে না। শচীমা নিমাই-য়ের সুখে সুখী; কিন্তু জগতে শচীমা কয়জন পাওয়া যায়! তাই বিশ্বগুরু শ্রীগৌরাঙ্গ জগতের জন্য লোকশিক্ষার্থ ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, বিবাহরূপ পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বরকন্যা উভয়কে সকল বিষয় যথাযথ জ্ঞাপন করিয়া উভয়ের সম্মতি লওয়া কর্ত্তব্য।

যাহা হউক শ্রীগৌরাঙ্গ যখন জানিলেন যে, গণকের কথায় সনাতনের গৃহে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি একটু লজ্জিত হইলেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষে পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের নিকট লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, মাতার আজ্ঞা তাঁহার সর্ব্বথা শিরোধার্য্য। পণ্ডিত সনাতন মিশ্র যেন বিবাহোপযোগী আয়োজনে বিরত না হন।

সনাতন মিশ্রের গৃহে আবার আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল। তাঁহাদের একদিন যেন একযুগের মত বোধ হইয়াছিল! মৃতদেহে যেন জীবনসঞ্চার হইল! আবার পরমানন্দে সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বিবাহের দিন স্থির করা হইল। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ যে মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ী টোল স্থাপন করিয়াছেন, সেই মুকুন্দ সঞ্জয় বলিলেন যে, এ বিবাহের খরচ তিনি বহন করিবেন। ইহাতে বুদ্ধিমন্ত খাঁন নামক অতি সমৃদ্ধিশালী জনৈক কায়স্থ জমিদার বলিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ তিনি রাজপুত্রের মত মহাসমারোহের সহিত করাইবেন। এ যার-তার বিবাহ নহে— নদীয়ার গৌরব, বাঙ্গালার গৌরব, পণ্ডিতকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ। ইঁহার বিবাহে এমন সমারোহ করিতে হইবে, যাহা নদীয়া-নগরে কেহ কখন দেখে নাই, যাহা অতুলনীয়, সকল লোক যেন ইহা দেখিয়া চমকিত হইয়া যায়। মুকুন্দ সঞ্জয় বুদ্ধিমন্ত খাঁর মত অপার সমৃদ্ধিশালী নহেন, কাজেই তাঁহার নিরস্ত হইতে হইল। তবে তিনি এবং অন্যান্য শিষ্যবর্গ বিবাহের আংশিক ব্যয়ভার বহন করিবেন স্থির করিলেন।

বুদ্ধিমন্ত খাঁ নদীয়ার সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী জমিদার। তাঁহার এত অপার সম্পত্তি এবং এত বড় মানুষের মত চালচলন যে, সকলে তাঁহাকে নদীয়ার রাজা বলিত। তাঁহার হাতীঘোড়া দাসদাসা পাইক পিয়াদা প্রচুর ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ যদিও তখনও সকলের নিকট ভগবানরূপে প্রকাশ পান নাই, তথাপি বুদ্ধিমন্ত খাঁন স্বীয় ভক্তিবলে বস্তুটী চিনিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, ইনিই প্রাণের পরম আরাধ্য দেবতা, জীবশিক্ষার্থ নর-লীলা করিতে জগতে আসিয়াছেন। ইঁহার বিবাহ ত আর লৌকিক নহে!

এই সময় অপার ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইবে। দেবগন্ধর্ব্বাদি সকলেই স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া এই লীলায় আনন্দ উপভোগ করিবেন। তাহার ব্যয়ভার বহন করা না করা সমান কথা। তবে শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি যে অর্থ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, উহা এই পরম শুভকর ব্যাপারে ব্যয় করিতে পারিলে অর্থেরও সদ্ব্যবহার হইবে, তিনিও ধন্য হইয়া যাইবেন। ইহা স্থির করিয়া কায়স্থকুলোদ্ভব এই পরম ভাগ্যবান্ জমিদার মহা-সমারোহের সহিত বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

(৪)

নদীয়া-নগরে ধ্বনি হইল, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বিবাহ করিবেন। ভাগ্যবান্ সনাতন মিশ্র কন্যাদান করিবেন, উভয়েই রূপে গুণে ভুবনে অতুলনীয়। পল্লীতে পল্লীতে, ঘরে ঘরে, তড়িৎবার্ত্তার ন্যায় এ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। নদীয়াবাসিগণ পরম উল্লাসে এই শুভ-সম্মিলন দর্শন করিবেন বলিয়া সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নদীয়া-নাগরীগণ বড়ই উল্লসিত হইয়াছেন, তাঁহারা অধিবাসের দিন শচীর ভবনে জল সাইতে যাইবেন। কোন রমণী আগ্রহাতিশয্যে অধিবাসের পূর্ব্ব নিশিতে স্বপ্নে দেখিলেন, যেন নবীন নদীয়ার চাঁদ তাঁহার নিকট আসিয়া বঙ্কিমনয়নে চাহিলেন, তাঁহার হাসিতে যেন মধুবর্ষণ করিতেছে। তিনি যেন তাঁহার করে ধরিয়া ধীরে ধীরে—অতি ধীরে বলিলেন, 'তুমি আমার বিবাহে কাল প্রাতে জল সাইতে যাইও।' ইহা বলিয়া তিনি যেন বার বার কত প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিয়া চলিয়া গেলেন।

নারীগণ সকলেই ভাবিতেছেন, কতক্ষণে রাতি পোহাইবে, কখন তাহারা নয়ন ভরিয়া বিবাহবিলাস দেখিতে পাইবে। এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একজন প্রেমিক কবি কহিতেছেন যে, নারীগণের প্রবল অনুরাগে অতি শীঘ্রই নিশির অবসান হইল। প্রভাতে কুলবধূগণ মিলিত

হইলেন। যিনি নিমাইচাঁদকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তিনি আবিষ্ট হইয়া অন্যান্য নারীগণের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন। সকলেই রসাবেশে মধুর কথা শুনিয়া পুলকিত হইলেন। গৌর-দর্শনের জন্য তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া গেল। কেহ প্রেমাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কেহ আনন্দে কণ্টকিত গাত্র হইলেন। কেহ আনন্দাতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই পরম ভাগ্যবতী রমণীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পরপুরুষ। ইঁহার সঙ্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত রমণীগণ পাগল কেন? সর্ব্বশাস্ত্রের চূড়ান্ত মীমাংসা শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের রাস বর্ণনার সময় রাজা পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্ব স্ব পতি অপেক্ষা অধিক প্রীতি করিতেন, ইহাতে ব্রজগোপিকাগণের কোন দোষ হইত কিনা এবং যিনি সকলের আদর্শ, সেই শ্রীকৃষ্ণই বা তাঁহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিলেন কিরূপে? ইহাতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই পরমপুরুষ, তিনি সকলেরই প্রাণ—সকলেরই পতি। তিনি অধিকারীভেদে কাহারও নিকট কর্ম্মের মূর্ত্তিতে, কাহারও নিকট জ্ঞানের মূর্ত্তিতে এবং কাহারও নিকট প্রেমমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি। তিনি যে ভাবেই যাহার নিকট প্রকাশিত হউন না কেন, ইহাতে চিত্ত নির্ম্মল হয়। রমণীগণের চিত্ত সাধারণতঃই সরল, হৃদয় কোমল, স্বভাব মধুর, প্রাণখানি স্নেহপ্রীতিতে পূর্ণ; কিন্তু, এ জগতে যাহাকে স্নেহ ও প্রীতি করা যায়, সে বস্তুটী মায়ার অধীন বলিয়া মলিন; ইহার প্রীতিতে বিমল আনন্দ পাওয়া দূরে থাকুক, আরও বদ্ধ হইতে হয়। শ্রীভগবান্ যখন সকলেরই প্রাণনাথ, তখন রমণীগণ তাঁহাকে পাইবেন না, এ কথা হইতে পারে না; সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, সৌন্দর্য্যের অনন্ত খনি

প্রেমের অপার উৎস শ্রীকৃষ্ণ সরলচিত্তা কোমলহৃদয়া ব্রজগোপিকাগণের নিকট সমুদিত হইয়া তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিলেন। শুদ্ধসত্ত্ব বস্তুর সঙ্গে সত্ত্বভাবেরই উদ্রেক হয়। গোপিকাগণও শুদ্ধসত্ত্বময়ী হইয়া গেলেন, দেহের পাশবভাব বিদূরিত হইল। তাঁহারা বিশুদ্ধ আনন্দোপভোগ করিলেন। জগতের মলিন বস্তুর সহিত আর তাঁহাদের প্রীতি রহিল না। বিশুদ্ধ বস্তুর প্রীতি পাইয়া তাঁহারা ধন্য হইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন সকলেরই পরম পতি, তখন, যে ভাবেই হউক, তাঁহার অনুচিন্তনে কোন অপরাধ হইতে পারে না, বরং ইহাই জীবের সর্ব্বথা করণীয়; কারণ, ইহাতে বিমলানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধেও এই কথা। ইনি শুদ্ধসত্ত্ব বস্তু, পূর্ণ চিন্ময় বিগ্রহ। জীবের প্রেম আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত শুদ্ধপ্রেমের মূর্ত্তিতে জগতে আসিয়াছেন। ভালবাসা জীবের স্বভাব। রমণীগণে এই বৃত্তিটী অধিকতর পরিস্ফুট, কারণ তাঁহারা সরল এবং তাঁহাদের হৃদয় অতিশয় কোমল। কিন্তু এই ভালবাসা মলিন জীবে অর্পিত হইলে বন্ধনের হেতু হয়। ভালবাসার বস্তু শুদ্ধ হইলে সে ভালবাসায় পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, এ আনন্দ নিত্য ও অনন্ত। শ্রীভগবান্ অপেক্ষা শুদ্ধবস্তু আর কিছু হইতে পারে না। তাই তিনি পূর্ণ প্রেমমূর্ত্তিতে জীবের নিকট প্রকাশিত হইলেন। জীব স্বতঃই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। জীব দেখিতে পাইল, ইনিই একমাত্র প্রকৃত ভালবাসার বস্তু। বাল্যলীলা দ্বারা ইনি বাৎসল্যরসের অধিকারিণী রমণীগণের চিত্ত হরণ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ইঁহাকে স্ব স্ব সন্তান অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি করিয়াছেন। এখন আবার তিনি আর একভাবে কুলবধূগণকে আকর্ষণ করিলেন। এ আকর্ষণে চিত্ত নির্ম্মল হয়, হৃদয় পবিত্র হয়। জগতের অপবিত্রতার লেশমাত্র থাকে না, শুদ্ধ প্রীতির উদ্রেক করিয়া দিয়া পরমানন্দ প্রদান করে। এই যে কুলবধূগণের কথা বলা হইল,

যাঁহারা পরম উৎসুকচিত্তে নিমাইয়ের বিবাহে জল সাইতে আসিতে উদ্যোগ করিতেছেন, ইঁহাদের সকলেই সতীসাধ্বা রমণী। ইঁহাদের অনেকেরই স্বামী পরম পণ্ডিত। ইঁহারা নিজেরাও অনেকে বিজ্ঞ। সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত। শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে ইঁহাদের আকর্ষণ অতি বিশুদ্ধ, অতি অপ্রাকৃত। জীবের জন্য রমণীগণের এ আকর্ষণ অসম্ভব। ভুবনদুর্ল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গরূপ শুদ্ধ সত্ত্বময় না হইলে রমণীগণ কেনই বা এই ভাবে আকৃষ্ট হইবেন, কেনই বা তাঁহারা এই রূপের অনুধ্যান করিবেন এবং কেনই বা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কেহ বা পুলকিত, কেহ বা কণ্টকিত-গাত্র, কেহ বা বিবশাঙ্গ হইবেন ও যিনি পুরুষ-রত্নকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিবেন। আর এক কথা। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনীতে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি বাল্যকালে এবং এমন কি যখন অধ্যাপক ছিলেন তখনও অতিশয় চঞ্চল ছিলেন, কিন্তু রমণী দেখিয়া কখনও তিনি হাস্যপরিহাস বা কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন না। অথচ তিনি নাগরীগণের চিত্তে উদিত হইতেন। ইহা দ্বারা তিনি দেখাই-লেন যে, তিনি স্মরণ, মনন ও ধ্যানের বস্তু, তিনি চিন্ময়—অন্তরে ও বাহিরে একই বস্তু। নদীয়ানাগরীগণের এই প্রথম গৌর-ভজন আরম্ভ হইল, আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব, বিবাহের পর নাগরীগণ বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগতা হইয়া গৌরভজন করিয়া মধুর-রস আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া যে নদীয়ার মধুর-রস আস্বাদন করা যায়, সেই পন্থা জীবকে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

নারীগণ পুলকিতচিত্তে সুন্দর বেশে সজ্জিত হইলেন, নয়নে কজ্জল দিলেন, মুখখানি অরুণ-রাগে রঞ্জিত করিলেন, মঞ্জিষ্ঠারাগে রঞ্জিত সূক্ষ্ম বসন পরিধান করিলেন। তদনন্তর গমন সময় উপস্থিত হইলে গুরুজনের চরণ বন্দনা করিয়া অনুমতি চাহিলেন। তাঁহারা উল্লাসের সহিত

অনুমতি দিলেন। নদীয়ার সুন্দরীগণ অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অতিশয় ললিত গতিতে শ্রীশচীর ভবনের দিকে চলিলেন। তাঁহাদের প্রতি অঙ্গের রূপের ছটায় চারিদিক আলোকিত হইল। নূপুরের মনোহর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের রসাবেশে ইঁহারা বিভোর। সুতরাং ইঁহাদের অঙ্গ দিয়া এক অপূর্ব্ব মাধুরী ক্ষরিত হইতে লাগিল। এ মাধুরী দেখিয়া শত শত মন্মথ মূর্চ্ছিত হয়। যিনিই ইহা দর্শন করেন, তাঁহারই হৃদয়ে অপূর্ব্ব মধুর ভাবের সঞ্চার হয়। যে নারীগণের রূপ দেখিয়া মুনিজনেরও মন মুগ্ধ হয় এবং সাধনার পথ হইতে বিচ্যুত হয়, সেই নারীগণ আজ গৌররসে বিভাবিত বলিয়া তাঁহাদের রূপমাধুরীতে মোহ হওয়া দূরের কথা, এই মাধুরী যাঁহারই নয়নগোচর হইল, তাঁহারই হৃদয় পবিত্র হইল ও ভগবন্মাধুরী আস্বাদন করিতে সাধ হইল। ভগবন্মাধুরী না জানি কি পরম লোভনীয় সামগ্রী!

যুবতাগণ আসিয়া শ্রীশচীর অঙ্গনে মিলিত হইলেন। তখন কি অপরূপ শোভা হইল! ইহা ধ্যানের বস্তু! বর্ণনার বিষয় নহে। কবি বলিতেছেন শচীমার অঙ্গনখানি যেন সরোবর হইল এবং পুরনারীগণ যেন তাহাতে ফুল্লকমলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। যূথে যূথে সকলে আসিয়া শচীমাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য সকলেই যখন স্ব স্ব করপল্লব প্রসারিত করিলেন, তখন তাঁহাদের বিনয়মধুর কান্তিতে, নখের স্নিগ্ধ সুন্দর জ্যোতিতে, অঙ্গের বিদ্যুচ্ছটায়, পরিহিত বসনের অরুণ রাগে, মণি-মাণিক্যের প্রভায় এবং শচীমার চরণ কমলে নারীগণের শিরোদেশ হইতে পতিত পদ্মের শোভায়, শ্রীশচীর অঙ্গনখানি এক অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিল। জগজ্জননী শ্রীশচীদেবী চরিত্রবিদ্। সকলকেই তিনি স্বীয় পুত্রবধূর ন্যায় পরম প্রীতি করেন। তিনি জনে জনে কুশল প্রশ্ন করিয়া মস্তকে কর স্থাপন করিয়া

বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলকে যথারীতি আদর যত্ন ও প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া অবশেষে অতি আহ্লাদের সহিত জল সাইতে আদেশ দিলেন। বধূগণ আদেশ পাইয়া অতি আনন্দসহকারে মধুর-মন্থর গতিতে যূথবদ্ধ হইয়া শচীমার সঙ্গে চলিলেন। আগে আগে বালকবৃন্দ নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছে—তারপর শচীমা যাইতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে নদীয়ার নব্য মধ্যযৌবনা সুন্দরীগণ ফুলের সাজি এবং গঙ্গা পূজার অন্যান্য উপকরণ সঙ্গে লইয়া তালে তালে পা ফেলিয়া মৃদুল গমনে চলিলেন। সকলেরই মুখখানি প্রফুল্ল, অধরে হাসি ধরে না—ঘোম্‌টা দ্বারা মুখখানি ঈষদ আবৃত! পৃষ্ঠদেশে বেণী বিলম্বিত, কটিতে কিঙ্কিণী, পায়ে নূপুর। ইহাদের মধুর ধ্বনি পায়ের তাল রক্ষা করিতেছে। আনন্দের আতিশয্যে শরীর হালকা হয়। বিমল আনন্দ চিন্ময় বস্তু। সুতরাং ইহার উপভোগ কালে শরীরও চিন্ময় হইয়া যায়, তখন গমনও নৃত্যের মত হইয়া যায়। নবদ্বীপের নারীগণ নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের সঙ্গে এইরূপ পরমানন্দ উপভোগ করিতেন, তাই তাহাদের গমন মধুর-নৃত্যের মত পরিদৃষ্ট হইত। এই আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য সুর-নারীগণ নদীয়ানাগরীগণের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন।

প্রথমতঃ নানাবিধ স্ত্রী-আচারের পর গঙ্গাতীরে যাইয়া শচীমা নানাবিধ পুষ্প-গন্ধ-চন্দনাদি দ্বারা গঙ্গাপূজা করিলেন, নারীগণ হুলুধ্বনি করিলেন। সুরধূনী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া শচীমাকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। তদনন্তর ষষ্ঠীপূজা হইবে। ষষ্ঠীদেবীর আনন্দ ধরে না। তাঁহার প্রাণেশ্বর আজ মানুষরূপে বিহার করিতেছেন। তিনি এই পূজা শচীমা'র অনুগ্রহ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। পূজা সমাপনান্তে শচীদেবী বধূগণ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সকলে অধিবাসের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শচীদেবী বধূগণকে

মাল্য চন্দনাদি দ্বারা সাজাইলেন এবং নিমাইএর মেসো চন্দ্রশেখর সমাগত পুরুষমণ্ডলীকে মাল্য চন্দন প্রদান করিলেন। শচীর দুলাল নিমাইচাঁদ সভার মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। পণ্ডিত সনাতন মিশ্র অধিবাসের সজ্জ দিয়া লোক পাঠাইলেন, বিপ্রগণ বেদপাঠ করিতে লাগিলেন, ভাটগণ বন্দনা করিতে লাগিলেন এবং নারীগণ হুলুধ্বনি ও শঙ্খের মঙ্গল নিনাদে চারিদিক আনন্দময় করিয়া তুলিলেন। মহাসমারোহের সহিত অধিবাসের কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। সমস্ত নবদ্বীপে ভোজ্য, বস্ত্র প্রেরিত হইল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে অপর্য্যাপ্তরূপে মিষ্ট সামগ্রী ও তাম্বুল কর্পূরাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করা হইল। এই সময় কোন কোন ব্রাহ্মণ একবার পাইয়াও পায় নাই বলিয়া ভান করিয়া পুনর্ব্বার তাম্বুলাদির জন্য প্রার্থনা করিল। গৌরচন্দ্র ইহা জানিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, এ অবস্থায় ব্রাহ্মণকে পুনরায় দিলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না; আবার তাঁহাকে বিমুখ করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণ হয়। তিনি ইচ্ছা করিলেন, এই পরম কল্যাণকর ব্যাপারে সকলেই যেন প্রফুল্ল থাকে, কেহ যেন বিমর্ষ বা কোনরূপ মনঃ ক্ষুণ্ণ না হয়। তাই সত্য-স্বরূপ শ্রীগৌরচন্দ্র প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে তিনবার করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। সকলেই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিষ্ট সামগ্রী প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। এই সময় অপার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন যে, যে সকল দ্রব্য পড়িয়া রহিল, তাহাতে পাঁচটী বিবাহ জাকজমকের সহিত সম্পন্ন হয়।

এদিকে সনাতন মিশ্রের গৃহেও সমারোহের সহিত শুভক্ষণে কন্যার অধিবাস করা হইল। গৃহপ্রাঙ্গণখানি কদলীবৃক্ষে, চিত্র বিচিত্র পতাকায় এবং আম্রপল্লব-শোভিত পূর্ণকুম্ভে সুশোভিত হইল। শচীগৃহ হইতে বিপ্রগণ অধিবাসের সজ্জ লইয়া আসিলেন। নদীয়ার ব্রাহ্মণসজ্জনগণ

রাজপণ্ডিতের গৃহে শুভাগমন করিলেন। মিশ্র মহোদয় মহাসমাদর করিয়া মাল্য চন্দনাদি দ্বারা সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন। সকলে সুন্দর মণ্ডলী বাঁধিয়া প্রাঙ্গণে বসিলেন। অঙ্গনের তখন এক অপূর্ব্ব সুষমা হইল। মিশ্রের ঘরণী সখীগণসহ বিবিধ মঙ্গলাচরণ করিলেন। অতঃপর বিষ্ণুপ্রিয়া বাহিরে আসিলেন। সভামধ্যে তাঁহাকে দিব্যাসনোপরি উপবেশন করান হইল। সকলে অনিমেষ নয়নে তাঁহার অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতি অঙ্গের ছটায় চারিদিক আলোকিত হইল। কনকপ্রতিমাখানি সুবর্ণ বিজলীর ন্যায় শোভা পাইল। তদুপরি আবার মণিমাণিক্যের আভরণে দেহখানি আরও দীপ্তিময়, আরও উজ্জ্বল। ইহাতে চক্ষুঃ ঝলসিয়া যায় না। ইহা নয়নের তৃপ্তিকর। ইহাতে হৃদয় পবিত্র করে। বালা বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের মাধুরী চন্দ্রমার গর্ব্ব খর্ব্ব করে। ইহার শোভা অতুলনীয়, অবর্ণনীয়। সকলে গন্ধ স্পর্শ করাইয়া ইঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিপ্রগণের বেদধ্বনি, ভাটগণের জয় জয়কার শব্দ এবং নারীগণের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি চতুর্দ্দিকে বিষ্ণুপ্রিয়ার শুভ অধিবাস ঘোষণা করিল। গন্ধর্ব্বগণ গায়কগায়িকাগণের সঙ্গে অলক্ষিতে আসিয়া যোগদান করিল। বাদ্যকরগণ মধুর বাদ্যধ্বনিতে প্রাণের আবেগ জ্ঞাপন করিল। উপস্থিত জনগণ সেই সুখ-সাগরে ভাসিলেন। সকলেই গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শুভ সম্মিলন-সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

(৫)

এইরূপ পরম সুখে অধিবাসের দিন অতীত হইল। পর দিন নদীয়ানগরে আনন্দের অবধি রহিল না। নর-নারীগণের হৃদয়ে নব নব-ভাবের উদয় হইতে লাগিল। ভুবন ভরিয়া জয় জয় ধ্বনি সমুত্থিত হইল। দেবগণ মানবরূপে আগমন করিয়া নদীয়াবাসিগণের সহিত মিশিয়া

শ্রীগৌরচন্দ্রের বিবাহ দেখিবেন স্থির করিয়াছেন। দেবীগণ স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা মানবীরূপে ধরাতলে অবতরণ করিয়া নদীয়ানাগরীগণের সহিত মিশিয়া যাইবেন এবং বিশ্বজন-আরাধ্য অপূর্ব্ব যুগল মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইবেন। গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ সঙ্গীত বাদ্যের দলে মিশিয়া মঙ্গল-গীতি গাহিয়া স্ব স্ব বিদ্যার সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। দেবর্ষি নারদ অলক্ষিতে নদীয়ানগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বড় সাধ হইয়াছে, তিনি চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের এই মানুষলীলা অবলোকন করিয়া নয়ন সার্থক করিবেন। এ পর্য্যন্ত তিনি মলিন জীবের দুর্গতাবস্থা দেখিয়া বড় ব্যথা পাইয়া আসিতেছেন। এ যুগের জীব বড় দুর্ব্বল। কঠোর সাধনা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিরূপে জীব মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, এবং কিরূপেই বা শ্রীভগবানের গুণগান করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। নারদ পরম ভাগবত, কাজেই তিনি জীবের দুঃখে কাতর। আজ তিনি এই দুঃখ অপনোদনের উপায় দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন। জীব যাহা কখন ভাবিতে পারে নাই, তাহাই আজ জীবের ভাগ্যে সমুপস্থিত হইয়াছে—শ্রীভগবান্ অতি সহজ হইয়া আসিয়াছেন। জীব ভাল না বাসিয়া পারে না। ইহা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই ভালবাসা জীবের মধ্যে যতভাবে বিকাশ-মান দেখা যায়, তাহার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী-ভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রগাঢ় পরিদৃষ্ট হয়। এই স্বামী-স্ত্রী-ভাব দ্বারাই জগত পরিচালিত হইতেছে। পুরুষ নারীর রূপে মুগ্ধ হয়, নারী পুরুষের রূপে মুগ্ধ হয়; ইহা শুধু মানুষের মধ্যে নহে, জীবমাত্রেই এই ভাব পরিলক্ষিত হয়। মায়ার অধীন জীবের এই মোহ বন্ধনের হেতু, ইহার অন্তরালে মায়াতীত একটী অতি শুদ্ধ মধুর ভাব রহিয়াছে, যাহার ছায়াই মায়াবিজড়িত হইয়া জীবজগতে পরিদৃষ্ট হয় এবং যাহা জীবের নিকট অজ্ঞাত। এই ভাবের

আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই জীব একদিকে যেমন বন্ধন-মুক্ত হয়, তেমনি আবার ভগবৎসঙ্গজনিত পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। নারদ দেখিলেন, শ্রীভগবান্ মানুষরূপে শুদ্ধ আদর্শ স্বামী-স্ত্রী-ভাবে বিরাজ করিতে যাইতেছেন। যে সৌন্দর্য্যে জগত মুগ্ধ, সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের নিধান স্বামিরূপে বিরাজ করিবেন এবং তাঁহারই হ্লাদিনীশক্তি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া পত্নীরূপে বিরাজ করিয়া কিরূপে স্বামিসেবা করিতে হয়, তাহা জীবকে দেখাইবেন। আবার জগতে যে স্বামী-স্ত্রী বিরাজ করে, তাহাতে একটী জীব আর একটী জীবের স্বামী হয়; ইহা কেবল পশু-ভাবজনিত সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত, ইহাতে নিত্যসুখ আনয়ন করে না। প্রকৃতপক্ষে একটী জীব আর একটী জীবের স্বামী হইতে পারে না।

শ্রীভগবানই জীবের একমাত্র স্বামী। নারদ দেখিলেন, জগতের স্বামী-স্ত্রী-ভাব সূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ও ইহার অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া জীব যাহাতে নিত্যবস্তু জগৎস্বামীকে ভজনা করিতে উন্মুখ হয়, জগতের অনিত্য সৌন্দর্য্যের মোহ ছাড়াইয়া যাহাতে জীব চিরসুন্দরের উপাসনায় প্রলুব্ধ হয়, সেইজন্য শ্রীভগবান্ শুদ্ধস্বামিভাবে প্রকাশ পাইবেন। আর, মায়ার অধীন জীব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবৎসেবা করিতে সমর্থ নহে, তাই জীবকে ভজনের অধিকার দেওয়ার জন্য, তাহাকে বিমলানন্দ প্রদান করিবার নিমিত্ত, স্বীয় পূর্ণ হ্লাদিনীশক্তি বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে প্রকাশ করিয়া পতি-পত্নীরূপে বিরাজ করিবেন, যেন, জীব বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া শ্রীভগবদ্ভজন করিতে সমর্থ হয়। বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগতি আর কিছুই নহে, তিনি যে ভাবে আচরণ করিয়াছেন, জীব স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী তাঁহার যে কোন ভাব অবলম্বন করিলেই বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত হইবে এবং তাহাতেই ভজনানন্দ প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত জীবই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার গণ। আনন্দেই তাহাদের অবস্থিতি। জীব তাহা

জানে না বলিয়াই দুঃখ পায়। এই হ্লাদিনীশক্তির অনুগত হইলেই জীব বুঝিতে পারিবে যে, আনন্দ হইতে জগতের উৎপত্তি, আনন্দে ইহার অবস্থিতি এবং আনন্দেই ইহার পরিসমাপ্তি—আনন্দের আর শেষ নাই। জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, লতায়, পাতায়, প্রতি চিত্রে, প্রতি কার্য্যে, সে তখন আনন্দের অভিব্যক্তি দেখিতে পাইবে, সকলই আনন্দময়ের ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হইবে। পূর্ণ আনন্দময়কে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং নিজেও আনন্দময় হইয়া যাইবে। পরম ভাগবত দেবর্ষি নারদ দেখিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহের সূচনায় জীবের পরম কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। এই বিবাহের প্রারম্ভেই নদীয়ার নরনারী প্রফুল্লিত, আনন্দ সকলের আর ধরে না। সুরধুনী আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বিহগকুলের আনন্দকুজনে চতুর্দ্দিক মুখরিত, বৃক্ষ লতা প্রীতি উপহার দেওয়ার জন্য কুসুমগুচ্ছে সুশোভিত, আনন্দ-পুলকে পৃথিবী নব তৃণাদিতে মণ্ডিত। মানুষের বিবাহ ত কতই হইয়াছে কিন্তু এতাদৃশ আনন্দ ত আর কখনও কাহারও গোচর হয় নাই। নদীয়ানগরের এই আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য নারদ প্রচ্ছন্ন ভাবে নদীয়াধামে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

নদীয়ার ব্রাহ্মণ সজ্জন নিমাইয়ের বাড়ী আগমন করিলেন। বিবাহ-বিহিত কর্ম্ম সমাপন করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে বসিলেন। ব্রাহ্মণগণ মুখখানি দেখিয়া বিশ্বসংসার সুখময় দেখিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, বিশ্ববাসিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত মঙ্গলময় এই মুখচন্দ্রের সমুদয় হইয়াছে।

ইহার পর সুখের আলয়, রসময় গৌরচন্দ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সভা হইতে উঠিয়া যাইয়া বিবাহবিহিত স্নানের নিমিত্ত কুলবধূগণের মধ্যে বসিলেন। তাঁহারা মুখখানি দেখিয়া জগৎসংসার ভুলিলেন। গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া সকলেরই সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। কেহ কেহ সেই অঙ্গের বাতাসে

ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিলেন। কেহ সেই অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাধ করিয়া গন্ধ হরিদ্রাদি মাখাইতে গেলেন। কেহ ললিতকুন্তলে সুগন্ধি তৈল দিতে লাগিলেন। কেহ গঙ্গাজল আনিয়া অভিষেক করিলেন। কেহ সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্র আনিয়া গা মুছিয়া দিলেন। তার পর তিনি রক্তপ্রান্ত অতি সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র পরিধান করিলেন এবং তদনন্তর তাঁহার চিকণ কেশবিন্যাস করিয়া দেওয়া হইল। সকলেরই বদন প্রফুল্ল, অধরে হাসি ধরে না। রমণীগণ স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যোপভোগের জন্য পাগল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্ব স্ব স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছে, তাহাতে কামগন্ধ ছিল। আজ এই ভুবনদুর্লভ, অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া তাহারা যেন এক উজ্জ্বল জগতে চলিয়া গেল, তাহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়া গেল এবং বিমলানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাই তাহাদের এত হাসি। শচীমা এয়োস্ত্রীগণ লইয়া বিবাহবিহিত মঙ্গলকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর গৌরচন্দ্র যাইয়া দিব্যাসনে উপবেশন করিলেন। এখন বয়স্যগণ আসিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের সখাকে মনের মত সাজাইতে লাগিলেন। তাঁহারা রসাবেশে বিভোর হইয়া কেহ শ্রীঅঙ্গ চারু-চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া দিলেন। তারপর মস্তকে নানা পুষ্পময় বিচিত্র মুকুট স্থাপিত করা হইল। কেহ আসিয়া নয়নযুগলে কাজলের রেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। শ্রুতিমূলে মণিময় কুণ্ডল পরান হইল। গণ্ডের অপূর্ব্ব কিরণচ্ছটায় কুণ্ডল আরো শোভা পাইতে লাগিল। গলে লহরে লহরে পুষ্পমালা দুলিতে লাগিল। অপূর্ব্ব বিচিত্র শোভায় শোভিত সুমধুর হাসিমাখা মুখখানি এবং যথাযোগ্য ভূষণে ভূষিত প্রতি অঙ্গ জনগণের আরও চিত্তহারী হইয়া উঠিল।

ইহার পর শ্রীগৌরচন্দ্র জননীর পদধূলি শিরে লইলেন। শচীমা দক্ষিণ হস্তে পীতবর্ণ সূত্রে ধান্য দূর্ব্বা বাঁধিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ ইতোমধ্যে চৌদোল প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এক প্রহর বেলা

থাকিতে নিমাইচাঁদ দোলায় চড়িলেন, বয়স্যগণ সঙ্গে চলিলেন। প্রিয় বিপ্রগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া রসিকশেখর শ্রীগৌরসুন্দর সনাতন মিশ্রের বাড়ীর অভিমুখে শুভ যাত্রা করিলেন। সেই পরম ভাগ্যবান্ কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান্ গমনোপযোগী অপূর্ব্ব সাজসজ্জা করিয়াছেন। বহুসংখ্যক অশ্ব ও হস্তী সাজাইয়া লইয়াছেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁর সশস্ত্র পদাতিক সৈন্যগণ অস্ত্রক্রীড়া প্রদর্শন করিতে করিতে চলিয়াছে। নর্ত্তকগণ নাচিতে নাচিতে চলিল এবং কাচুকগণ বিবিধ কাচ কাচিয়া সকলের হাস্যরস উদ্দীপনা করিতে লাগিল। বিভিন্ন শ্রেণীর বাদ্যকরগণ পর পর শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব বাদ্য-বাজনার শব্দে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। তখন বহুবিধ বাদ্যের প্রচলন ছিল, যথা—দুন্দুভি, ভেরী, তিত্তিরি, শৃঙ্গিকাক, কংসারী, ঢোল, ঢোলক, ডুমুর, ডিণ্ডিম. মঞ্জ, কুণ্ডলী, পরুণা, বীণা, পনব, পিনাক, কাহল, মুরুজ, চঙ্গ, উপাঙ্গ, জয়ঢাক, বীর-ঢাক, মাদল ইত্যাদি। এই সকল বাদ্যযন্ত্রের অনেকই আজকাল প্রচলিত নাই। অগণিত লোক পতাকা লইয়া চলিয়াছে। শত শত লোক দীপ লইয়াছে। পূর্ণিমা রজনী। তারকামণ্ডল-পরিবেষ্টিত হইয়া চন্দ্রমা মধুর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিস্তার করিতে লাগিলেন। বৈশাখ মাস প্রকৃতিদেবী পুষ্পপল্লবে মধুর সাজিয়াছেন। ফুল্ল জোছনায় ইহার শোভা আরও মধুময় হইয়াছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে শ্রীগৌরচন্দ্র আবার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছেন। দেবগণও ইহাতে যোগদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব-কিন্নরগণ স্ব স্ব নর্ত্তন কীর্ত্তন দ্বারা নর্ত্তক ও গায়কবৃন্দের নৃত্যগীতি আরও চিত্তাকর্ষক করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপে নদীয়াপুরে ভ্রমণ করিলেন।

• এদিকে, গোরাচাঁদের বিবাহোচিত অপূর্ব্ব বেশ দেখিবার জন্য সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ছুটিয়াছে। কুল-বধূগণ বিবাহ দেখিতে যাইবেন বলিয়া কত না মনের সাধে পূর্ব্বেই

বিবিধ সাজে সাজিয়াছেন। সকলেই রসের আবেশে নয়ন অঞ্জনে রঞ্জিত করিয়াছেন। চিকণচিকুরে কত মনোহর ছাঁদে বেণী বাঁধিয়া পৃষ্ঠদেশে দোলাইয়া দিয়াছেন। কনক-নির্ম্মিত সুন্দর ঝাঁপা শিরোদেশে শোভা পাইতেছে। কপালে সিন্দূরবিন্দু, তাহার মধ্যস্থলে আবার চন্দনবিন্দু দেওয়ায় উহা আরো মনোহর হইয়াছে এবং উহাতে সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কর্ণে কর্ণভূষণ, গলায় মণিমুক্তার মালা এবং অন্যান্য অঙ্গে মণিময় আভরণ ঝলমল করিতেছে। সকলেই সূক্ষ্ম পট্টশাড়ী পরিয়াছেন। নিমাইয়ের বিবাহ। নদীয়ানগরে পূর্ব্বেই সারা পড়িয়াছে। গৃহে গৃহে আজ আনন্দের ঢেউ উঠিয়াছে। সারাদিন প্রত্যেকের হৃদয়ে কত ভাবের তরঙ্গ খেলিয়াছে, গৃহকার্য্য সকলেই করিয়াছেন বটে, কিন্তু মন রহিয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে। যতই দিনের অবসান হইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সকলেই উৎকর্ণ হইয়া রহিল, কখন মহামঙ্গল-ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের শুভযাত্রা ঘোষণা করে।

অবশেষে যখন নদীয়ার চাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অমৃতের অনন্ত উৎস, হৃদয়ানন্দ রূপরাশির অপূর্ব্বচ্ছটা বিকীরণ করিতে করিতে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিলেন, তখন মধুর গীতিবাদ্যের উচ্চনিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে নগরময় রাষ্ট্র হইল, শচীর দুলাল নিমাইচাঁদ অপূর্ব্ব-বেশে অপার ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া সনাতন মিশ্রের ভবনে যাত্রা করিয়াছেন, পুরস্ত্রীগণ আর গৃহে রহিতে পারিলেন না। কিন্তু ইঁহারা কুলবধূ। ইঁহারা ছুটিলেন না। গজেন্দ্রগমনে চলিলেন। প্রাণে প্রবল পিপাসা আছে। কিন্তু বিঘ্ন কুলের দায়। কিন্তু তাই বলিয়া কি হইবে! বাসনা শুদ্ধ ও দৃঢ় হইলে ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই, শ্রীগৌরচন্দ্র ধীরগমনে নগরের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিতে লাগিলে নাগরীগণের দর্শনলাভ ঘটিল। শ্রীগৌরসুন্দর কুলবালাগণের নয়নপথের পথিক হইলে কোন বালা

বলিলেন, 'সখি! ঐ দেখ নদীয়ার চাঁদ! কি ভুবনমোহন বেশ! ঐ রূপের নিছনি লইয়া কত শত মদন চরণে পড়িয়া কাঁদে। রসে ডুবুডুবু নয়ন দুইটীর চাহনি কি মধুময়! প্রাণখানি যেন টানিয়া লয়!' কোন নারী বলিতেছেন, 'বদনচন্দ্রের কি অপূর্ব্ব জ্যোতি! চন্দ্রমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দেয়!' আর একটী রমণী বলিতেছেন, 'আহা! মরি! মরি! সুন্দর অধরে কি মধুর হাসি! যেন রাশি রাশি অমিয়বর্ষণ করিতেছে!' কোন রূপবতী রমণী বলিতেছেন, 'কুলনারীগণের কুলশীল ছাড়াইবার জন্যই এই রূপ-মাধুরীর বিকাশ হইয়াছে। এ পুরুষ-রতনের পদতলে কোটী কোটী মদন লুণ্ঠিত হইতেছে। ইহার ভুবন ভুলান রূপ, অপার্থিব, স্নিগ্ধ সুধামাখা হাসি দেখিয়া বোধ হয়, ইনি সতীনারীকে পতির ক্রোড়দেশ হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য জগতে আসিয়াছেন।' কোন নাগরী বলিতেছেন, 'দেখ, দেখ, সখি! শুধু আমরা কেন, পশুপক্ষী—যাবতীয় জীব জন্তুই কি এক মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে! ইহারাও ত নয়ন ফিরাইতে পারে না!' কোন সখী বলিতেছেন, 'বলিহারি রূপের মাধুরী! বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত এই রূপসুধা পান করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতেছে!' কোন নাগরী বলিলেন, 'চল, সখি, আমরাও এই সঙ্গে সনাতনের ভবনে চলিয়া যাই। ইঁহারা একপথে যাউন, আমরা আর একপথে যাই। এই কাঞ্চনবর্ণ অমিয়কান্তি পুরুষ-প্রবরের বামে সেই লোকবিশ্রুতা অলোকসামান্যা রূপবতী বিষ্ণুপ্রিয়া উপবেশন করিলে কিরূপ মাধুরী হয়, তাহা দর্শন করিতে বড়ই লোভ হইতেছে। চল যাই, আমরা এই যুগলমাধুরী দেখিয়া ধন্য হই। আমরা ত ইঁহাকে স্বামী করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইঁহার সঙ্গজনিত আনন্দ লাভ করিতে অধিকারিণী নই। এস, আমরা সেই ভাগ্যবতী রমণীকে অগ্রণী করিয়া তাঁহারই আশ্রয়গ্রহণ করিয়া এই পুরুষরতনের সঙ্গ করিয়া জীবন সার্থক করি।'

এইরূপে নদীয়া-রমণীগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। এই যে সতী নারীর পতি ছাড়ার কথা বলা হইল, ইহার তাৎপর্য্য কি? এই কথার সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে কোটী কোটী মদন বিলুণ্ঠিত হয়, অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে জীবের কামভাব বিদূরিত হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ই জীবের একমাত্র পতি। জগতে যে একটী জীব আর একটী জীবের পতি সাজে ও তদনুরূপ আচরণ করে, ইহা কেবল মায়াপ্রসূত। এখানে নির্ম্মল আনন্দ নাই, মলিনতা আছে। যে পর্য্যন্ত প্রকৃত পতি না পায়, সেই পর্য্যন্ত জীব পার্থিব পতিকেই ভজন করে, এবং একমাত্র পতিই গতি বলিয়া মনে করে। প্রকৃত পতির সন্ধান পাইলে স্বভাবতঃই সংসারের পতি ছাড়িয়া দেয়, সংসারের পতিই উপপতি হইয়া দাঁড়ায়, এবং যিনি প্রকৃত পতি, এ পর্য্যন্ত উপপতি অর্থাৎ পর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন, তিনিই পতি হইয়া যান। প্রথমতঃ সংসাররূপ পতি ইহাতে প্রতিকূল হয় এবং পার্থিব পাতিব্রত্যধর্ম্ম অর্থাৎ সংসারের ধর্ম্মপালনই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয় ও ভগবৎসঙ্গে বিঘ্ন জন্মায়, কিন্তু, অবশেষে সত্যের নিকট ইহা পরাজয় স্বীকার করে ও এই সংসারই অনুকূল হইয়া দাঁড়ায় এবং জগৎস্বামীর সেবায় সম্পূর্ণ সহায়তা করে; যে মায়া বন্ধনের হেতু হয়, তাহাই মুক্তি আনয়ন করিয়া ভগবৎ-রস আস্বাদন করাইয়া দেয়। নদীয়া-নাগরীগণেরও শ্রীগৌর-দর্শনে এই অবস্থা হইল। তাঁহাদের হৃদয় নির্ম্মল হওয়ায় তাঁহারা সত্য সত্যই অনুভব করিলেন যে, মরজগতের সতী নারীকে সংসার-পতির কোল হইতে কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত জগৎস্বামী অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আবার এই যে কোন কোন নাগরী পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা প্রভৃতির শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অবলোকন করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই

যে, তাঁহারা নিজেরা শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের ইচ্ছা, তাঁহারা চিরকালের তরে শ্রীগৌরচরণে বিকাইয়া যান; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইলেন—ভাবিলেন, অকস্মাৎ তাঁহাদের এ পরিবর্ত্তন কেন! তাঁহারা না কুলনারী! আর শ্রীগৌরাঙ্গ না পরপুরুষ—বিবাহ করিতে যাইতেছেন! হঠাৎ তাঁহাদের এ ভাবান্তর কেন! কুলশীল ত্যাগ করিতে তাঁহাদের এত সাধ কেন! মুহূর্ত্তের মধ্যে কত তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইল। বিচার আসিয়া তাঁহাদিগকে এত কথা বলিয়া দিয়া গেল, আর অন্যদিকে, তাঁহাদের হৃদয়খানি শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে পড়িয়া থাকিতে চাহিল। এমন অবস্থায় তাঁহারা উন্মনস্ক হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিল, শুধু তাঁহারা নহে, পশুপক্ষী পর্য্যন্ত রূপ দেখিয়া ঝুরিতেছে, বৃক্ষলতাদিও মধুরিমা-দর্শনে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এই সকল দেখিয়া নাগরীগণের আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাইল। তাঁহারা ভাবিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সর্ব্বজীবেরই আকর্ষণের বস্তু, তখন এ রূপ সত্য, নিত্য, শুদ্ধ। সুতরাং তাঁহারা যে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে বিক্রীত হইতে চাহিতেছেন, ইহা তাঁহাদের অন্যায় নহে,—ইহা স্বাভাবিক। ইহাতে জগতের কেহই তাঁহাদিগের বাধা জন্মাইতে পারিবে না। এই আনন্দে এক নাগরী অন্য নাগরীকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন—দেখ, দেখ, সখি, পশুপক্ষী বৃক্ষলতা সকলেই গৌররূপ হেরিয়া আনন্দে বিভোর।

এইরূপ নদীয়াবাসী নরনারী, স্থাবর, জঙ্গম যাবতীয় জীবকে আনন্দ-প্রদান ও আকর্ষণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রমান্বয় গঙ্গার ধার দিয়া চলিলেন। এদিকে সনাতন মিশ্রের ভবনখানি অতি মনোজ্ঞ করিয়া সাজান হইয়াছে। পথের দুইধারে সারি সারি কদলীবৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে, মঙ্গলঘট ও আম্রপল্লবে উহা সুশোভিত করা হইয়াছে। বিভিন্ন বর্ণের পতাকায়

চারিদিক মধুর শোভা ধারণ করিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অগণিত লোক শ্রীগৌরচন্দ্র দর্শন করিবার নিমিত্ত রাস্তার দুইধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, সকলেই আসিয়াছে। অন্ধ দেখিতে পায় না। কিন্তু, তাহার আজ যেন কেন বড় সাধ হইয়াছে যে, এই গৌররূপ দেখে। সে শুনিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য জীবমাত্রেই ব্যাকুল এবং এ রূপ এ জগতের নয়। জীবকুল আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এ রূপের বিকাশ হইয়াছে। অন্ধ ভাবিলেন, তিনি ত আর জগত-ছাড়া নহেন, তিনি এই অযাচিত কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবেন কেন! আজ এই অপার্থিব রূপ দর্শন করিয়া, তিনি যে এ পর্য্যন্ত কোন রূপ দর্শন করিতে পারেন নাই, সেই সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইবেন। তাই, তিনি বড় সাধ করিয়া পরের হাত ধরিয়া আসিয়া, যেদিক দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আসিবেন, সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন। খঞ্জ, আতুর প্রভৃতি অশক্ত ব্যক্তিগণ কেহ বা যষ্টি লইয়া, কেহ বা অন্যের স্কন্ধে ভর করিয়া গৌররূপ দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া আছেন এবং বাদ্য শুনা যায় কিনা তজ্জন্য উৎকর্ণ হইয়াও রহিয়াছেন। এমন সময় তপন-তাপক্লিষ্ট জীবগণের শ্রান্তি অপনোদন করিবার জন্য স্নিগ্ধ জোছনা বিকীরণ করিতে করিতে নীলগগনে চন্দ্রমা উদিত হইলে, অদূরে মঙ্গল-বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। এই ধ্বনিতে সকলের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ইহাতে যেন কি এক অপ্রাকৃত রাজ্যের সংবাদ আনিয়া দিল। সকলের উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সকলেই চাহিয়া রহিয়াছেন—সকলেরই দৃষ্টি একদিকে। দেখিতে দেখিতে পতাকা দৃষ্টিগোচর হইল; কিয়ৎক্ষণ পরে হয়-হস্তী প্রভৃতি মন্থর গমনে আসিতে লাগিল। গায়ক গায়িকা ও বাদ্যকরগণের উন্মাদনাপূর্ণ গীতিবাদ্যে বায়ু-মণ্ডল তরঙ্গায়িত হইল, চতুর্দ্দিকে আনন্দপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল; এবং এই

উচ্ছ্বাসে নরনারীর হৃদয় ত দূরের কথা—পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুলতাদি পর্য্যন্ত আপ্লাবিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মণিমাণিক্যখচিত দিব্য চতুর্দ্দোলমধ্যে বিরাজমান শ্রীগৌরচন্দ্র স্নিগ্ধ হাসিতে অমিয়বর্ষণ করিতে করিতে সকলের নয়নগোচর হইলেন। এই সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইল। পণ্ডিত সনাতন মিশ্র বন্ধুগণ সঙ্গে লইয়া জামাতৃ-রতনকে অগ্রসর হইয়া নিতে আসিলেন। শত শত মহাদীপ, নানাবিধ বাদ্য বাজনা, অগণিত পতাকা, সঙ্গে আসিল। বালক, বৃদ্ধ অনেকেই আনন্দে চঞ্চল হইয়া নৃত্য করিতে করিতে সনাতনের সঙ্গ লইল। উভয় পক্ষের মিলনে এক মহা আনন্দের রোল সমুত্থিত হইল। ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মিশ্র ভবনের সন্নিহিত হইলে ভাগ্যবান্ মিশ্র-মহোদয় পরম উল্লসিত মনে জামাতাকে কোলে লইয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন।

পণ্ডিত সনাতন মিশ্র জামাতাকে আনিয়া অপূর্ব্ব আসনে বসাইলেন। চারিদিকে নারীগণ আসিয়া চাঁদমুখপানে চাহিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন উভয়পক্ষের অসংখ্য বাদ্যকরগণ তুমুলনিনাদে বিবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিলেন; মিশ্র-মহোদয় জামাতাকে বরণ করিয়া লইলেন। নদীয়ার শশী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মধুর শোভা পাইতে লাগিলেন। তনুখানি কনক অপেক্ষাও উজ্জ্বল, নবনীত অপেক্ষাও কোমল,—মুখের ভঙ্গী ও নয়নের চাহনিতে সকলেরই মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লইল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জননী অনিমেষনয়নে ছলছল আঁখিতে বারবার ঐ রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে কতই না আনন্দ উচ্ছলিত হইয়াছে। বিহিত মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত "আইহ" "সুঁইহ" লইয়া আসিলেন। আনন্দাতিশয্যে তাঁহার শরীর এত হাল্‌কা হইয়াছে যে, তাঁহার পদতল আর ধরণীস্পর্শ করিল না, তিনি যেন বায়ুভর করিয়া আসিলেন। আনন্দ চিন্ময় বস্তু, ইহাতে জড়ভাবও চিন্ময়ভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ। ভাগ্যবতী

মিশ্র-ঘরণী ইঁহাকে মানুষভাবে জামাতারূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার আর আনন্দের অবধি থাকিবে কেন ? এই অপার আনন্দে তাঁহার আর জড়ভাব নাই ; তাই তাঁহার পদতল আর ধরণীস্পর্শ করিল না।

দেবী মহামায়া এয়োস্ত্রীগণ লইয়া জামাতার সুললিতমস্তকে ধান্যদূর্ব্বা অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সপ্তপ্রদীপ লইয়া বরিয়া লইলেন। অতঃপর নানাবিধ লোকাচার সমাপন করিয়া গৃহে গমন করিলেন। সেথানে যাইয়া কন্যাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিতে লাগিলেন। জামাতার আগমনে এবং বালা বিষ্ণুপ্রিয়ার তদানীন্তন অপূর্ব্ব মধুময় জ্যোতিতে দেবী মহামায়া ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ সুখের পাথারে সাঁতার দিলেন। সকলেই অশেষ উল্লাসে কত সোহাগ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে নানা ছাঁদে সাজাইলেন। এদিকে শুভক্ষণ দেখিয়া পণ্ডিত সনাতন মিশ্র কন্যাকে আনিবার জন্য আদেশ দিলেন। মিশ্রের ভবনখানি অতি মনোহর, প্রশস্ত অঙ্গনখানি ঝলমল করে—এক স্নিগ্ধ জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত, সমাগতজনগণের প্রত্যেকের উপরেই একটা জ্যোতিঃ খেলিতেছে। মধ্যস্থলে দিব্য আসনোপরি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বসিয়া আছেন। আর একখানি দিব্যাসনে বসাইয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনা হইল। শ্রীমতীর দিব্যাসনখানি শ্রীগৌরচন্দ্রের দিব্যাসনের সন্নিকটে রাখা হইল। প্রথমেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণে মালা অর্পণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গরায় ঈষৎ হাসিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় পুষ্পমালা প্রদান করিলেন। তৎপর দুইজনে পুষ্পক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দোঁহাকার প্রেমে দুঁহুজন বিহ্বল হইলেন। তিলে তিলে আনন্দ বাড়িতে লাগিল। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত এই মধুর বিলাস করিতে লাগিলেন, তখন পলে পলে উভয়ের শ্রীঅঙ্গ দিয়া নব নব শোভা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, আর নাগরীগণ চারিদিকে চিত্র-

পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া এই অপার মাধুরী নিরীক্ষণ করিতে করিতে হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। গগন ভেদ করিয়া নানাবিধ বাদ্যধ্বনি সমুত্থিত হইল। এই আনন্দকোলাহলের মধ্যে ভাগ্যবান্ সনাতন মিশ্র কন্যাদান করিতে বসিলেন। বেদবিহিত ক্রিয়া সমাপন করিয়া তিনি বিশ্বম্ভরের করে ধরিয়া তাঁহার নিকট কন্যা সমর্পণ করিলেন। মিশ্র মহাশয়ের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি দিব্য ধেনু, ধন, ভূমি, শয্যা, দাস, দাসী প্রভৃতি বিবিধ যৌতুক প্রদান করিয়া ধন্য হইলেন এবং সর্ব্বশেষে বিশ্বম্ভরের বামে দুহিতাকে বসাইয়া হোমকর্ম্ম সমাধা করিলেন। এই সময়ের অপরূপ যুগলমাধুরী নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত অজ, ভব, ইন্দ্র, গণপতি প্রভৃতি সকলে পুলকিতদেহে আসিয়া অলক্ষ্যে রহিলেন। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বিবিধ ভঙ্গীতে সুমধুর জয় জয় শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। দেবরমণীগণ মধুরবেশে সুসজ্জিত হইয়া কেহ কেহবা নাগরীগণের সহিত মিশিয়া গেলেন, কেহ কেহবা গগনপথে অলক্ষ্যে থাকিয়া রূপসুধা পান করিয়া নয়ন তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সকলেই দ্বিজ সনাতন মিশ্রের ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কোন রমণী বলিলেন, 'পণ্ডিতের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। শ্রীকৃষ্ণে কন্যাদান করিয়া পণ্ডিত ধন্য হইয়াছেন এবং নানাবিধ যৌতুক প্রদান করিয়া তাঁহার অর্থের সার্থকতা করিয়াছেন।' কোন সুররমণী বলিতেছেন, 'পণ্ডিতপ্রবর সনাতন মিশ্র জামাতার বামে কন্যা বসাইয়া হোমক্রিয়া করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন নাই, তিনি অনিমেষনয়নে চাঁদমুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। এই মাধুরী হেরিলে আর কোন ক্রিয়াকর্ম্মের অবসর থাকে না, সকল কর্ম্ম এই আনন্দে পর্য্যবসিত হইয়া যায়।' কোন দেবরমণী বলিলেন, 'শুধু সনাতন মিশ্র কেন? নদীয়াবাসী ধন্য! জীব যাহা সাধন করিয়া পায় না, যে বিশুদ্ধ বিশ্ববিমোহনরূপ জীবের ধ্যানের বস্তু, যে মাধুরী

দর্শনে ও যাহার সতত অনুধ্যানে জীব জগতের আবিলতা ছাড়াইয়া যাইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়, সেই যুগলমাধুরী নদীয়াবাসীর ভাগ্যে সুপ্রকাশিত হইয়াছে।' এই দেবরমণীটী আবার বলিতেছেন, 'নদীয়াবাসীদের কথাই বা বলি কেন? কলির জীবমাত্রেই ধন্য! কারণ পতিপত্নী ভাবদ্বারা সকল জীবই আবদ্ধ। মায়ার অধীন জীব এই ভাব হইতে মুক্ত নহে। ইহাতে পরমানন্দ নাই, মলিনতা আছে। একটী জীব আর একটী জীবের পতি সাজিয়া রহিয়াছে। ইহাতে একটী অন্ধ আর একটী অন্ধকে পথ প্রদর্শনের ন্যায় উভয়েই বন্ধনদশায় পতিত হইতেছে। জীব কখনো জীবের কর্ত্তা হইতে পারে না এবং সে জীব-ভাবে নিজেও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় না, অন্য জীবকেও আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ নহে। অথচ, এই পতিপত্নী ভাবের অতীত হওয়াও জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহাতে ভগবদ্ভাব অর্পিত হইলেই জড়ভাব পরিহার করা সহজ হইয়া পড়ে। মায়ারাজ্যে যে এই পতিপত্নী ভাব পরিদৃষ্ট হয়, ইহা চিদানন্দরাজ্যেরই ছায়ার ছায়া মাত্র। মায়াবদ্ধ জীব সে রাজ্যের সন্ধান জানে না। শ্রীগৌরসুন্দর দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বামে বসাইয়া আজ জীবের নিকট সেই পরমোজ্জ্বল চিদানন্দধাম প্রকাশিত করিয়াছেন। জীবের এখন আর দুঃখ নাই। সে আর বিষয়ের বিষমগর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে না। প্রকৃত পতিপত্নী ভাব কি, তাহা আজ জগতে প্রকাশিত হইল। শ্রীভগবানই যে জীবের একমাত্র পতি, জীব তাহা আজ জানিতে পাইল এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত হইয়া জীবগণ মধুরভাবে শ্রীভগবানের ভজন করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইল। নদীয়া-নাগরীগণ এ পর্য্যন্ত গৌররূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, গৌর প্রাপ্তির কোন উপায় খুঁজিয়া পান নাই। আজ হইতে শ্রীগৌরভজনের পন্থা সুগম হইল। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে অগ্রণী করিয়া নাগরীগণ অতি অনায়াসে শ্রীগৌর-সঙ্গজনিত মধুর রস আস্বাদন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল

এবং নাগরীগণের এই আদর্শ মধুরভজন মানবমাত্রেই অনুকরণ করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে। তাই বলিতেছিলাম, কলির জীব ধন্য! যুগযুগান্তর ধরিয়া যোগিঋষিগণ যে পরমপুরুষের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া তৃপ্ত মনে করিয়াছিলেন, সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষ ভজন-আদর্শ জীবের নিকট প্রচার করিবার নিমিত্ত সেবাসেবকভাবে যুগলরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। জীবের এইরূপ অনুধ্যানে স্বতঃই প্রেমের উদ্বোধন হইবে। এই পঞ্চমপুরুষার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত জীবের আর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইবে না।' সুরনারীগণ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এইরূপ কথা বলিতে বলিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

এই যে সুররমণীগণের কথোপকথনের বিষয় বলা হইল, ইহা কল্পনার কথা নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের বিবাহলীলা যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তদবলম্বনেই এই সকল কথা বর্ণনা করা হইল; ইঁহারা ভক্ত—সত্য, শিব এবং সুন্দরের উপাসক। সত্যে ইঁহাদের দৃঢ়নিষ্ঠা। মিথ্যাকথা বলা বা অনুভবের অতিরিক্ত বিষয় অতি-রঞ্জিত করিয়া বলা ইঁহাদের স্বভাব নহে। ইঁহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কথা এই—শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় এই সময়কার লীলাদর্শনকারী সকলেরই দিব্যচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছিল, চতুর্দ্দিক্ দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গের দোলায় চড়িয়া আগমন সময়ে কত অন্ধ তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত বড় সাধ করিয়া পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গেরই কৃপায় দৃষ্টি পাইয়া তাঁহার দিব্যরূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই রূপ লোকাতীত রাজ্যের দর্শন পাওয়া জীবের স্বাভাবিক, ইহাই জীবের সহজ অবস্থা, না দেখাই অস্বাভাবিক। জীব স্বভাবতঃই শ্রীভগবানের নিত্যদাস। শ্রীভগবান পূর্ণ চিদানন্দময়।

প্রভু ও দাস একই ধর্ম্মবিশিষ্ট, জীবও তাই স্বভাবতঃ চিন্ময়। মায়ার অধীন হইয়া জড়ভাবে আবদ্ধ বলিয়াই জীব স্বীয় স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ। স্বরূপ অবধারণে সমর্থ হইলেই অর্থাৎ জীব যে চিন্ময় এবং সে মায়ার অতীত, ইহা ধারণা করিতে পারিলেই লোকাতীত দর্শন হয়। সেই সময় পূর্ণ চিদানন্দময় শ্রীগৌরবিগ্রহের লীলাবিলাসের কালে তাঁহারই কৃপাশক্তিতে স্বভাবতঃই উপস্থিতজনগণের চিন্ময়ভাব উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল এবং সকলেই চিন্ময়রাজ্যের লীলা দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাই যে, কলির জীবের ভাগ্য লোভনীয় দেখিয়া স্বর্গের দেবদেবীগণ পর্য্যন্ত কেহ মানবরূপে কেহবা অলক্ষ্যে ভূতলে আগমন করিয়া শ্রীভগবানের রূপসুধা আস্বাদন ও পরম মধুর ভজন করিতে প্রয়াস পাইবেন। সেই ভাগবতের বাক্যই কার্য্যে পরিণত দেখা গেল।

বেদবিহিত কার্য্যাদি সমাপনান্তে পণ্ডিত সনাতন মিশ্র জামতাকে লইয়া গিয়া এক গৃহে ভোজনে বসিলেন; এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়াও তরুণীগণসহ ভোজন করিতে বসিলেন। দেবী মহামায়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন। চঞ্চলের শিরোমণি নিমাইচাঁদ শ্বশুরের সন্নিধানে ভোজনে বসিয়াছেন, এখন আর তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র চঞ্চলতা নাই। এখন তিনি বিনয়ের পূর্ণ অবতার। কিন্তু এ বিনয়ের মধ্যে বয়স্কজনোচিত গাম্ভীর্য্য নাই, বালকজনোচিত সরলতা ও মধুরতা আছে। মূর্ত্তিখানি দেখিলেই স্নেহ উথলিয়া উঠে। শ্রীগৌরচন্দ্রের একটী বিশেষত্ব এই যে, তিনি যখন যে ভাবে বিরাজমান থাকিলে সেই সেই ভাব-বিশিষ্ট মানবের পরমানন্দ হয়, তখনই সেই ভাবে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেন। এখন তিনি সনাতন মিশ্রের সন্নিধানে। মিশ্র এবং মিশ্রপত্নী কত আশা ও নিরাশার বিষম দ্বন্দ্বের পর আজ সম্মুখে জামাতৃরতন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা নাই। এই আনন্দে তিনি কত ধন রত্ন দান করিয়াছেন। নবদ্বীপ ও নিকটস্থ

জনপদবাসী কত ব্রাহ্মণ-সজ্জন, কত দীন-দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিতুষ্ট করিয়া ভোজন করাইয়াছেন, কত কাঙ্গালীকে অন্নবস্ত্র দান করিয়াছেন, গীত বাদ্যাদি দ্বারা সকলকে কত আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি অসমর্থ ব্যক্তিবর্গের গৌররূপ দর্শনে আগমনের সুবিধার নিমিত্ত কত অর্থ ব্যয় করিয়া পথ ঘাট সুগম করিয়া দিয়াছেন। এখন এই উৎসবাদির পর পণ্ডিত সনাতন মিশ্র জামাতৃরতনকে লইয়া ভোজনে বসিয়াছেন। দেবী মহামায়া পরিবেশন করিতেছেন। জামাতাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া আজ সাধ পূর্ণ করিবেন। বাড়ীতে কর্ম্মের ভীড় থাকিলেও জামাতার জন্য দেবী মহামায়া নিজেই কত বিবিধ অন্নব্যঞ্জন পায়স-পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন উহা এক এক করিয়া দিতেছেন, আর শ্রীগৌরচন্দ্র উহা একে একে আস্বাদন করিতেছেন। পণ্ডিত সনাতন মিশ্র ঐ চাঁদ বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন। দেখিতেছেন, সরলতার খনি শ্রীমুখখানি দিয়া লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে, শ্রীঅঙ্গ দিয়া এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিনির্গত হইতেছে। সনাতন মিশ্র নিজে আর কি আহার করিবেন? জামাতাকে দেখিয়া তাঁহার সকল ক্ষুধার শান্তি হইয়াছে, তিনি কেবল অনিমিষনয়নে রূপরাশি এবং অপার মধুরিমা দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন। কখন বা মধ্যে মধ্যে দুই একটী স্নেহমাখা কথা কহিতেছেন এবং তাহার উত্তরে শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখবিনিঃসৃত বচনামৃতে শরীর ও মন সিঞ্চিত হইতেছে।

দেবী মহামায়ার সমবয়স্কা নারীগণ অদূরে থাকিয়া মাধুরী দেখিতেছেন, দেখিয়া জগৎ সংসার ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরচন্দ্র ধীরে ধীরে আহার করিতেছেন। শ্বশুর, শাশুড়ী ও উপস্থিত রমণীবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত পরিমাণ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক আহার করিতেছেন; এমন কি এই সময় বিশ্বম্ভরের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া অনেক আহার করিতে হইয়াছিল,

কিন্তু মাধুর্য্যের আতিশয্যে ইহা কেহ বুঝিতে পারিয়াছিল না। বরং তিনি অধিক পরিমাণে আহার করায় সকলেই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাতে ভাবেরই পরিপোষণ করা হইয়াছিল। দেবী মহামায়ার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই আনন্দে তিনি গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া আর কিছু জানেন না। উভয়ত্রই তিনি পরিবেশন করিতেছেন। সারাদিন পর্য্যন্ত কন্যার আহার হয় নাই। পরদিন আবার কন্যা নিমা'য়ের সহিত চলিয়া যাইবেন। সুতরাং আজ তিনি কন্যাকে অতি যত্ন করিয়া, অতি আনন্দের সহিত খাওয়াইতেছেন। তবে কন্যাকে বলিয়া কহিয়া খাওয়াইবার ভার প্রায়ই তরুণীগণের উপর পড়িয়াছে। এই তরুণীগণ এক সঙ্গে আহার করিতে বসিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া কোন দ্রব্য খাইতে না চাহিলেও সঙ্গিণীগণ এক একজন এক একটী দ্রব্য তাঁহার শ্রীমুখে তুলিয়া দিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া উঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন এবং তিনিও ভাল ভাল দ্রব্য বাছিয়া লইয়া সঙ্গিনীগণের মুখে তুলিয়া দিতেছেন। দেবী মহামায়া বালিকাগণের এই অপূর্ব্ব প্রীতি-ভোজন অবলোকন করিয়া আনন্দে আর থই পাইতেছেন না। এই রূপে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভোজন-বিলাস শেষ হইল।

ভোজনের অবসানে তরুণীগণ বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বাসর ঘরে যাইবেন। সেখানে যাইয়া যুগল-মাধুরী হেরিয়া জীবন ধন্য করিবেন। তাঁহারা গৌররূপ দর্শন করিয়াছেন, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, লুব্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের কেহই শ্রীগৌরাঙ্গের যোগ্য নহেন; শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপ ভুবনমোহন, তাঁহারা সেরূপ ভুবনমোহিনী নহেন; তিনি যেরূপ বল্লভ, তাঁহারা তদনুরূপ বল্লভা নহেন; তিনি যেরূপ প্রেম ও লাবণ্যের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি, তাঁহাদের মধ্যে তাহার বিন্দুমাত্র প্রেম ও লাবণ্য নাই। সুতরাং তাঁহারা কখন এরূপ স্পর্দ্ধা

করিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের ভাগ্যে শ্রীগৌরচন্দ্রের সঙ্গলাভ হইবে। তাই তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া এ পর্য্যন্ত নীরব ছিলেন। এখন দেবী বিষ্ণু-প্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরচন্দ্রের মিলনে তাঁহাদের শুভ সুযোগ উপস্থিত হইল। প্রেমের স্বভাব এই, নিজে উপভোগ করিয়া সুখ পায় না। যাঁহাকে ভাল-বাসা যায়, তাঁহারই প্রীতি জন্মাইতে পারিলে আনন্দ হয়। আর কামের স্বভাব এই, নিজে উপভোগ করিবার জন্যই প্রবল বাসনা হয়। ফলে, কামে জ্বালা উপস্থিত হয়, প্রেমে আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সাধারণ জীবভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, একটী সুন্দর লোভনীয় সামগ্রী দেখিতে পাইলে তাহা নিজেরই ভোগ করিতে সাধ হয় এবং তাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত কত দুর্ভোগ ভুগিতে হয় এবং অবশেষে উহা প্রাপ্ত না হইলেও জ্বালা উপস্থিত হয়, প্রাপ্ত হইলেও সাময়িক সুখ-ভোগের পর প্রবলতর স্বার্থসাধনের বাসনার সমুদয়ে আর এক নূতন জ্বালা-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আর এক কথা, জীবগণের মধ্যে দেখা যায় যে, যিনি যে বস্তু পাইবার জন্য বাঞ্ছা করেন, সেই বস্তুটী তাঁহার ভাগ্যে না আসিয়া অন্যের করায়ত্ত হইলে তাঁহার পরিতাপের সীমা থাকে না,—ঈর্ষা, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি অসুর-ভাবের সমুদ্রেক হয়। কিন্তু গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ এক অভিনব ব্যাপার দেখিতে পাই। শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার হইলেন, নাগরীগণ ইঁহাকে স্বীয় স্বামিরূপে পাইলেন না। এমন ভুবন দুর্লভ বস্তুটী তাঁহারা স্বামিরূপে পাইলেন না বলিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ঈর্ষ্যা দ্বেষের সঞ্চার হইল না ; বরং, তাঁহাদের প্রেমময়ের পূর্ণ অনুরূপা নিত্যানন্দময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রেমস্বরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলাবিলাসের পূর্ণ সহায়া দেখিয়া তাঁহারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ, তাঁহার কার্য্যও চিন্ময় ; এখানে মায়া ও জড়তার লেশ মাত্র নাই। কাজেই তরুণীগণ এখন মধুর রস আস্বাদনের নিমিত্ত বাসর ঘরে

যাইয়া যুগলমাধুরী হেরিতে বড় ব্যস্ত হইয়াছেন! কুলরমণীগণের পর-পুরুষের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্কোচে আকর্ষণ একমাত্র শ্রীগৌরচন্দ্রেই পরিদৃষ্ট হয়। ইহা জীবভাবের অতীত, ইহাতেই প্রতীতি হইবে, শ্রীগৌর-চন্দ্র কি বস্তু!

নব নব তরুণীগণের প্রাণ মন কাড়িয়া লইয়া নদীয়া-বিনোদ গৌরচন্দ্র দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াসহ বাসর ঘরে প্রবেশ করিলেন। নাগরীগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা সুমধুর ছাঁদে কনক-প্রতিমা দুইটী বসাইয়া অনিমিষ-আঁখিতে মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কাহারও শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে সাধ হইয়াছে, তাই ধীরে ধীরে অতি যত্ন সহকারে পরম প্রেমভরে চন্দন ও বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য অঙ্গে মাখাইতে লাগিলেন। প্রভুর অঙ্গ নবনীত হইতেও কোমল, তাই, যিনি চন্দনাদি লেপন করিতেছেন, তিনি অতি সাবধানে, অতি ভয়ে ভয়ে স্বীয় হস্ত সঞ্চালন করিতেছেন, পাছে শ্রীঅঙ্গে ব্যথা লাগে। কেহ হাসি হাসি মুখে তাম্বুলবীটিকা সাজাইয়া সম্পুটে করিয়া কত রঙ্গভরে সম্মুখে রাখিলেন। কোন কোন নাগরী কত কৌতুক করিতে লাগিলেন, আর রসিক-শেখর শ্রীগৌরচন্দ্র উহার প্রত্যুত্তর প্রদানে তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। সুচিক্কণ-কেশে মালতীর মালা জড়াইয়া দিলেন। শ্রীমুখখানি অলকাতিলক দ্বারা সুশোভিত করিয়া দিলেন, গলে যূথী, বেল, বকুল প্রভৃতি সুগন্ধি সুমধুর পুষ্পের কলিকাদ্বারা সুচিক্কণ মালা গাঁথিয়া লহরে লহরে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিলেন। বাহুতে, মণিবন্ধে এবং অন্যান্য স্থানে সুচারু বিবিধ পুষ্পের বিবিধ অলঙ্কার রচনা করিয়া সন্নিবেশিত করিলেন। পাদদেশে রাশিকৃত কুসুম গুচ্ছ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্তরে স্তরে সাজান হইল। কয়েকজন সুনিপুণা রমণী প্রিয়াজীর পরিহিত বসনখানি বিবিধ রঙের পুষ্পের পাপড়ি দিয়া অতি মনোজ্ঞ করিয়া সজ্জিত করিয়া দিলেন। কেহ কেহ ঘরের মেজেতে পুষ্প বিস্তীর্ণ

করিয়া গৃহখানি পুষ্পময় করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর নাগরীগণ সকলেই একে একে শ্রীগৌরচন্দ্রের গলদেশে মাল্য অর্পণ করিতে লাগিলেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরও স্বীয় গলার মাল্য খুলিয়া লইয়া একে একে প্রত্যেক রমণীকে পরাইলেন। প্রত্যেক রমণীর গলদেশে মালা। সকলেই মধুর সজ্জে পূর্ব্বেই সজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন; তাহাতে আবার এখন শ্রীগৌরচন্দ্রের অঙ্গস্পৃষ্ট মালা শ্রীগৌরঙ্গেরই শ্রীহস্তদ্বারা প্রদত্ত হওয়ায় রমণীগণের এক অপূর্ব্ব মাধুরী হইয়াছে, কারণ, এই মাল্য-অর্পণে প্রেম মাখান ছিল। প্রেমে অঙ্গশ্রী মধুর হয়, ইহাতে অঙ্গ হইতে গোলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়, মুখে অপার্থিব দীপ্তি খেলিতে থাকে। শ্রীগৌর-প্রেম পাইয়া নাগরীগণেরও তাহাই হইয়াছিল। তখন প্রত্যেক নাগরীরই অঙ্গ হইতে এতাদৃশী মাধুরী এবং স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি বিকীর্ণ হইতে লাগিল যে, তাহা নয়নগোচর করিলে কোটি কোটি মদন মূর্চ্ছিত হইয়া যায়। এইরূপ মাল্য অর্পণের পর কোন রসবর্ত্তী রমণী সঙ্গীত ধরিলেন। সঙ্গীতে তিনি যুগলমাধুরী অতি সুস্বরে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, আর কয়েকজন সুকণ্ঠ রমণী তাহাতে যোগদান করিলেন। কোন লাজুকা রমণী ঘোমটার আড়ালে বঙ্কিম নয়নে শ্রীমুখ-পানে চাহিয়া কণ্টকিত-গাত্র হইলেন এবং পাছে তিনি ধরা পড়েন, এই ভয়ে সর্ব্বগাত্র বসন দিয়া ঢাকিলেন। কেহ কাহারও পাশে দাঁড়াইয়া রসের আবেশে কাঁপিতে লাগিলেন। কেহ প্রেমে অধীর হইয়া অশ্রুজল ফেলিতে লাগিলেন। কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলেই চঞ্চল হইয়াছেন, সকলেই অধীর হইয়াছেন। যাঁহারা কুলবধূ, অতিশয় গম্ভীর, লজ্জা যাঁহাদের প্রধান পাশ, তাঁহারা আজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গগুণে সকল গাম্ভীর্য্য হারাইয়া, সকল পাশ ছিন্ন করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দোষ কি? তাঁহারা সরল। যাঁহার শ্রীনাম-

গ্রহণে জীবের হাস্য ক্রন্দন নৃত্যাদি লোকাতীত আচরণ পরিদৃষ্ট হয়, সেই বস্তু স্বয়ং পূর্ণ মাধুরী বিকাশ করিয়া নাগরীগণের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন, তাই তাঁহারা চিন্ময় হইয়া গিয়াছেন, সকল বন্ধন ছুটিয়া গিয়াছে। তাঁহারা এখন স্বাধীন ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এ আনন্দের অবধি নাই। ইহা সকলেরই লোভনীয়।

নদীয়া-নাগরীগণ এইরূপে শ্রীগৌরচরণে বিনামূল্যে বিক্রীত হইয়া নিজেরাও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীগৌরচন্দ্রেরও আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। বাড়ীতে আনন্দ স্রোতের বিরাম নাই। সনাতন গোষ্ঠীসহ আনন্দে বিভোর আছেন। প্রাতঃকালে কুষণ্ডিকাদি কর্ম্ম যথারীতি সমাপ্ত হইল। তখন গৌরচন্দ্র স্বীয় ভবনে যাইবার জন্য মিশ্র মহোদয়কে নিবেদন করিলেন। তিনি গমনের উপযোগী সর্ব্ববিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবসের শেষভাগে গমনের সময় উপস্থিত হইল। অঙ্গনে শঙ্খের বিজয়-নিনাদ সমুত্থিত হল। ইহা যেন জীবকুলকে ইঙ্গিতে বলিয়া দিল যে, শ্রীভগবানের মধুর-ভজন সকল ভজনের সার, সকল ভজনের পরিসমাপ্তি। জীবকে এই রসের আস্বাদন করিতে অধিকার দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যুগলরূপে স্বগৃহে প্রত্যাগমনের সময় সকলের নয়ন-গোচর হইবেন। বাদ্য-ধ্বনিতেও চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। তাহারাও নদীয়ানগরে শুভবাণী ঘোষণা করিল। নারীগণ ঘন ঘন হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল। বিপ্রগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন পণ্ডিত সনাতন ও তাঁহার গৃহিণী দেবী মহামায়া মাল্য চন্দন লইয়া কন্যা ও জামাতাকে সুন্দর করিয়া সাজাইলেন, সাজাইয়া শেষে শিরে ধান্য দূর্ব্বাদি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া জনক জননীর মুখপানে চাহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তখন সনাতন কাতরকণ্ঠে নিমাইচাঁদকে বলিলেন—"নিমাই, আমি তোমাকে কি বলিতে জানি! তুমি নিজগুণে আমার কন্যা লইয়াছ। তোমার যোগ্য আমি কি দিব! তুমি আমার জামাতা, ইহাতে আমি ধন্য! আমার আলয় ধন্য! আর তোমার অই পদ লইয়া আমার বিষ্ণুপ্রিয়া ধন্য!" ছল ছল আঁখিতে গদগদ বচনে এই কথা বলিতে বলিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার কর লইয়া সনাতন শ্রীমতীকে প্রভু-বিশ্বম্ভরের শ্রীহস্তে সমর্পণ করিলেন, অমনি ঝর ঝর নয়নের ধারা গণ্ড বহিয়া ক্রমে সমস্ত বক্ষোদেশ প্লাবিত করিয়া পরিহিত বসন পর্য্যন্ত ভিজাইয়া দিল। দেবী মহামায়া সন্নিকটেই আছেন। এপর্য্যন্ত তিনি নীরবে অশ্রুপাত করিতে-ছিলেন। সনাতনের অশ্রুপাত ও শোকাবেগ দেখিয়া তাঁহার দুঃখ আরও দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। নিকটে যে সকল পুরনারী ছিলেন, তাঁহাদেরও সাধের বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারাও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুপ্রিয়ার স্নেহে বিহ্বল ছিলেন, এখন আর একটী বস্তু আসিয়া তাঁহাদের হৃদয় আরও আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। এখন কেবল মাত্র বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহে বিকল নহেন। তাঁহাদের বড় আদরের ধন, অনেক দিনের আশার পর যে ধন তাঁহাদিগের ভাগ্যে আসিয়া সমুদিত হইয়াছেন, সেই প্রাণের পরম প্রিয়বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বিরহও তাঁহাদের হৃদয়খানি বিকল করিয়া দিল। চারিদিকে মঙ্গলধ্বনি সমুত্থিত হইল। শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতির মধুরনিনাদে চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল যে, শ্রীগৌরাঙ্গ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বনয়ন-গোচর হইবেন এবং রূপ ও প্রীতির পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া জীব নয়ন সার্থক করিবে; যুগল হইয়া ধূমধামের সহিত জীবগণকে দর্শন দিতে দিতে যাওয়ার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, এই পরিপূর্ণ রূপ জীবের আস্বাদ্য,

ইহাই জীবের আরাধ্য। এই শুভসংবাদ পাইয়া জীবগণ আনন্দিত হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এদিকে পণ্ডিতের গৃহে এক তরঙ্গ উঠিয়াছে। গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহে সনাতন ও দেবী মহামায়া বিহ্বল হইয়াছেন। অবশেষে নদীয়াবাসী স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় জীব-গণের যুগলমাধুরী দেখিবার আগ্রহাতিশয্যে অলক্ষিতে এক শক্তি আসিয়া সনাতনের হৃদয়ে ক্রিয়া করিল; সনাতন মিশ্র অনেক যত্নে ধৈর্য্য ধরিলেন। তখন তিনি তাঁহার এক মাত্র পুত্র, বিষ্ণুপ্রিয়ার কনিষ্ঠ, যাদবের হস্ত ধরিয়া নিমাইএর হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমি আর কি বলিব! তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আর তোমাদের সঙ্গে যাদবকে দিলাম। তাহার ভারও তোমার নিকট অর্পণ করিলাম। আমার কন্যা অতিশয় শিশু, গৃহ-ধর্ম্মাদি কিছুই বুঝে না। তুমিই তাহার একমাত্র অবলম্বন।" তখন দেবী মহামায়াও ক্রন্দন সম্বরণ করিলেন। করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার হস্ত চুম্বন করিলেন এবং কোলে তুলিয়া লইলেন। কোলে লইয়া দেবী বলিলেন, "বাছা, তুমি ভুবন-দুর্লভ পতি পাইয়াছ। এখন হইতে জগজ্জননী শচীদেবী তোমার মা হইলেন। সেই স্নেহস্বরূপিণী শচী-দেবীর অপত্য স্নেহ জগতে দুর্লভ। শুনিয়াছি, তাঁহার স্নেহে জীব-মাত্রেই মুগ্ধ। সে স্নেহ এ জগতের নয়; তুমি এখন সেই স্নেহের অধিকারিণী হইতেছ। তোমার আর ভাগ্যের সীমা নাই! তোমার দুঃখ কিসের! আর, এই নদীয়ানগরে নাগরীগণ সকলেই তোমার ভগিনী। ইঁহারা সকলেই শচী দেবীর স্নেহে আকৃষ্ট। তুমি তাঁদের সঙ্গ পাইয়া ধন্য হইয়া যাইবে!" তখন তরুণীগণ একে একে আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া অতি প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন, "আমরা এতদিন শচী মা'র বাড়ীতে গৌর-দর্শন করিতে যাই এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করি; কিন্তু দর্শন করিয়া সাধ মিটে নাই, কারণ তাঁহার সেবার

অধিকার প্রাপ্ত হই নাই। আজ হইতে, ভাই, তোমাকে পাইয়া আমাদের সাধ পূর্ণ হইবে। ভাই, তুমি যাও, কাঁদিও না। আমরা ত তোমার ওখানে যাবই; নদীয়ানারীগণ সকলেই এই সোণার চাঁদ শ্রীগৌরসুন্দরকে ভাল বাসেন। তুমি মনে করিতে পার, তুমি বালিকা, এই পুরুষরতনকে কিরূপে সেবা করিবে—জান না; কিন্তু, ভাই, তোমার সেজন্য চিন্তা নাই, নদীয়াবাসী আমরা সকলেই তোমার সঙ্গে আছি এবং চিরকালই তোমার সঙ্গে থাকিব। তোকে দিয়াই আমাদের আজ গৌরপ্রাপ্তি হইয়াছে। তোদের মিলনে আমরা ধন্য হইয়াছি। তোর আর দুঃখ কিসের! শ্রীগৌরাঙ্গ যার পতি, শচীমা যার শাশুড়ী, নদীয়া-নারীগণ যার সখী, নদীয়াবাসী পণ্ডিতগণ যার শুভানুধ্যায়ী, তার আবার দুঃখ কিসের! তুই ভাই কাঁদিস্ না।” এই বলিয়া তরুণীগণ অঞ্চল দিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রুজল মুছাইয়া একে একে গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন এবং শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন “বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদের প্রাণ, ইহাকে আজ তোমার হাতে ধরিয়া দিলাম। শিশুকাল হইতে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, তোমা ছাড়া এ কিছু জানে না, তোমার নাম শুনিয়া এ শিহরিয়া উঠিত, তোমার গুণকীর্ত্তন হইলে কাণ পাতিয়া শুনিত। তোমাকে সে দেখিয়াছে অবধি সর্ব্বদাই তোমার চিন্তায়, তোমার ধ্যানে তন্ময় থাকিত। তোমাকে আমরা আর কি বলিতে জানি! তুমি ত সকলই জান! তুমিই যেরূপ তোমার তুলনা, এই বালা বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ। তাহার সমান প্রীতির খনি দ্বিতীয় আর নাই, তাই তোমার অঙ্কশোভনা হইয়াছে। দেখিও, তাহাকে কোনরূপ দুঃখ দিও না।” এই বলিতে বলিতে বধূগণ বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীহস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ইঁহাদের সকলের প্রীতি ও আদরে মুগ্ধ হইলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

সকলের নিকট হইতে এইরূপে বিদায় লইয়া প্রভু শুভক্ষণে মনুষ্যযানে চড়িলেন। নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পবিত্র হইল। আকাশ ভেদ করিয়া হরিধ্বনি সমুত্থিত হইল। এ বিবাহ,—এ মধুর মিলন এ জগতের নয়। এই মিলনে সকলেই অপ্রাকৃত চিদানন্দধামের আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই স্বভাবতঃই সকলে হরিধ্বনি দিতে লাগিলেন। বিনোদ-মন্থরগতিতে সকলে চলিতে লাগিল। ব্রজের ভূষণ গৌরবিধুবর প্রেয়সীর সহিত চৌদোলের মধ্যে পরম অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিলেন। ঝলকে ঝলকে রূপের অমিয়-প্রবাহ উচ্ছলিত হইল। বাদকগণের বাদ্য, নর্ত্তকবৃন্দের নৃত্য, গায়কগণের সুমধুর গীতি, স্বরবিদ্‌গণের তানলয়সহকারে নব নব স্বর আলাপন, বন্দিগণের মনোমোদ নব নব মধুময় গৌরচরিত উচ্চারণ, পুলকিত তনু বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের উচ্চৈঃ বেদধ্বনি, অসংখ্য সুরনরগণের ঘন ঘন করতালধ্বনি এবং অবিরত জয় জয় শব্দ ও বালকগণের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও আনন্দকোলাহল দশদিক আনন্দময় করিয়া তুলিল। দেবমানবগণ সকলেই অবিরলধারে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাস্তা পুষ্পময় হইয়া গেল। সর্ব্বভুবনের সার শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া দর্শনের নিমিত্ত রাস্তার দুই ধারে অসংখ্য নরনারী ধাইয়া আসিল। যাঁহারা অতিশয় বিদ্বান্, পণ্ডিত এবং গম্ভীরপ্রকৃতি, তাঁহারাও এক অননুভূতপূর্ব্ব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। মৃগগণ কানন ত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া আসিল। রাস্তার উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজী পক্ষিসমাকুল হইল। কোথাও পাখীগণ নীরবে বসিয়া রূপ দর্শন করিতে লাগিল। কোথাও বা উহারা আনন্দে অপূর্ব্ব কুজন ও নৃত্য করিতে লাগিল। কোথাও বা বিহগকুল আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলেই এই মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতি ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। সমগ্র নদীয়ায় কেন, সমগ্র জগতে যেন এক সুখস্রোত প্রবাহিত

হইল, জীবগণ তাই সকলেই আনন্দে বিহ্বল। শ্রীগৌরচন্দ্র এইরূপে বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া সকলকে আনন্দ প্রদান করিতে করিতে নদীয়া-নগর ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার কিঁয়ৎপূর্ব্বেই সুরধুনীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরধুনী উদ্বেলিত হইয়া তরঙ্গচ্ছলে আনন্দ প্রকাশ করিল। এখানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া প্রভু সুরধুনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন নদীর অপর তীরে আসিয়া অসংখ্য নরনারী মিলিত হইলেন। যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারা পূর্ব্বেই নদী পার হইয়া নদীয়ায় আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা আসিতে পারেন নাই, তাঁহারা এখন সুরধুনী তীরে আসিয়া দূর হইতেই গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া দর্শন করিয়া জীবন ধন্য মনে করিলেন। এদিকে নদীয়ানাগরীগণ পূর্ব্বেই শচীর প্রাঙ্গণে আসিয়া অঙ্গন খানি উজ্জ্বল করিয়াছেন। বৃদ্ধাগণ আসিয়া শচীমা'র সহিত মিলিত হইয়াছেন। দূর হইতে বাদ্যধ্বনি শুনিয়াই শচীমা'র হৃদয়খানি আনন্দোৎফুল্ল হইয়াছে। তাঁহার পরম আনন্দ—গৃহে বধূ আসিতেছেন। ক্রমে যখন বালিকাকুল, তরুণীবৃন্দ এবং তাঁহার সমবয়স্কা বৃদ্ধাগণ আসিয়া অঙ্গন পূর্ণ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি আনন্দে অধীর হইয়া কাহারও গলা ধরিয়া পরম প্রীতি জানাইলেন, কাহাকেও আলিঙ্গন করিলেন, কাহারও ওষ্ঠদেশ ধরিয়া কত সোহাগ করিলেন, কাহারও গণ্ডদেশে চুম্বন প্রদান করিলেন, কাহাকেও কোলে লইয়া আদর করিলেন। আর সকলকেই কত মধুরস্বরে বলিলেন, "তোমাদের বাড়ীঘর, তোমাদের নিমাই, নিমাই আমার একলার নয়। তোমরা সবে বউমাকে সাজাবে, খাওয়াবে, পরাবে। এখানি তোমাদের আপনার বাড়ী করিয়া লও। আমি তোমাদিগকে আপন করিতে জানি না।" শচীদেবীর বিনয় মধুরবাক্যে, তাঁহার পরম প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই আপ্যায়িত হইতেছেন। সকলেই গৃহকর্ম্ম, সাজসজ্জা প্রভৃতিতে ব্যস্ত হইয়া আনন্দে ছুটাছুটী করিতেছেন, এমন সময় অদূরে

আনন্দকোলাহল শ্রুতিগোচর হইল। সকলের আনন্দ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে গোধূলি সময়ে শ্রীগৌরচন্দ্র প্রিয়াজীকে লইয়া স্বীয় ভবনে আগমন করিলেন। ভবনের প্রবেশদ্বারে আসিয়া উভয়ে দোলা হইতে অবতরণ করিলেন। তখন বিশ্বম্ভর শ্রীহরি বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীহস্ত ধরিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। শচীদেবী অগ্রবর্ত্তী হইয়া নিমাইচাঁদের চাঁদবদনে চুম্বন দিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে শত শত চুম্বন দিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন, কোলে লইয়া আনন্দবিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন নিমাইএর মাসীমা চন্দ্রশেখরপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে শচীমা'র কোল হইতে স্বীয় কোলে লইয়া গেলেন এবং সেই চন্দ্রবদনে চুম্বন প্রদান করিয়া তিনিও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া একে একে শচীদেবীর সমবয়স্কা নারীগণের ক্রোড়দেশে শোভা পাইলেন এবং সকলেই আনন্দে অধীর হইলেন। অতঃপর ইঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়াকে তরুণীগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া সমাগত জনগণের অভ্যর্থনা ও আহারাদির বন্দোবস্তের জন্য গমন করিলেন। শচীমা'র আনন্দের পার নাই। বাড়ীখানি লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তিনি সকলকে নানাদ্রব্য অর্পণ করিতে লাগিলেন। দ্রব্যের লোভে কেহ আগমন করেন নাই। সকলেই যুগলমাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছেন। ভোগের নানাবিধ বিলাসসামগ্রী পাইয়া যত সন্তোষ, যুগলমাধুরী অবলোকনে তদপেক্ষা কোটিগুণে লোকের সন্তোষ হইয়াছে। কিন্তু শচীদেবী তাহা দেখিবেন কেন? তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া সকলকে ধনরত্নাদি নানাবিধ প্রচুর সামগ্রী দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয়। নদীয়ানগরের সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী জমিদার, শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান এই ভাণ্ডারের ভার লইয়াছেন। শ্রীভগবানের নরলীলা এবং এই লীলামাধুরী দ্বারা জীবকে আকর্ষণ করা হইয়াছে। বিধি-মহেন্দ্রাদিও তাই বুদ্ধিমন্ত খানের সহায়তার নিমিত্ত ভাণ্ডার সর্ব্বদাই পূর্ণ রাখিতেছেন।

এদিকে তরুণীগণ শ্রীগৌরচন্দ্র ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে মধ্যে রাখিয়া সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলেন। এই সময়ে শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহার স্নিগ্ধ মধুরিমা বিকাশ করিলেন। তাঁহার রূপের ছটায় চারিদিক আরও উদ্ভাসিত হইল। তিনি তখন মধুর ব্রজের বিপিনকুঞ্জ এবং শ্রীরাধা ও সখিগণের পিরীতি স্মরণ করিয়া অধিক অবশ হইলেন। তাঁহার অরুণ-নয়ন দিয়া প্রেমের স্নিগ্ধমধুর কিরণ বিচ্ছুরিত হইল। মহাভাবময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজধামের রাসলীলা ও নিকুঞ্জ বিহার স্মরণ করিয়া প্রেমে গর গর হইলেন। আর, নাগরীকুলেরও রাধা-কৃষ্ণের মিলনমাধুরী ও তদ্দর্শনে গোপিকাবৃন্দের মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া কীর্ত্তন ও নর্ত্তন মনে পড়িল। তাঁহারাও তাই আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তখন কাঞ্চনা ও অমিতপ্রভা প্রভৃতি সখিগণ আরতি আরম্ভ করিলেন। কোন সখী সপ্তপ্রদীপ লইয়া আরতি করিলেন। তাঁহার আরতি করা শেষ হইলে আর এক সখী আসিয়া ধূপ ও অন্যান্য নানাবিধ সুগন্ধি দ্বারা আরত্রিক করিলেন। কোন সখী সুকোমল চিরুণী লইয়া উভয়ের চিক্কণকুন্তল বাঁধিয়া দিয়া উহা রঙ্গণ, মালতী যূথী, পারুলী, বকুল প্রভৃতি নানা ফুলে সজ্জিত করিয়া দিলেন। কেহ মণিমুকুতার হার গাঁথিয়া বক্ষোদেশে লম্বিত করিয়া দিলেন। কেহ কুঙ্কুমে চন্দন মিশাইয়া উহা শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া দিলেন। সকল সখীই স্ব স্ব রুচি অনুসারে সেবা করিতে লাগিলেন। কোন সখী আনন্দে বিহ্বল হইয়া গান ধরিলেন, আর অন্যান্য অনেক সখী সেই সঙ্গে সুর মিশাইয়া গান করিতে লাগিলেন। এ গীতি এ জগতের নয়। ইহাতে আবিলতা নাই, ইহা আনন্দেরই বহিরভিব্যক্তি। শুদ্ধবস্তুর সংসর্গে জীব নির্ম্মল হইয়া গেলে স্বাভাবিক প্রেমের উদ্বোধন ও বাহ্যস্ফুরণে আপনা হইতে যে গীতিকা বাহির হয়, নাগরীকুল সেই গীতিকাই গাহিলেন; তখন আর কাহারও এ জগতের কিছুমাত্র স্মৃতি রহিল না। সকলেই উভয়ের মুখ-

চন্দ্রমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। তাঁহারা দেখিতেছেন গা-খানি কেমন কোমল! কেমন মধুর! যেন অমৃত-মন্থন করিয়া তাহা হইতে নবনীত তুলিয়া গৌর দেহখানি গড়ান হইয়াছে। এবং তাহাতে জগৎ ছানিয়া রস নিঙ্গাড়িয়া ঐ রস উহাতে প্রদান করা হইয়াছে, তদুপরি আবার অখণ্ড পীযূষধারা বাটিয়া আউটিয়া সেই সঙ্গে বিজুরি দিয়া উহাদ্বারা অঙ্গখানি মাজা হইয়াছে, অনন্ত অনুরাগ দিয়া আঁখি দুইটী নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। কোটি কোটি পূর্ণিমার চাঁদ দিয়া শ্রীমুখখানি মাজা হইয়াছে। বিম্বাধরে মধুর হাসিতে যেন অমিয়রাশি ক্ষরিত হইতেছে। তখন কুন্দকুসুমবিনিন্দিত দশন পাঁতি হইতে শুভ্র জোছনা বিচ্ছুরিত হইয়া কনককান্তি আরো মধুর হইয়াছে। আবার মধ্যে মধ্যে যে দু-একটী কথা কহিতেছেন, তাহা হইতে যেন মধুর ধারা বহিতেছে। লাবণ্য বাটিয়া যেন চিত্ত নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছে। সকল রসের সার গোরা-চাঁদের বিশাল হৃদয়খানি কি জানি কি রঙ্গেই গড়ান হইয়াছে! শ্রীকর-কমল ও পাদপদ্ম হইতে অপূৰ্ব্ব পদ্মগন্ধ বিনির্গত হইতেছে। অমিয়কনক জ্যোতির সহিত নখের ছটা মিলিত হওয়ায় এক অপূৰ্ব্ব উজ্জ্বলদীপ্তি হইয়াছে। মধুর লীলাবিনোদকলা দর্শন করিয়া মদন ব্যথিত হইয়া দূরে—অতিদূরে পলায়ন করিল। নদীয়ানাগরীগণ চুমুকে চুমুকে রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরচন্দ্র এইরূপে নাগরীগণকে অপার আনন্দ প্রদান করিয়া কিয়ৎ-কাল পরে উঠিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া নাগরীগণের মধ্যে রহিলেন। শ্রীগৌরচন্দ্র লোকসমুদ্রের মধ্যে আসিয়া আনন্দের ঢেউ উঠাইলেন। ভাটগণ "জয় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া" ধ্বনি গাহিলেন; আর সেই সঙ্গে অগণিত লোকের মিশ্রিত কণ্ঠে সমুত্থিত 'জয় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া' ধ্বনিতে চতুৰ্দ্দিক মুখরিত হইল, গগন-মণ্ডল বিকম্পিত হইল, নদীয়ানগরে প্রেমের প্রবাহ ছুটিয়া চলিল এবং সমগ্র

জগৎ প্লাবিত করিবে বলিয়া এই মধুর প্রবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে জীবগণের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহলীলা সম্পন্ন হইল।

(৯)

এখানে, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তত্ত্বতঃ কি বস্তু, তাহা কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক, কারণ এখন হইতেই নদীয়ার মধুর ভজন আরম্ভ হইল। নাগরীবৃন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন রূপমাধুরী অবলোকন করিয়া ভুলিয়াছেন বটে, কিন্তু নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরহরির সহিত মিলিত হইবার কোন সুযোগ পান নাই। এখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে অগ্রণী করিয়া তাঁহারা নবদ্বীপচন্দ্রের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখানে কাম নাই, শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার পবিত্র রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া মদন ব্যথিত হইয়া অতিদূরে পলায়ন করিয়াছে। এখানে বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল প্রীতি ও পরম আনন্দ; এ আনন্দের অবধি নাই, ইহা অবিমিশ্র। নদীয়ানাগরীগণের মধ্য দিয়া নদীয়ার এই মধুর রস জগতে বিস্তার করিবার জন্য এবং জগদ্বাসী জনগণকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মিলিত হইলেন। এখন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং নদীয়ার নাগরীকুল কি বস্তু, বিচার করিয়া দেখা যাউক। শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। জীবের কল্যাণার্থ তিনি দ্বাপরযুগে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ অর্থাৎ সেবক ও সেব্যরূপে শ্রীবৃন্দাবনধামে জীবের গোচর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেব্য—আরাধ্য; শ্রীরাধা সেবক—আরাধক। কিরূপে ভক্তি ও প্রেমদ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে হয়, জীবকে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় হ্লাদিনীশক্তি পৃথক্ করিয়া সেব্যসেবকরূপে প্রকাশিত হইলেন। যে শক্তিদ্বারা জীবের পবিত্র আহ্লাদ জন্মান যায়, তাহাকে হ্লাদিনীশক্তি বলে। এই হ্লাদিনীশক্তিই শ্রীরাধা। ইনি পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণও পরিপূর্ণ। পূর্ণ

হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই থাকে। শ্রীরাধা পরিপূর্ণ আদর্শ ভক্ত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর নিত্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। পুষ্প ও পুষ্পের গন্ধ যেরূপ পৃথক্ করা যায় না, অগ্নি এবং তদীয় দাহিকাশক্তি যেরূপ অবিভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাও তদ্রূপ অভিন্ন। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই এই হ্লাদিনীশক্তি আংশিকরূপে বিরাজমান। ইহা দ্বারাই জীব শ্রীরাধার অনুবর্ত্তী হইয়া ভগবৎপ্রেম অর্জ্জন করে ও আনন্দলাভে অধিকারী হয়। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই শ্রীরাধাভাব আছে, কিন্তু জীব পরিপূর্ণ শ্রীরাধা হইতে পারে না।

দ্বাপর যুগে অর্থাৎ প্রায় পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ গোলোকের প্রেমসম্পত্তি শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রকাশ করিলেন, এইটী তাঁহার মাধুর্য্যভাব। এখানে শুদ্ধ ভালবাসা। শ্রীভগবানের আর একটী ভাব আছে, সেটি ঐশ্বর্য্যভাব। বৈকুণ্ঠধামের এই ঐশ্বর্য্যভাব তিনি মথুরা ও দ্বারকাধামে প্রকাশ করিলেন। এখানে তিনি কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি ভক্তিবিরোধী অসুরবৃন্দ বধ করিলেন; কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ যুদ্ধ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রহিলেন। ধর্ম্মের এই দুইটী ভাব,—একটী অন্তরঙ্গ, আর একটী বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ ভাবে শ্রীভগবান্ মধুময়, প্রেমের অনন্ত উৎস; তিনি জীবের দোষ দর্শন করেন না, নির্ব্বিচারে সকলকে ভাল বাসেন। আর বহিরঙ্গ ভাবে তিনি দণ্ডদাতা, বিচার-কর্ত্তা, তিরস্কার ও পুরস্কারের বিধানকর্ত্তা। এই ভাবে শ্রীভগবান্ ভীতিপ্রদ বস্তু, আর অন্তরঙ্গ ভাবে তিনি আনন্দময়। বহিরঙ্গ ভাবে শ্রীভগবান্‌কে দণ্ডধারী বিচার-কর্ত্তা বলিয়া মনে করিলে, তাহাতে জীবের যে চরম লক্ষ্য আনন্দ, তাহা প্রাপ্তি দূরের কথা, মুক্তি পর্য্যন্তও হয় না। শ্রীভগবান্ তাই পরিপূর্ণ প্রেমময় ভাবে শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রকাশিত হইলেন; অর্থাৎ, এখানে তিনি কাহারও সখা, কাহারও পুত্র, কাহারও কান্ত হইলেন। এই সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাব জগতে মায়া বিজড়িত

হইয়া রহিয়াছে। জীবের এই ভাব স্বাভাবিক। ইহা জীব ছাড়িতে পারে না। কিন্তু ইহা মায়ার অধীন বলিয়া জীব ইহাতে বদ্ধ হয়। শ্রীভগবান্ ভাবিলেন, জীবের এই স্বভাবের মধ্য দিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতে হইবে। ভালবাসার শুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব কেবল যে মুক্ত হইবে, তাহা নহে, শ্রীভগবদ্ভজনানন্দও প্রাপ্ত হইবে। তাই তিনিই সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের বিষয় হইয়া জীবেয় গোচর হইলেন। জীব আবৃত ব্রহ্ম এবং শ্রীনন্দ-নন্দন, শ্রীদামাদির সখা ও শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনাবৃত ব্রহ্ম অর্থাৎ একজন মায়ার অধীন অপর জন মায়ার অধীশ্বর। সুতরাং উপরি-উক্ত রসত্রয়ের বিষয় জীব হইলে সঙ্গ প্রভাবে বদ্ধ হইতে হইবে, অর্থাৎ জীবকে পুত্র ভাবেই হউক, সখা ভাবেই হউক, আর কান্ত ভাবেই হউক, ভাল বাসিলে উহা বন্ধনের হেতু হইবে, আর শ্রীভগবানে এই রসের যে কোনটী অর্পিত হইলে মুক্তিত হইবেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-সেবা-জনিত পরমা-নন্দ প্রাপ্তি হইবে। এই সহজ ভাব লইয়া, এই প্রেমসম্পত্তি লইয়া শ্রীভগবান্ বৃন্দাবনধামে অবতীর্ণ হইলেন। বৃন্দাবনবাসী গোপনরনারী-বৃন্দ এই রস আস্বাদন করিলেন। বৃন্দাবনের বাহিরে জীব এই রসের আস্বাদন পাইল না। ঐশ্বর্য্যের মাদকতায় সুখী, অর্থাৎ, ঐশ্বর্যভাব-বিমুগ্ধ জীব এই মাধুর্য্যভাব প্রাপ্ত হইল না। শ্রীভগবান্ দেখিলেন, ভয় ও বলবীর্য্য দেখাইয়া কাহারও চিত্ত অধিকার করা যায় না; এই ব্রজভাবই সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ করিবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। তাহাতেই সকল জীব সুখে শান্তিতে থাকিতে পারিবে। এই ব্রজভাবের প্রসারেই, এই মর্ত্ত্যধামে গোলোক প্রতিষ্ঠিত হইলেই বিশ্ব-সংসার পূর্ণসুখময় ধাম হইবে। তিনি ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া বৃন্দাবনের বাহিরে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিলেন। ইহাতে কত শত্রু সংক্ষয় করিতে হইল, কিন্তু তথাপি সকলে আকৃষ্ট হইল না, এই ধর্ম্ম-রাজ্যে কেহ পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইল না; এমন কি, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা পর্য্যন্ত

শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্ত হইয়াও নিরাকাঙ্ক্ষ হইলেন না; তাঁহাদের আরও কিছু আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু রহিয়া গেল; তাই তাঁহারা স্বর্গে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাহাও আবার ভালরূপে ঘটিয়া উঠিল না। যখন এই পঞ্চ-ভ্রাতারই এই অবস্থা, তখন তাঁহাদের ধর্ম্ম-রাজাস্থিত প্রজাবৃন্দের ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু শুদ্ধাবস্থা মনে করা যায় না। দ্বারকাধামে যে শ্রীকৃষ্ণ সংসার পাতিলেন এবং মথুরাধামে রাজা হইলেন, এই রাজত্বে ও সংসারেও তিনি তাহাই দেখাইলেন। এই সকল স্থানে কেহ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষা করিলেন না। তাঁহার নিকট সকলে ঐশ্বর্য্যরূপ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন, এবং তাহাই পাইলেন, কিন্তু তাহাতে জীবের সংসার গেল না, কাজেই আনন্দও হইল না। বৃন্দাবনধামে এই ঐশ্বর্য্যের লেশ নাই। এখানে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অন্তরালে লুক্কায়িত। উত্তরোত্তর মাধুর্য্যের বৃদ্ধির নিমিত্তই ঐশ্বর্য্য গোপনে সহায়তা করিয়াছে। এখানে যে পুতনা-বধ, বকাসুর প্রভৃতির বিনাশ, ইহা ঐশ্বর্য্য ভাবোচিত বলবীর্য্য দ্বারা নহে। মাধুর্য্যের প্রাবল্যেই অসুরভাব আপনা হইতে দূরে অপসৃত হইয়াছে। জীবের মধ্যে দুইটি ভাব আছে, একটী প্রেমের ভাব, আর একটী অসুর ভাব। একটী ভাবের আধিক্যে অপর ভাবটী আপনা হইতেই দূরে সরিয়া যায়। এই যে শ্রীকৃষ্ণ পুতনা বধ করিয়া-ছেন বলিয়া খ্যাতি আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই, বালঘ্নী পুতনা রাক্ষসী অসুরভাব দ্বারা বালক কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত স্তনে বিষ মাখাইয়া বাহিরে মাতৃভাবের ভাণ করিয়া মা যশোদার গৃহে উপনীত হইলেন। মা যশোদা বাৎসল্য-রসে এতই আত্মহারা যে, তিনি কাহারো দোষ দর্শন করিবার অবসর পাইতেন না। পুতনা আসিলে তিনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভাবিলেন, "ইনিও আমার কৃষ্ণকে ভালবাসেন।" তাই তিনি পুতনার নিকট অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার প্রাণের গোপালকে

রাখিয়া গেলেন। পুতনা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিয়া স্তনপান করাইতে লাগিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ প্রেমময়, বাৎসল্য রসের পরিপূর্ণ বিষয়। সুতরাং তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে এবং বালক-ভাবে পুতনার স্তনপান করণে তাঁহার রাক্ষস-ভাব দূরীভূত হইল ও মাতৃভাব প্রবুদ্ধ হইল; অর্থাৎ পুতনা রাক্ষসী মরিয়া গেলেন; মরিয়া মাতৃগতি প্রাপ্ত হইলেন— প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবন-ধামের এমনই প্রভাব! এইরূপ বৃন্দাবনে ও বৃন্দাবনের বাহিরে দুই জায়গায় দুই ভাবে লীলা করিয়া শ্রীভগবান্ মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রভাব দেখাইলেন। ব্রজবাসী জনগণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কিছু কামনা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যিনিই যে রসের আস্বাদন করুন, তিনি সেই রসেই নব নব ভাবে আনন্দ প্রাপ্ত হন। শ্রীরাধাভাবে অর্থাৎ মধুর রসে সকল রসের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেন, এই ব্রজরস সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক, সকল জীব এই প্রেমরস দ্বারা আকৃষ্ট হউক, গোলোক ভূলোকে স্থাপিত হউক। তাহা হইলেই এই জগৎ আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইয়া যাইবে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাসহ মিলিত হইলেন। উভয়ে মিলনানন্দে বিভোর, এমন সময় হঠাৎ শ্রীরাধা দেখিতে পাইলেন, একটি নবীন কিশোরবয়স্ক গৌরবর্ণ পুরুষ আসিয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন; অশ্রুকম্পপুলকাদি ভাবাবলীতে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শোভিত। শ্রীমতী রূপ-মাধুরী দেখিয়া আত্মহারা হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আবার দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে। তখন তাঁহার লজ্জা ও ধিক্কার উপস্থিত হইল। তিনি কৃষ্ণগতপ্রাণা, কৃষ্ণ ব্যতিরেকে তিনি আর কিছুই জানেন না। আজ সহসা কোন গৌরবর্ণ পুরুষ আসিয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করায় তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে স্বীয় প্রাণনাথের নিকট বলিলেন, "নাথ, আমি তোমার নব-

জলধররূপ ছাড়া আর কিছুই জানি না। তুমিই অনন্তরস-নিলয়। কিন্তু আজ এ কি বিপরীত দেখিলাম! রসরাজ-মূর্ত্তি এক গৌরবর্ণ পুরুষ অকস্মাৎ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। তাঁহার রূপ-মাধুরী দেখিয়া কোটি কোটি কাম মূর্চ্ছিত হয়। তাঁহার নৃত্য দর্শনে ও গীতি শ্রবণে আমার মনঃ প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার হৃদয় আকুল। এই বৃন্দাবনধামে চতুর্ভুজাদি কত দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছি। আমার মন নবজলধররূপ ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই কখনও তৃপ্ত হয় নাই। আজ এই গৌরাঙ্গরূপে আমার মন হরণ করিয়া লইল; আমার সতীত্ব ধর্ম্ম রহিল না!” ইহা বলিতে বলিতে শ্রীমতী মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, “তোমার দুঃখিত হওয়ার কারণ নাই। এই যে গৌর-স্বরূপ দেখিয়াছ, ইহা তোমার প্রেম ব্যতিরেকে অন্য কাহারো গোচর হয় না। ইহা আমারই স্বরূপ, এতদিন গুপ্ত রাখিয়াছিলাম। এই যে ব্রজধামে প্রেমের লীলা হইল, ইহা জগন্ময় ব্যাপ্ত করিতে বাসনা করিয়াছি। প্রেমই জীবের প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। ইহার পর আর প্রাপণীয় কোন বস্তু নাই। এই প্রেম হারাইয়া জীব পথভ্রান্ত হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। ইহা প্রাপ্ত হইলে জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে, জড়জগৎ চিন্ময় হইয়া যাইবে। শ্রীহীন সংসার শ্রীসম্পন্ন হইবে। সর্ব্বত্র এই ব্রজের খেলা বিস্তার করার জন্য উপায় ভাবিতেছিলাম। ভাবিলাম, তোমার প্রেম জগতে দুর্ল্লভ। তুমি ভক্তমুকুটমণি, একমাত্র তুমিই তোমার তুলনা। তোমার এই অনন্ত প্রেম-পারাবারের গভীরত্ব জীবকে দেখাইতে হইবে। তাহা হইলেই জীব আকৃষ্ট হইবে। আবার ভাবিলাম, জীব জগতের রূপে মুগ্ধ। সেই রূপ-মোহে তাহাদের বন্ধন হয়। জগতের যাবতীয় রূপ আমা হইতেই হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে মায়ার বিকার আছে বলিয়া জীব তাহাতে

নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হয় না। আমি এমন রূপ-মাধুরী লইয়া জীবের গোচর হইব, যেন জীব আর পার্থিব কামমিশ্রিত রূপ দেখিয়া না ভুলে। আর আমার সেই রূপের মধ্যে এমন একটী আকর্ষণী শক্তি থাকিবে যে, জগতের সকল রূপেই যেন জীব আমার রূপের ছায়া দেখে, সর্ব্বত্রই আমার বিকাশ দেখিতে পায়। ইহা ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলাম যে, তোমারই ভাব ও তদনুরূপ কান্তি গ্রহণ করিব। তুমি যে গৌররূপ দর্শন করিয়াছ, ইহা সেই ভাব ও কান্তিরই অনুরূপ। যে তুমি নবজলধর শ্যাম-রূপ ব্যতিরেকে অন্য কিছু জান না, সেই তুমি যখন এই গৌররূপে মুগ্ধ হইয়াছ, তখন সমস্ত জীব এইরূপে আকৃষ্ট হইবে, এই বিষয়ে আমি স্থির-নিশ্চয় হইলাম। আমিই যখন এই গৌর-স্বরূপ, তখন তোমার সতীত্ব ধর্ম্ম (অর্থাৎ একনিষ্ঠা) নষ্ট হয় নাই। এই গৌরাঙ্গ রূপেই আমি নদীয়াপুরে অবতীর্ণ হইব।"

মহাজনগণের পদাবলম্বনে উপরের এই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর কথোপ-কথন বর্ণিত হইল। এই মহাজনগণের মধ্যে একজন শ্রীজগদানন্দ। ইনি শ্রীপ্রভুর অতি প্রিয় পার্ষদ। শ্রীভগবান্ যেরূপ নিত্য, তাঁহার লীলাও সেইরূপ নিত্য, পরিকরবৃন্দও নিত্য। তাঁহার লীলা স্বপ্রকাশ। যাহার নিকট ইহা প্রকাশিত হয়, তিনিই ইহা দর্শন করিতে পারেন। ইংরাজীতে ইহাকে রেভেলেসান (Revelation) বলে। প্রত্যেক বিচারজ্ঞ চিন্তাশীল ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিবেন যে, মায়াতীত জ্ঞানা-তীত বস্তু স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে জীবে ধরিতে পারে না। প্রভুর লীলা জগদানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণের নিকট যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহারা পদে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। নিত্যবস্তুর সকলই নিত্য। ইহাতে অতিরঞ্জন বা মিথ্যাভাস নাই। গোস্বামিগণও বলেন, 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং' অর্থাৎ

'শ্রীরাধার ভাব-কান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ যে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।'

মোটের উপর কথা এই, প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব অর্থাৎ আদর্শ ভক্তভাব এবং শ্রীরাধার কান্তি অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তাকর্ষকতাগুণ লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়াধামে উদিত হইবেন স্থির করিলেন। ইহাতে শ্রীমতী উত্তর করিলেন, 'তুমি ব্রজের জীবন। তুমি ব্রজ ছাড়িয়া গেলে ব্রজবাসী কিরূপে বাঁচিবে? মীন যেরূপ জল ছাড়া থাকিতে পারে না, ব্রজবাসীও ত তোমার দর্শন ব্যতিরেকে তিলমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। এই ব্রজলীলা সাঙ্গ করিয়া তোমার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ হইবে এবং তুমি কি সুখ পাইবে তাহা তুমিই জান; আমরা অবলা, বুঝিতে পারি না। তোমার দর্শন বিনা বৃন্দারণ্যবাসী সকলে প্রাণত্যাগ করিবে, আর তুমি নদীয়া নগরে উদিত হইয়া জগতে প্রেম বিলাইবে, ইহার মর্ম্ম কি আমরা বুঝি না।'

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তুমি সেজন্য দুঃখ করিও না। এই ব্রজপুর লইয়াই নদীয়া নগরে উপস্থিত হইব। এই লীলা সেখানে আর একভাবে প্রকাশিত হইবে। এই গোপ গোপী, এই গোপাল সকলেই সেখানে যাইবে। সেখানে এই ব্রজমাধুরীর সঙ্গে আর একটী মাধুরী মিলিত হইয়া ব্রজরস আরও উজ্জ্বল হইবে।'

এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধার এই ভাবী উজ্জ্বল রস আস্বাদন করিতে লোভ হইল। শ্রীরাধা জানিলেন বটে যে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুঁহু তনু এক হইয়া অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবান্ এই দুই ভাবের পরিপূর্ণ মিলনেই শ্রীগৌরস্বরূপ হইবেন, তথাপি তিনি আবার পৃথক্ থাকিয়া এই লীলা মাধুরী আস্বাদন করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। শ্রীমতী বলিলেন, 'প্রাণনাথ, তুমি যে সকল তত্ত্ব কহিলে, তাহা সকলই সত্য;

আমি যে গৌররূপ দেখিলাম ইহাও সত্য ; এবং আমাকে যে সঙ্গে লইবে এবং দুই দেহ এক হইয়া যাইবে, ইহা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও, এই যে গৌররূপ ও তদীয় অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাবভূষা দেখিলাম, তাহাতে ইহা সম্ভব ও সত্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমার পৃথক্ থাকিয়া তোমার সেই মিলিত ভাবময় রূপকান্তি দর্শন করিতে লোভ হইতেছে, এবং সেই ভাবে তুমি যে লীলা করিবে, তাহা আস্বাদন করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা জন্মিতেছে।' শ্রীরাধার এই আকাঙ্ক্ষা শুনিয়া তাঁহাকে সেইরূপ দর্শন করাইলেন।

এখানে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মিলিত হইলেন, তথাপি শ্রীরাধা পৃথক্ রহিলেন। এই যে শ্রীরাধা বা পরিপূর্ণহ্লাদিনী শক্তি, ইনিই নবদ্বীপ লীলায় দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে। শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণসহ মিলিত হইয়াও শ্রীরাধা পৃথক্ই রহিলেন, ইহা জীববুদ্ধির অগম্য। এখন কথা এই যে, শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। জীবের কল্যাণার্থ বিবিধভাবে নরলীলা করিলেও তিনি রক্তমাংসের দেহধারী মানব নহেন—তিনি সান্ত জীব নহেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বেশ্বর। কালানুরূপ জীবের গ্রহণযোগ্য করিয়া তিনি লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে তিনি ব্রজধামে যে লীলা প্রকাশ করেন, উহাই উজ্জ্বলরূপে কলির জীবের গ্রহণোপযোগী করিয়া চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নদীয়ানগরে আবার আর এক আকারে প্রকাশ করেন। ব্রজধামে শ্রীরাধা পরিপূর্ণহ্লাদিনী শক্তি, গোপিকাবৃন্দ তাঁহার অংশভূতা, সকলেই চিদানন্দময়ী ; শ্রীরাধা কৃষ্ণ-গতপ্রাণা, গোপীবৃন্দ শ্রীরাধার অনুগতা। নবদ্বীপধামে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া পরিপূর্ণহ্লাদিনী শক্তি ; নাগরীবৃন্দ তাঁহার অংশভূতা, সকলেই চিদানন্দময়ী ; বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরগতপ্রাণা ; নাগরীকুল দেবী

বিষ্ণুপ্রিয়ারই অনুগতা। সমস্ত জীবের মধ্যেই এই নাগরীভাব রহিয়াছে। এই নাগরীভাবের উদ্বোধন হইলেই জীব প্রেমময় ঠাকুরের মধুর ভজনে অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীভগবান্ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিয়াই জীবকুলকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহাকে দিয়াই জীবকে প্রেমানন্দ প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীরাধা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া উভয়েই একই বস্তু, উভয়েই জীবের প্রতিনিধি। তবে শ্রীরাধা পরকীয়া রতির প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আর দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীয়া উভয় রতিই জাজ্বল্যরূপে বর্ত্তমান। শ্রীরাধা পরপত্নী হইয়াও স্বাভাবিক প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা। ইহাকেই বলে অহেতুক প্রেম। গোপীগণ এই প্রেমের সহায়। এই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম বিলাইবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হন। এখন পরকীয়া রতি কি দেখা যাউক। সংসার জীবের পতিরূপে প্রতীত হয়। শ্রীভগবান্ জীবের প্রকৃত পতি হইলেও মায়াবদ্ধ জীবের নিকট তিনি পরপুরুষ বলিয়াই প্রতীত হন। ভাগ্যবান্ চক্ষুষ্মান্ জীবের সংসার রূপ পতি ছাড়িয়া শ্রীভগবানের প্রতি যে স্বাভাবিক রতি, ইহাই পরকীয়া নামে অভিহিত। জ্ঞানশূন্যা ভক্তি এই রতির প্রথম স্তর এবং শ্রীরাধাভাবে ইহার পরিপূর্ণতা। ব্রজধামে শ্রীরাধাই ইহার পরিপূর্ণ আদর্শ। স্বকীয়া রতির প্রথম স্তর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এই জ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞানশূন্যা ভক্তির দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিবাহিতা পত্নীর স্বামীর প্রতি যে ভক্তি, ইহা জ্ঞানমিশ্রিত—হেতু জনিত। যেহেতু তিনি স্বামী, সেই হেতু তাঁহার প্রতি ভক্তি; কারণ, তাঁহাকে ভক্তি না করিলে প্রত্যবায় হয়; আর তিনি ভরণপোষণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাকে ভক্তি না করিবা আর কাহাকে করা যায়? এই হেতু তর্ক লইয়া যে জ্ঞানকৃত ভক্তি, ইহাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এই ভক্তি স্বাভাবিক নহে—ইহা প্রাণের নহে। কারণ ইনি স্বামী না হইয়া যদি

আর একজন স্বামী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই ভক্তি করিতে হইত। জীবেরও এইরূপ বিচার করিয়া যে ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক হয়, অর্থাৎ, শ্রীভগবান্ জীবকে সৃজন ও পালন করিয়া থাকেন, ইনিই জীবের কর্ত্তা, ইনি ছাড়া জীবের গতি নাই, এই বিচার করিয়া, এতাদৃশ জ্ঞানলাভের পর বিধি অনুসরণ করিয়া, ভগবান্‌কে আপন জন মনে না করিয়া, শ্রীভগবানে যে ভক্তি হয়, ইহাই জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি—ইহাই স্বকীয়া রতি।

স্বাভাবিক প্রেরণা বশতঃ এই ভক্তির উদ্রেক না হইলেও ইহার ক্রমোৎকর্ষে এই ভক্তিই স্বাভাবিক হইয়া যায়। হৈতুকী ভক্তি অবশেষে অহৈতুকী ভক্তিতে পরিণত হইয়া যায়। এই শ্রেণীর ভক্তই জগতে বহুসংখ্যক। আর জ্ঞানশূন্যা ভক্তি এই—যেমন কোন অবলা, বিবাহিতাই হউন আর অবিবাহিতাই হউন, কোন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাঁহাকে ভক্তি করেন বা ভালবাসেন, তাহার কোন হেতু নাই, কারণ নাই, নির্ব্বিচারে স্বাভাবিক প্রেরণা বশতঃ তদ্‌গতপ্রাণা হন; সেইরূপ কোন কোন ভাগ্যবান্ জীব—শ্রীভগবানের প্রতি কারণ ব্যতিরেকেই আকৃষ্ট হন। শ্রীভগবান্ ব্যতীত তাঁহার আর কোন ঈপ্সিত বস্তু থাকে না, শ্রীভগবানের নিকটে কোন কিছু প্রার্থনা করিবার থাকে না। প্রাণের স্বাভাবিক টানেই ভগবৎ পরায়ণ হন। এতাদৃশী ভক্তিকে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি বলে। কিন্তু এরূপ ভক্তের সংখ্যা জগতে অতি বিরল। এরূপ ভক্ত সংসারে থাকিয়া, যে সংসার জীবের নিকট আপন বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সংসারের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শ্রীভগবানের দিকে,—যিনি বদ্ধ জীবের নিকট পর বলিয়াই প্রতীয়মান হন,—তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হন। ইঁহারা কোন বেদবিধির অনুসরণ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করেন না। এই স্বাভাবিকী জ্ঞানশূন্যা রতিকেই পরকীয়া রতি বলে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা এই রতির পরিপূর্ণ আদর্শ।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বকীয়া ও পরকীয়া উভয় রতিরই পরিপূর্ণ আদর্শ। আমরা দেখিয়াছি, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রথমেই শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন; আবার একদিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার পথে গৌররূপ দেখিয়া মনঃপ্রাণ একবারে শ্রীগৌরাঙ্গে অর্পণ করিয়া ফেলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পরপুরুষ। তিনি এরূপ করিলেন কেন! না বুঝিয়া না শুনিয়া তিনি এইরূপ পরপুরুষকে দেহমন সকলই অর্পণ করিলেন কেন? বিচার করিবার পর্য্যন্ত তিনি অবসর পান নাই—শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয়খানি এতই অধিকার করিয়া ফেলিলেন! ইহাই পরকীয়া রতি—ইহা স্বাভাবিক। শ্রীরাধা কৃষ্ণসহ মিলিত হইবার জন্য ললিতা বিশখাদি সখিবৃন্দের সহায়তা লইলেন, আর এখানে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনবেলা সুরধুনীতে অবগাহন এবং তুলসী সেবন করিলেন। যুগোপযোগী সহজ পন্থা সকল জীবের সহজে অনুসরণযোগ্য, তাই সর্ব্বজীবের প্রতিনিধি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রত্যহ তিনবেলা গঙ্গাস্নান করিতেন এবং তুলসী সেবা করিতেন। এদিকে শ্রীগৌরচন্দ্রও গঙ্গার মাহাত্ম্য জীবকে জানাইবার জন্য স্বয়ং আদর্শ ভক্তভাবে প্রত্যহ সুরধুনীতে স্নান করিতেন এবং শ্রীহস্তে তুলসী স্নান করাইতেন। শ্রীগৌরলীলায় সর্ব্বত্রই গঙ্গার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখা গিয়াছে। অবশ্য ইহা ভক্তভাবে।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গতা হইলেও তাঁহার পরকীয়া রতি রহিয়া গেল। এই যে স্বকীয়া ও পরকীয়া রতির কথা বলা হইল, ইহা বহিশ্চক্ষুর নিকট। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীভগবানে যখন জীবের প্রকৃত রতি হয়, তখন তিনি পর থাকেন না—তিনি অতি নিজজন হইয়া যান। তবে প্রেমের পরিপুষ্টির নিমিত্ত তিনি মধ্যে মধ্যে দুর্ল্লভ হন এবং যতই ভক্তি ও প্রেম বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ভক্ত ততই আপনাকে দীন মনে করেন, এবং ভাবেন যে, তাঁহার প্রেম নাই, অন্যকে নিজের অপেক্ষা বেশী প্রেমিক ভাবিয়া মনে

করেন যে, শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট বাঁধা, তাই তিনি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে যান। শ্রীরাধায়ও ইহা দেখা যায়। যিনি পরিপূর্ণ প্রেম-স্বরূপ, তিনিও সময় সময় শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত গোপিকাগণের অনুগত হইতে চাহিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গও এইরূপ করিয়াছেন, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকেও এইরূপ করিতে দেখা গিয়াছে। প্রেমের স্বভাবই এই। সে যাহা হউক, শ্রীরাধায় পরকীয়া রতি রহিয়া গেল। কিন্তু জীবের ইহা গ্রহণ করা সহজ নহে, বিশেষতঃ কলির জীব দুর্ব্বল, অসরল ও সন্দিগ্ধচিত্ত ; অথচ ইহাদিগকে ব্রজপ্রেম বিলাইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়াছেন। তাই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার পরকীয়া রতি স্বকীয়া রতি হইয়া গেল, অর্থাৎ তিনি বেদবিধানানুযায়ী শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বিবাহিতা হইলেন ; জ্ঞানশূন্যা ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইল। এদিকে রায় রামানন্দের সহিত গোদাবরীতীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সাধ্যসাধন সম্বন্ধে কথোপকথন হয়, তাহাতে রায় রামা-নন্দ স্তরে স্তরে সাধ্যের নির্ণয় করিতে যাইয়া প্রথম জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও পরে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির স্তর নির্ণয় করিয়াছেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং রায় রামানন্দ যখন জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা বলিলেন, তখন শ্রীপ্রভু তাহাতে অনুমোদন করিলেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রথমতঃ জ্ঞানশূন্যা ও পরে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি দেখা গেল। ইহাতে আপাততঃ বৈষম্য দেখা যায় বটে, কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে বিন্দুমাত্র বৈষম্য নাই। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তের পূর্ণ আদর্শ। ভক্ত বহু-বিধ। সকল ভাবেরই পরিপূর্ণ সমাবেশ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে রহিয়াছে। প্রেম যে স্বাভাবিক, তাহা জীবকে দেখাইবার জন্য প্রথমতঃ বিষ্ণুপ্রিয়ার পরকীয়া রতি হইল। কিন্তু ইহা অতি অল্প সংখ্যক জীবই ধরিতে পারে। বহু সংখ্যক লোকই তার্কিক; জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন ; বেদবিধান, শাস্ত্রযুক্তির অনুসরণ করিতে প্রয়াসী ; ইঁহারা বিচারপরায়ণ। শ্রীভগবানকে

কেন ভজন করিবে, ইঁহারা তাহার হেতু যুক্তি চাহেন। ইঁহাদিগকে যদি বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, শ্রীভগবান্ই জীবের একমাত্র গতি, তিনিই জীবের একমাত্র পতি, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে ভজন করিবেন। শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা জীবের সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ নির্ণয় হইলে ইঁহারা শ্রীভগবান্কে ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহিত অবস্থায় যে ভক্তিভাব, ইহা এই শ্রেণীর জীবগণেরই ভক্তির পরিপূর্ণ আদর্শ। বিবাহিত জীবন দ্বারা এই স্বকীয়া রতির পোষণের আর একটী তাৎপর্য্য এই, ইহাদ্বারা—জীবকে দেখান হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ই জীবের একমাত্র পতি। একজন জীব যে আর একটী জীবের পতি বা পোষণকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে, ইহা জীবের ভ্রান্তি। শ্রীভগবান্কেই একমাত্র পতি বলিয়া মানিতে হইবে,—হৃদয়ে বুঝিতে হইবে; তাহা হইলেই প্রেমোদয় হইবে। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এই ভাব প্রদর্শন করিবার জন্য বিবাহিত হইয়া তাহার আদর্শ হইলেন। এই স্বকীয়া রতির পর আবার প্রিয়াজীর মধ্যে পরকীয়া রতি পরমোজ্জ্বল রূপে দৃষ্ট হয়। ক্রমে ইহা বিস্তার করা যাইবে। তিনি যখন নদীয়ানাগরীগণের প্রতিনিধি, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সমস্ত নাগরীবৃন্দের প্রেমাস্পদ, নদীয়াবিহারী গৌরহরি যখন প্রিয়াজীর স্বামী হইয়াও জগতের স্বামী বলিয়া পূজিত হইলেন; তখন আবার সেই পরকীয়া রতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। যখন নদীয়াবাসী সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাল বাসিতে লাগিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমে বামতা উপস্থিত হইল। প্রেমের এই বাম্য ও দাক্ষিণ্য ভাব কি, তাহা লীলা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদন করা যাইবে।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বকীয়া রতি সম্বন্ধে আর একটী কথা এই যে, তাঁহার প্রথমতঃ পরকীয়া রতি দেখা গেল, পরেও ইহা প্রোজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান হইল, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও এই রস আস্বাদন করিলেন, অন্যকেও

আস্বাদন করাইলেন, এবং জগতের জীবের জন্য রাখিয়া দিলেন। এই দুইয়ের মধ্যে কিছুকাল স্বকীয়া রতি দেখা গেল। বাস্তবিক পক্ষে ইহা স্বকীয়া রতি নহে। স্বকীয়া রতি বলিতে যাহা বুঝা যায়, বিষ্ণুপ্রিয়ার রতি তাদৃশী নহে। স্বকীয়া রতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে যে, বিবাহিতা পত্নী তাঁহার স্বামীর প্রতি যে অনুরাগ প্রদর্শন করেন, ইহাই স্বকীয়া রতি। এই অনুরাগের হেতু বিবাহ। বিবাহ না হইলে অনুরাগ হইত না এবং ইহা হইতে এইরূপ বুঝা যায় যে, যদি এই ললনাটির ইঁহার সহিত বিবাহ না হইয়া অন্য কাহারও সহিত বিবাহ হইত, তাহা হইলে রমণীটীর ইঁহাকে ভাল না বাসিয়া আর একজনের প্রতি অনুরাগিণী হইতে হইত। কারণ, এ অনুরাগের হেতু একমাত্র বিবাহ,—প্রাণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নহে। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি অনুরাগ এবং উভয়ের বিবাহ যদি এই শ্রেণীর বিবাহ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে অপরাধ হইবে। কারণ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। বিবাহ ইহার হেতু নহে। তাঁহার অনুরাগ স্বাভাবিক—পূর্ব্বেই হইয়াছে। শ্রীগৌরগতপ্রাণা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্যত্র বিবাহ হইলে তিনি আর এক জনের প্রতি অনুরাগিণী হইতেন, এ কথা মুখে আনাও অপরাধ,—মনে করিলেও ভক্তের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তবে আমি ভক্তিহীন পাষণ্ড, তাই প্রিয়াজীর কথা লিখিতে যাইয়া এরূপ অপ্রিয় কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। কোন ভক্ত হৃদয়ে ব্যথা পাইলে কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবেন। যাহা হউক, তবে প্রিয়াজীর এই বিবাহলীলা কি? এ বিবাহ অর্থ উভয়ের মিলন, অর্থাৎ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরসঙ্গতা হইলেন। বিবাহটী লৌকিক। বহিশ্চক্ষুর নিকট এই মিলন বিবাহ বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। যেমন শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ, যিনি জগতের গুরু তাঁহার যেমন অন্যকে লৌকিক গুরু করা, যিনি জগতের পিতা ও মাতা তাঁহার

যেমন আর একজনকে পিতা বা মাতা বলিয়া সম্বোধন করা, এই সব যেমন এক একটী চিত্তাকর্ষকলীলা, এ বিবাহ-ব্যাপারও তাঁহার তদনুরূপ একটী লীলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই লীলাব্যাপার হইতে অধিকারিভেদে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন রস আস্বাদন করিবে। এই মিলন প্রাকৃত নায়ক নায়িকার মিলন নহে। যদি তাহাই হইবে, তবে জীবনিচয় ইহাতে কেন আকৃষ্ট হইবে! সাধারণ নায়ক নায়িকার মিলনের কথা শুনিলে হৃদয়ে কাম জাগ্রত হয়, আর ইঁহাদের মিলনমাধুরী চিত্তপটে অঙ্কিত করিলে হৃদয় পবিত্র হয়, অপ্রাকৃত রসের আস্বাদন হয়। এ মিলন শুধু রসের পোষণ, লীলামাধুরীর প্রকাশ, জীবকুল আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত লৌকিক ভাবে সচ্চিদানন্দবিগ্রহের ও তদীয় হ্লাদিনীশক্তির সঙ্গতি।

এখন নদীয়ানাগরী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতেছি। নাগরীভাবে নদীয়ামাধুরী আস্বাদন করিবার পূর্ব্বে ইঁহারা কি বস্তু তাহা জানা আবশ্যক, কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের পর লীলা আস্বাদন করিলে পতনের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, বরং রসের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। নদীয়ানাগরীগণ চিদানন্দময়। ইঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তি। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই নাগরীভাব রহিয়াছে। কাহারও এই ভাব বিকশিত, কাহারও অবিকশিত। আত্মার পুরুষ স্ত্রী ভেদ নাই। ইহা চিন্ময়। এখানে রক্ত মাংসের বিকার নাই; নির্ব্বিচারে স্বাভাবিক আকর্ষণে শ্রীভগবানের মাধুরীতে আকৃষ্ট হওয়ার নামই নাগরীভাব। নদীয়াবাসী চিদানন্দময় ভক্তকুল-শ্রেষ্ঠ কুলবালাগণই এই নাগরীভাবের পরিপূর্ণ আদর্শ। ইঁহারা কামকলুষ-বিমুক্ত। রূপমাধুরীর আস্বাদন ও প্রেমবৈচিত্র্য ইঁহাদের দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। ইঁহারা প্রেমরসে মগ্ন হইয়া সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। প্রেমের খেলায় কাম যে অতিদূরে পলায়ন করে, ইঁহারাই তাহা সর্ব্বতোভাবে দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের কোন সুখবাঞ্ছা নাই, দেহের কোন বিকার

নাই, সর্ব্বদাই তাঁহারা অপার্থিব রসে মগ্ন; শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে লইয়া অন্তঃপুরে অন্তরঙ্গরস আস্বাদন করিয়াছেন এবং বাসুঘোষ, লোচনদাস, নয়নানন্দ, নরহরি প্রভৃতি মহাজনগণ নদীয়ার এই মধুররস জীবের জন্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে ইহা আস্বাদন করা যাইবে, এখন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের গার্হস্থ্যলীলা আস্বাদন করা যাউক। সেই সঙ্গে সঙ্গেই, তিনি যে মধুরাতিমধুর রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা বিস্তার করা যাইবে।

(১০)

শ্রীগৌরাঙ্গের গার্হস্থ্যলীলা জীবগণের পরিপূর্ণ আদর্শ। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ পুত্রবধূ, আদর্শ সতী, আদর্শ প্রেমিকা। যিনি যে ভাবেই দেখুন না কেন, ইঁহাতে সর্ব্বভাবের পরিপূর্ণতা দেখা যাইবে। এই নদীয়াযুগলকে আদর্শ করিয়া মানুষ যখন জীবনপথে চলিতে থাকিবে, যখন এই চিদানন্দময় লীলাবিগ্রহ দুইটী জীবের ভজনীয় হইবে, তখন মানুষ ধন্য হইয়া যাইবে, কামের সংসার প্রেমময় হইবে, জড়জগত চিন্ময় হইয়া যাইবে। ভজন করিতে করিতে দেখিতে পাইবেন,—এখানে বিশুদ্ধ প্রেমের খেলা, এই নবদ্বীপরস কত মধুর! কত গভীর! ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ইহার আর অবধি থাকিবে না।

বধূমাতাকে আনিয়াছেন অবধি শচীমা'র আর আনন্দ ধরে না। তাঁহার গৃহখানিও এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বউমা কিসে সুখে থাকে, শচীমা তজ্জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। বিষ্ণুপ্রিয়া বড় মানুষের মেয়ে এবং তাঁহার পিতামাতার প্রথম সন্তান,—বড় আদরের ধন। কিন্তু শচীমার আলয়ে আসিয়া তাঁহার আদর-সোহাগে তিনি পিত্রালয়ের কথা আর মনে করেন না। শচীমা বউমাকে বড় একটা কাজকর্ম্ম করিতে দেন না। পিতামাতাও সঙ্গে অনেক পরিচারিকা দিয়াছেন, তথাপি বিষ্ণুপ্রিয়া রন্ধন করিতে বড় ভালবাসেন। তিনি নানাবিধ সামগ্রী মনোমত রন্ধন

করিয়া পতিকে ও শ্বশ্রূমাতাকে খাওয়াইবেন, এই তাঁহার সাধ, তাই তিনি পরিচারিকাদি সত্ত্বেও স্বয়ং রন্ধন করিতে যান, তাঁহার ইহাতে শ্রান্তি নাই; তথাপি শচীমা ভাবেন, তাঁহার বধূ বালা বিষ্ণুপ্রিয়ার ইহাতে বড় কষ্ট হয়, তাই তিনি একটু পরেপরেই যাইয়া বউমা'র মুখখানি স্বীয় অঞ্চল দিয়া কত আদরে কত যত্নে মুছাইয়া দেন, গায়ে হাত বুলায়েন, কখনো কোন ছল করিয়া রন্ধনশালা হইতে ডাকিয়া আনিয়া কোলে লইয়া বসেন, আর তাঁহার শ্রীবদনে চুম্বন দেন ও বুকের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া কত আদর সোহাগ করেন এবং ইঙ্গিতে কাহাকেও রন্ধন করিতে পাঠাইয়া দেন। বালা বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমা'র এই আদর পাইয়া আপনাকে একবারে ভুলিয়া যান। বধূর প্রতি শ্বশ্রূমাতার এতাদৃশ স্নেহ জগতে আর হয় না, তাই শচীমা'র সংসারখানি জগতে পরিপূর্ণ আদর্শ।

এখানে মহাজনগণের একটী কথা আছে। মহাজনগণ বলিয়া থাকেন, দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনধামে মা যশোদার গৃহে লীলা করেন, তখন কংসের ভয়ে মা যশোমতী সর্ব্বদাই ভীত থাকিতেন, কখন্ তাঁহার দুধের ছেলে গোপালকে কংসের প্রেরিত অসুরগণ আসিয়া বিনাশ করে। যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তাঁহার প্রতি এরূপ বাৎসল্য কি গভীর! ক মধুর! ইহাকেই প্রেম বলে। শ্রীভগবানের প্রতি যে মহান্ ভাব, এবং বিরাট ভাবে তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া যে ধারণা, তাহাই ভক্তি। এই প্রেম ও ভক্তির বিভিন্ন স্তর ও তাহার বিভিন্ন রসের কথা শ্রীল শিশির বাবু তাঁহার সুবিখ্যাত শ্রীঅমিয় নিমাই চরিতে সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, মা যশোদার কংস হইতে একটী ভয় ছিল। কংস যে শ্রীকৃষ্ণের নিধনের নিমিত্ত কত অসুর প্রেরণ করিতেন, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু, যোগমায়ার কৌশলে লোকে বলিত যে, বৃষভানুসুতা শ্রীমতী রাধা যদি শ্রীকৃষ্ণের জন্য রন্ধন করেন, তবে আর

শ্রীকৃষ্ণ কোন বিপদে পড়িবেন না। তাই মা যশোমতী শ্রীরাধাকে স্বীয় আলয়ে আনাইয়া তাঁহাদ্বারা রন্ধন করাইতেন। কিন্তু শ্রীমতী পরের মেয়ে, অপরের ঘরের বউ। সুতরাং মা যশোদা সর্ব্বদা তাঁহাকে আসিতে বলিতেও পারিতেন না, আর শ্রীমতীও সকল সময় আসিতে অবসর বা অনুমতি পাইতেন না। ইহাতে মা যশোদা অবশ্যই স্বভাবতঃ বাঞ্ছা করিতেন যে, শ্রীমতী যদি তাঁহার নিজের কেহ হইতেন, তবে বড় ভাল হইত। আর, শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীমতীকে ভাল বাসিতেন এবং শ্রীমতীও যে কৃষ্ণগতপ্রাণা তাহাও মা জানিতেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীমতীকে লইয়া নিকুঞ্জবিহার করিতেন ও তজ্জন্য জটীলতা ও কুটীলতার পূর্ণ আদর্শ জটীলা ও কুটীলা, এবং স্বার্থ ও কামবিজড়িত বর্ব্বরতার আদর্শ আয়ান যে এই মিলনের বিরোধী ছিলেন, তাহাও মা শুনিতেন ও জানিতেন; কিন্তু, গোপালের উপর মায়ের এতই বাৎসল্য প্রেম যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কোন কার্য্যই দোষাবহ বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার গোপাল যাহা করেন, সকলই তাঁহার নিকট সুন্দর, সকলই মধুর। কাজেই স্বভাবতঃই মা যশোদা বাঞ্ছা করিতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেন শ্রীমতীর সহিত নিত্য মিলিত থাকেন। কিন্তু লীলা মাধুরী বিস্তারের জন্য শ্রীমতী পরনারী, পরাধীনা; শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতা হইতে তাঁহার প্রবল বাধা বিঘ্ন। এ অবস্থায় মা যশোদার এ কথা মনে করা কিম্বা এইরূপ অভিলাষ করা অস্বাভাবিক নয় যে, শ্রীমতী যদি তাঁহার পুত্রবধূ হইতেন, তবে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। শ্রীমতীকে পুত্রবধূ করিয়া ঘরে রাখার বাসনা তিনি সর্ব্বদাই হৃদয়ে পোষণ করিতেন। তিনি প্রেমাধিক্যে ভাবিতেন, তাঁহার গোপাল শ্রীমতী ও অন্যান্য ব্রজবালা নিয়া ক্রীড়া করেন ইহাতে দোষ কি? যাঁহারা সুজন তাঁহারা ইহাতে দোষ দেখিবেনই বা কেন? আর বাস্তবিকই ইহা পরম বিশুদ্ধ। প্রেমের নিকট কামের স্থান কোথায়? যিনি চিরসুন্দর

ও নিত্যপবিত্র, তাঁহার কার্য্যও পরমসুন্দর ও পরমপবিত্র। যিনি প্রেম-স্বরূপ, তাঁহার কার্য্যও পরম প্রেমময়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি সুন্দর—পরম সুন্দর। তিনি পরিপূর্ণ প্রেমময়। সুতরাং তাঁহার কার্য্যও মনোহারী ও প্রেমপূর্ণ। নিত্য শুদ্ধ বস্তু যাঁহাকে লইয়া লীলা করেন, তিনিও নিত্য ও শুদ্ধ, সুতরাং মা যশোদা পরম প্রেমস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দোষ দেখিবেন কিরূপে? পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণ যাহাই কেন করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার বাৎসল্য প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। এইরূপ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যিনিই যে রস আস্বাদন করুন না কেন, তাঁহার রস কৃষ্ণের যাবতীয় কার্য্যেই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ যদি স্থির হয়েন, তবে আর জীবের কোন কথা থাকে না। সে শুদ্ধ রসাস্বাদনে অধিকারী হয়। যাহা হউক, মা যশোমতী শ্রীরাধাকে নিজের গৃহে আনিয়া রাখিতে যে বাঞ্ছা করিবেন ইহা স্বাভাবিক। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত নাই বটে, মহাজনগণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু, ভজনপরায়ণ মহাজনগণের শুদ্ধহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহাই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাই সত্য। তত্ত্বতঃ দেখিতে গেলেও দেখা যায়, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ হ্লাদিনী শক্তি। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই এই শক্তি রহিয়াছে। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য যত অনুভব করেন, তাঁহার মধ্যে এই হ্লাদিনী শক্তি ততই উদ্বুদ্ধ। ভজনপরায়ণ মহাজনগণ তত্ত্বতঃ জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা একই বস্তু। লীলার নিমিত্ত এবং রসবিস্তারের জন্য তাঁহারা দুই হইয়াছেন এবং দুই হইয়া তাঁহারা বিরহ ও মিলনের রসাস্বাদন করিয়া জীবকে এই রসাস্বাদনের ভাগ্য প্রদান করিতেছেন। ভক্তগণ স্বভাবতঃই ইচ্ছা করেন যে, ভক্তমুকুটমণি শ্রীরাধা নিত্যই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতা থাকুন; শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহ তাঁহাদেরও বড় কষ্টকর; এইজন্য তাঁহারা মাথুর, অর্থাৎ বিরহ-গান শুনিয়া যদি মিলন-গান না শুনেন, তবে তাঁহাদের প্রাণ যেন

বাহিরিয়া যাইতে চায়। যদি মহাজনগণেরই এইরূপ নিত্যমিলনেচ্ছা স্বাভাবিক হয়, তবে স্নেহের পরিপূর্ণমূর্ত্তি মা যশোদা যে এই ইচ্ছা করিবেন, তাহাতে আর কথা কি হইতে পারে ? মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গৃহ-স্থালী করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বালকগণের সঙ্গে যেরূপ ক্রীড়া করেন, অন্তঃ-পুরেও তাঁহার পরমপ্রিয় শ্রীরাধা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণকে লইয়া সেইরূপ ক্রীড়াকৌতুক করেন, ইহা মায়ের স্বাভাবিক বাসনা ; আর শ্রীমতী রাধাও তাঁহাকে এত ভক্তি করেন ও ভালবাসেন যে, মা যশোদা যেন সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে, এইটী তাঁহার পুত্রবধূ ; কিন্তু সময়োপযোগী লীলার নিমিত্ত মায়ের সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই। এই সম্বন্ধে মহাজনের একটী পদ দেখুন। উদ্ধবদাস শ্রীরাধার কথা বলিতেছেন—

করিয়া রন্ধন কার্য্য কৃষ্ণভুক্তশেষ ভোজ্য
ভুঞ্জি তবে কৈলা আচমন।
ব্রজেশ্বরী বধূপ্রায় লালন করিলা তায়
দিলা বহু বাসবিভূষণ ॥

শ্রীভগবান্, যিনি পুত্র হইয়া মাতাকে এত বাৎসল্য রস আস্বাদন করিতে অধিকার দিয়াছেন, তিনি মায়ের এ বাসনাইবা অপূর্ণ রাখিবেন কেন ? তিনি ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী। আর এক কথা ; শ্রীভগবানের সকল কার্য্যই সুশৃঙ্খল। তিনি জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সময়োপযোগী ও জীবের ধারণানুরূপ স্বীয় লীলা প্রকাশ করেন, বিচিত্র বিশ্বই তাঁহার লীলা, কিন্তু তন্মধ্যে তাঁহার নরলীলাই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। এই লীলা নিত্য ও সত্য। নিত্যবস্তুর সকলই নিত্য। তবে, যে সময়ে যেরূপ লীলা প্রকাশ করা উপযুক্ত, সেই সময় তিনি সেইরূপ লীলাই প্রকাশ করেন। কোন্ সময় কোন্ লীলা প্রকাশ করিবেন, তাহা তিনি জানেন। পূর্ব্বে তিনি তাহার তদনুরূপ সূচনা করেন। তাই তিনি পূর্ব্বেই মা যশোদার হৃদয়ে

এই বাসনার সমুদয় করাইয়া দিয়াছেন এবং সেই যশোদাকে কলিযুগে শচীমাতা রূপে অবতরণ করাইয়া স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বীয় পরিপূর্ণ-হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীমতী রাধাকে সনাতনসুতারূপে অবতরণ করাইয়া স্বীয় গৃহিণী ও শচীমাতার পুত্রবধূরূপে প্রকাশ করিলেন। তাই, আমরা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে শচীর আলয়ে এইরূপ অপার্থিব প্রেমের লীলা করিতে দেখিতে পাই। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মত এতাদৃশ পতিভক্তি, এত অনুরাগ জগতে আর হয় না, হইতেও পারে না; তাই তিনি বিশ্ববাসিজনগণের আরাধ্য। আর শচীমা'র মতও স্নেহ জগতে আর হয় না, হইতেও পারে না; তাই শচীমা'র সংসারখানি জগতে পরিপূর্ণ আদর্শ। বুদ্ধিমান্ মানবমাত্রেই তাই এই সংসারখানি আদর্শ করিয়া জীবনপথে চলিতে থাকে এবং সাধনভজন দ্বারা এই সংসারে প্রবেশ করিয়া নদীয়ার যুগলকিশোরের ভজনে অধিকার প্রাপ্ত হয়।

শচীমা বধূমাতাকে বড় একটা কাজকর্ম্ম করিতে দিতেন না। আপন কন্যার মত তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, আদর যত্ন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন ও পরাইতেন। বালা বিষ্ণুপ্রিয়া যেন মায়ের অভাব বোধ না করেন, সেইদিকে শচীমা'র সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকিত। তিনি বধূমাতাকে কোন কার্য্য করিতে আদেশ দিতেন না বটে, কিন্তু দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সেইজন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন না, তিনি শচীমা'র কোন আদেশেরও অপেক্ষা করিতেন না, নিজেই বুঝিয়া শুনিয়া গৃহকর্ম্মাদি দেখিতেন। প্রাতঃকালে স্নান করা তাঁহার অভ্যাস। শচীমাও প্রাতঃকালে স্নান করিতেন, তাই শচীমাতা প্রভাতে উঠিয়া বউমাকে লইয়া সুরধুনীতে স্নান করিতে যাইতেন। কোন দিন বা নদীয়ানাগরী কিম্বা বালিকাবৃন্দ আসিয়া শ্রীমতীর সঙ্গে যোগ দিতেন; শচী মা তখন বউমাকে তাঁহাদের সঙ্গে দিয়া নিজে একাকী অথবা তাঁহার ভগিনী বা শ্রীবাসগৃহিণী মালিনীদেবী প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া স্নানে

যাইতেন। কোনদিন বা বালা বিষ্ণুপ্রিয়াকে নাগরীগণসমভিব্যাহারে অগ্রে পাঠাইয়া শচীমা বৃদ্ধাগণকে লইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেন, আর নারীগণ সঙ্গে তাঁহার বধূমাতার রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেন এবং সঙ্গীয় বৃদ্ধাগণের নিকট তাঁহার বউমার রূপগুণের কথা বলিয়া নিজেও কত সুখ পাইতেন, তাঁহাদিগকেও কত সুখ দিতেন। শচীমা'র পুত্রবধূ বলিয়াই যে তিনি তাঁহার ভুবনমোহন রূপ ও অপার গুণের কথা বেশী করিয়া বলিতেন, তাহা নহে; সত্যসত্যই শ্রীমতী অশেষগুণান্বিতা ও স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সমাকীর্ণ অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী; তাঁহার রূপগুণের কথা যতই বলা হউক না কেন, কিছুতেই সে কথা ফুরায় না, আর নিত্যই ইহা নূতন বোধ হয়, এক কথা দুই দিন বলিতে হয় না। তাঁহার প্রতি কার্য্য প্রতি ভাব নিত্যই নব নব আনন্দের প্রস্রবণ; তাই শচীমা যাঁহাদের নিকট এই সকল কথা বলিতেন, তাঁহারাও প্রত্যহ নূতন কিছু শুনিতে এবং নব নব আনন্দরসে সিঞ্চিত হইতেন। শচীমা কেন, তাঁহারাও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। আবার যখন স্নান করিয়া আর্দ্রবসনে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন আর একরকমের রূপমাধুরী বিকাশ পায়। কোনদিন বা শ্রীমতী কলসী কক্ষে করিয়া স্নান করিতে যান এবং কলসী জলপূর্ণ করিয়া মৃদুমন্থরগমনে নাগরীগণসমভিব্যাহারে হেলিতে দুলিতে আসিতে থাকেন। শ্রীমতীর পরিচারিকার অভাব নাই, গঙ্গার ঘাট হইতে জল ভরিয়া আনিতে ননীর পুত্তলী বালা বিষ্ণুপ্রিয়ার বড় কষ্ট হইবে মনে করিয়া শচীমাও তাঁহাকে কলসী লইয়া যাইতে কতবার নিষেধ করেন; কিন্তু দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার গর্ব্ব বা অভিমান নাই, তিনি আপনাকে অন্যান্য নাগরীগণের মতই একজন মনে করেন; তাই তাঁহারা যখন কলসী কক্ষে করিয়া আইসেন, তখন তিনিও মাকে বলিয়া কহিয়া একটি কলসী কক্ষে করিয়া সুরধুনীতে গমন করেন; শচীমা ইহাতে আরও প্রীত হন।

নদীয়ার কুলবালাগণ সকলেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে অতি নিজজন বলিয়া মনে করেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও তাহাদের অযাচিত ও অহৈতুক প্রেম পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন। সকলেই ভাবেন, শ্রীমতী তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ। দৈবক্রমে একদিন যদি শ্রীমতীর সন্দর্শন না পান, তবে যেন তাঁহার একযুগ চলিয়া যায়; শ্রীমতীও তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। যখনই সকলে মিলিত হন, তখনই তাঁহাদের আনন্দের আর অবধি থাকে না। স্নান করিতে যাইবার সময়, স্নানের কালে এবং স্নান করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন তখন, সকল সময়ই তাঁহাদের মধ্যে রসালাপ চলিতে থাকে। এ রস এ জগতের নহে। তাঁহাদের আনন্দসমুদ্ভাসিত বদনমণ্ডল, হাস্য-পরিস্ফুরিত শ্রীঅধরযুগল, সুরধুনীজলে ক্রীড়নকোন্দল, পরস্পরের প্রীতি-আলিঙ্গন, আলুলায়িত কেশপাশ, সিক্তবসনে কলসী কক্ষে হেলিয়া দুলিয়া মৃদুমন্থর গমন, যিনিই দর্শন করেন, তিনিই অপার্থিব আনন্দরসে সিঞ্চিত হন। সাধারণতঃ নারী দেখিলে কামভাব জাগ্রত হয়, কিন্তু ইঁহাদের দর্শনে কাম বিদূরিত হয় ও প্রেমরসের সঞ্চার হয়। পাঠকগণ! আপনারাও একবার ধ্যানে এই রূপমাধুরী সন্দর্শন করুন, আপনারাও প্রেম পাইবেন, আপনাদেরও প্রেমাশ্রুপাত হইবে; যে কামের জন্য মধুর জগত নীরস, নিরানন্দময় বলিয়া বোধহয়, তাহা মধুময় ও প্রেমময় হইয়া যাইবে; আপনারা অপার আনন্দরসের অধিকারী হইবেন। এখন একবার ভাবুন, এই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বস্তুটী কি! যে নারীরূপে জগত মুগ্ধ, সেই পার্থিব মায়ামোহকে মুগ্ধ করিবার জন্যই শ্রীভগবান্ স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিকে পরিপূর্ণ প্রেমস্বরূপিণী আদর্শ নারী করিয়া বিকাশ করিলেন। শ্রীভগবান্ জীবের অতি নিজজন। তিনি জীবকে বড় ভালবাসেন। আর, তাঁহার জীব তিনি যদি না ভালবাসেন, তবে আর কে ভালবাসিবে? তিনি সর্ব্বজ্ঞ। জীবের ভালমন্দ তিনি যত জানেন, জীব নিজেও তাহা জানে

না, কি ভাবে তিনি জীবনিচয় সৃজন করিয়াছেন, এবং জীবের শক্তিই বা কত, কিসের আবরণে আবৃত হইয়া কি ভাবে জীব পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং এই আবরণ উন্মোচনে জীবের সাধ্যানুরূপ কি সহজ উপায় হইতে পারে, তাহা তিনি যত জানেন, আর কেহ তাহা জানে না, জানিতে পারেও না। তিনি দেখিলেন, জীব নারীর মোহে মুগ্ধ। তাই তিনি গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে আদর্শ পুরুষনারী হইয়া লীলা করিলেন, যেন এই লীলা সন্দর্শন করিয়া মায়ামোহ মূর্চ্ছিত হইয়া যায় এবং মায়া জীবের দাসত্ব স্বীকার করে। যে মায়া জীবের উপর কর্তৃত্ব করিয়া তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতেছে, শ্রীভগবানের এই লীলারস আস্বাদন করিলে সেই মায়াই আবার জীবের দাস হইয়া প্রেমরসাস্বাদনে সহায়তা করিবে। তাই শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া জীবের নিত্য ভজনীয়। নদীয়া-রস নিত্য আস্বাদনীয়।

এই যে নাগরীগণের স্বাধীনভাবে সুরধুনী জলে জলক্রীড়াদির কথা বলা হইল, ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ কেমন কথা! কুলবালাগণ, বিশেষতঃ, নিমাই পণ্ডিতের ঘরণী সনাতনসুতা সুরধুনী জলে যাইয়া অবগাহন করিতেন এবং ক্রীড়াকৌতুকাদি করিতেন, ইহা রুচিবিরুদ্ধ কথা। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ দেওয়া হইয়াছে। আবার স্পষ্ট করিয়া বলি। শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নরলীলা করিলেন, ইহার নিগূঢ় অভিপ্রায় কি? জড়ভাবকে চিন্ময় করা এবং কামকে সহজে প্রেমে পরিণত করাই গৌর অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য। উন্নত হৃদয় সর্ব্বদাই স্বাধীন। সঙ্কীর্ণতার নিকটই ভীতি ও অধীনতা স্থান পায়। প্রত্যেক গৃহস্থই সংযমী। তাঁহার যেমন পত্নী আছেন, তেমন তাঁহার ঘরেই আবার যুবতী কন্যা, মাসী, পিসী, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি আছেন। বিধাতার সৃজন-কৌশলের জন্য পত্নীর প্রতি প্রেম থাকিলেও তাঁহাকে কোন কোন সময় যে চক্ষে দেখিতে হয়, তাহা কাম বলিয়া অভিহিত না করিলেও করা যাইতে পারে। আবার গৃহী

ভগিনী, ভ্রাতৃবধূ, কন্যা প্রভৃতি লইয়া বাস করেন বটে, কিন্তু সেখানে তিনি পূর্ণ সংযমী; সেখানে শুদ্ধ প্রীতি। এই প্রীতির ভাব বিস্তার লাভ করিলে আর কোন সঙ্কোচ সঙ্কীর্ণতা থাকে না। ইহাও দেখা যায়, কোনও বাড়ীতে কোন উৎসব বা কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে সেই বাড়ীতে অনেক পুরুষ ও স্ত্রী মিলিত হন; তীর্থক্ষেত্রে ও দেবমন্দিরাদিতেও বহু লোক মিলিত হন, তখন কি নারীগণকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না? বহিরঙ্গ লোকে ইহাকেও অনর্থ উৎপত্তির কারণ বলিয়া মনে করিতে পারে, করুক; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; তাই বলিয়া কেহ তীর্থ পর্য্যটন, দেব দর্শন, বা উৎসবাদি পরিত্যাগ করেন না। উৎসবাদি একটী প্রধান কেন্দ্র, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সকলে মিলিত হয়। এটী একটী প্রধান শক্তি, ইহাদ্বারা অন্যান্য ভাব আর জাগিবার অবসর পায় না। সকলের মনই একদিকে একভাবে—সাধুভাবে নিবিষ্ট; সুতরাং এস্থলে নরনারী-গণের মিলন মধুর। এই যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, ইহাদ্বারাই তখনকার অবস্থা এবং শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝা যাইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক গৃহস্থই সংযমী কিন্তু সেও পশুভাব হইতে একবারে বিমুক্ত নহে। সে কেন, পরিবারস্থ সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু পশু ভাব আছে। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি; প্রবল শক্তির নিকট ক্ষীণশক্তি পরাভূত হয়, এবং যে ভাবই কর্ষণ করা যায়, সেই ভাবই প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। সংসারী জীব অনেকেই সংযমী বটে, কিন্তু মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ইহার ব্যত্যয় দেখা গিয়াছিল। শ্রীপ্রভু দেখিলেন, কলিতে দুর্ব্বল জীব পশুভাব ছাড়াইয়া বিশুদ্ধ প্রেমের কর্ষণ করিতে পারে না, কারণ সে আদর্শ পায় না,—যাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে। ভাই ভগিনীকে, ভগিনী ভাইকে, ভ্রাতৃবধূ দেবরকে, দেবর ভ্রাতৃ-বধূকে, এইরূপ সকলেই সকলকে প্রীতি করে বটে, কিন্তু সে প্রীতি প্রাণ

খোলা নহে, কারণ উভয়ের মধ্যেই,—সে খানে না হোক অন্যত্র পশু ভাব রহিয়াছে। কালস্রোতে মুসলমানগণের অত্যাচার ও বিলাসিতার বিষময় দৃষ্টান্তেই হউক, কিম্বা তান্ত্রিকতার ঘোর উৎপীড়নেই হউক, অথবা সন্ন্যাসি-গণ কর্ত্তৃক উপনিষদের কুব্যাখ্যার ফলেই হউক, কামের প্রবল প্রভাব হইয়াছিল। যে নারী বৈষ্ণবী শক্তি শ্রীভগবতীর অংশস্বরূপা, যাঁহাকে দেবতা ভাবে পূজা করা কর্ত্তব্য, কামের প্রাবল্যে সেই নারীই বন্ধনের হেতু হইয়া দাঁড়াইল; তাই সমাজে সংকীর্ণতা স্থান পাইল। নারীগণকে ঘরের কোনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল এবং এমন কি তাঁহাদিগকে সকল ধর্ম্মকার্য্য হইতে বর্জ্জিত করা হইল। শ্রীপ্রভু নদীয়ানগরে অবতীর্ণ হইয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ও নাগরীগণকে লইয়া এরূপ প্রেমের লীলা করিলেন যে, মানবগণ এই আদর্শ লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইলে সে আর কামের কিঙ্কর হইবে না। বিষ্ণুপ্রিয়া ও নাগরীগণ প্রেমের মূর্ত্তি, তাঁহাদের দর্শনে কাম দূরে পলায়ন করে, হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধ প্রেম জাগ্রত হয়; তাই তিনি আসিয়া স্ত্রীগণকে স্বাধীন করিয়া জীবের কামকলুষভাব বিদূরিত করিয়া দিলেন। জড়তা, সংকীর্ণতা দূরে তাড়াইয়া দিলেন। তাই শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াই জীবের একমাত্র আরাধ্য, এই দুই প্রেমমূর্ত্তিই নিত্য সেবনীয়। নিত্য, পবিত্র বস্তুর সঙ্গে সকলেই নিত্য ও পবিত্র হইয়া যাইবেন।

এই যে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা বলা হইল, তাঁহার রূপে শুধু মানুষ মুগ্ধ নহে, পশু পক্ষী জীবনিচয়, এমন কি মৎস্যাদি জলজন্তু পর্য্যন্ত তাঁহার রূপ দেখিয়া আনন্দে উল্লসিত হইত। একথা অতিরঞ্জিত নহে। মনে ভাবুন, চন্দ্রের আলো। পূর্ণচন্দ্র যখন সমুদিত হয়, এবং তাহার মধুর স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ এবং প্রতিবিম্ব যখন জলের উপর পতিত হয়, তখন মৎস্যাদি জলজন্তু আনন্দে ক্রীড়া করে, ইহা অনেকেই হয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ কোটিচন্দ্রের জ্যোতিঃ হইতেও সুমধুর সুস্নিগ্ধ ও চিত্তাকর্ষক। সুতরাং তিনি যখন সুরধুনীতে যাইতেন, তখন তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া মৎস্যাদি জীবগণ যে আনন্দে ক্রীড়া করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? আর বিশেষতঃ, তিনি পরম প্রেমস্বরূপ: তাঁহার মধুর মূর্ত্তি দর্শনে স্বতঃই জীবের আনন্দ হয়। এখন ভাবুন, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া বস্তুটী কি! জগতের মায়িক রূপমোহকে মুগ্ধ করিবার জন্যই তিনি অপার চিদানন্দময় রূপ লাবণ্য লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনাদের যদি রূপতৃষ্ণা থাকে, তবে বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, তাঁহাকে প্রাণের পরম অভীষ্ট বস্তু করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বামে নিরীক্ষণ করুন; আপনাদের লৌকিক মোহ চলিয়া যাইবে,—দেখিবেন, আপনাদের আনন্দরসাস্বাদনের শুভ সুযোগ সমুদিত হইবে।

স্নান করিয়া আসিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিতেন, শচীমা বধূমাতাকে লইয়া গৃহে আসিতেন। প্রাতঃকালে নিমাই পণ্ডিত মুকুন্দ সঞ্জয়ের টোলে অধ্যাপনা করিতে যাইতেন। শচীমা ইহার পূর্ব্বেই নিমাইকে কিছু খাওয়াইয়া দিতেন। প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলে শচীমা বউমাকেও কিছু খাবার দিতেন; কিন্তু মাতৃভক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া একা খাইতে ভাল বাসিতেন না, কাজেই বউমাকে খাওয়াইবার জন্য শচীমা বউমাকে সঙ্গে লইয়া বসিতেন এবং উভয়েই কিছু জলযোগ করিতেন। কোন দিন বা সখিগণ থাকিতেন, তাঁহাদিগকে লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বসিতেন, শচীমা পৃথক্ বসিতেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহকর্ম্মাদি দেখিতেন; কোনদিন বা রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিতেন, কোনদিন বা নিজেই রন্ধন করিতেন।

বেলা দুই প্রহর হইলে নিমাই বাড়ী আসিতেন, এবং তখন স্নানাদির পর তিনি আহারে বসিতেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবেশন করিতেন,

আর শচীমাতা বসিয়া রূপ নিরীক্ষণ করিতেন। নিমাইচাঁদ আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলে শাশুড়ী ও পুত্রবধূ একত্র বসিয়া কত কথা কহিতে কহিতে আনন্দে ভোজন করিতেন। নিদ্রান্তে আবার মুখ হাত পা ধুইয়া পড়াইতে যাওয়ার পূর্ব্বে শচীমা নিমাইকে কিছু খাবার দিতেন। নিমাইচাঁদ খাবার খাইয়া মাকে প্রণাম করিয়া আবার পড়াইতে যাইতেন। সন্ধ্যার কিয়ৎপূর্ব্বে তিনি শিষ্যগণকে লইয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতেন ও আপনার সৃজন-মাধুরী আপনিই দর্শন করিয়া আনন্দ পাইতেন। সন্ধ্যোচিত কার্য্য করিয়া প্রভু আবার বাড়ী আসিতেন, এবং মাকে প্রণাম করিয়া ও শ্রীমতীকে দর্শন দিয়া আবার তাম্বুল সেবন করিতে করিতে পড়াইতে যাইতেন। এইরূপে প্রভু প্রায় অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত পড়াইতেন। তিনি সকলকে এরূপ মনোযোগের সহিত সরল, সহজ ভাবে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝাইয়া দিতেন যে, তাঁহার নিকট যিনিই পড়িতেন, তিনিই এক বৎসরের মধ্যে সকল সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া একজন বড় পণ্ডিত হইতেন। শচীমা'র কথায় কোন দিন বা প্রভু প্রহরেক পড়াইয়া আসিতেন। প্রভু বড় মাতৃভক্ত। তাঁহার মত মাতৃভক্ত জগতে আর হয় না। এদিকে প্রভুর বাড়ীতে না আসা পর্য্যন্ত শচীমা বধূমাতাকে লইয়া কত কথা বলিতেন, কত গল্প করিতেন, বউমাকে কত পৌরাণিকী আখ্যায়িকা শুনাইতেন। নাগরীগণ শচীমা'র আলয়ে প্রায়ই আসিতেন। তাঁহারা অবসর পাইলেই ছুটিয়া চলিয়া আসিতেন। শচীমা'র স্নেহ ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মধুরিমায় তাঁহারা এতই আকৃষ্ট যে,—গৃহে থাকিয়া তাঁহারা বড় একটা সুখ পাইতেন না। নাগরীগণ আসিয়া বালা বিষ্ণু-প্রিয়াকে সাজাইতেন; শচীমা ইহাতে কত আনন্দ পাইতেন! শচীমা যখন গল্প করিতে বসিতেন, তখন নাগরীগণকে চৌদিকে লইয়া বসিতেন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত।

এই নাগরীগণ এখন বিষ্ণুপ্রিয়া পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে শুকসারীর একটা কথা আছে—মহাজনগণ বলিয়া থাকেন যে, শুক কৃষ্ণের পক্ষ লইয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার কৃষ্ণ মদনমোহন, কিন্তু সারী শ্রীরাধার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন যে, শ্রীরাধা যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে থাকেন, ততক্ষণই শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন, নতুবা তিনি শুধুই মদন। কথাটা অতি সত্য এবং বড় সুন্দর। ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ হ্লাদিনী শক্তি, তিনি আদর্শ-ভক্ত, কিন্তু জীব সম্পূর্ণ শ্রীরাধা হইতে পারে না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তদীয় পরিপূর্ণ হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী যখন মিলিতা হন, তখন তাহা দর্শনে সকলেরই পরমানন্দ হয়, তখন মদন মূর্চ্ছিত হইয়া যায়; আনন্দের নিকট মদনের স্থান কোথায়? সাংসারিক সুখ আমোদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা জড়ভাবাপন্ন; আর, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় সুখই আনন্দ বা পরমানন্দ। শ্রীবৃন্দাবনধামে ব্রজগোপিকাগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসাস্বাদন করিতেন, তাই তাঁহাদের নিকট কাম স্থান পাইত না। মথুরাধামে কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া মদনব্যথায় পীড়িত হন; প্রথমতঃ তিনি প্রেম পাইয়া-ছিলেন না, কারণ, সেখানে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ,—মাধুর্য্য নাই; সেখানে শ্রীমতী রাধা নাই। যাহা হউক, কৃষ্ণরূপের এমনই শক্তি যে, প্রথমতঃ কুব্জা কাম-পীড়িতা ছিলেন বটে, কিন্তু সেই কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়া গেল, তখন আর কাম রহিল না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিয়া প্রেমালিঙ্গন দিলেন। দ্বারকা-ধামেও দেখিতে পাই, কৃষ্ণভামিনীগণের মধ্যে কামমিশ্রিত প্রেম ছিল। শ্রীরাধার আনুগত্য ব্যতিরেকে কাম সম্পূর্ণরূপে যাইতে পারে না, আত্মসুখ-বাঞ্ছা কিছু-না-কিছু থাকিবেই। আত্মসুখবাঞ্ছাই কাম। পরিপূর্ণরূপে শ্রীভগবদ্গতপ্রাণ হওয়াকে প্রেম বলে। ব্রজধামেও দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ

যখন রাসরজনীতে বংশীধ্বনি করিয়া গোপিকাগণকে আহ্বান করিলেন, তখন গোপীগণ প্রাণের আবেগে কেহ কাহারও আনুগত্য স্বীকার না করিয়া সকলেই স্বাধীনভাবে ছুটিয়া গিয়াছেন। রাসমণ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রসনৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাইতে বাসনা করিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণসুখেচ্ছা না হইয়া আত্মসুখবাঞ্ছা হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাই কি করেন, ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া যতজন গোপী, ততজন কৃষ্ণ হইয়া মণ্ডলীবদ্ধভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা ইহাতে মান করিলেন, কারণ, তিনি কৃষ্ণগতপ্রাণা, কৃষ্ণসুখে সুখী। গোপিকাগণ আত্মসুখ কামনা করিবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিতে যাইয়া রাসের বিশুদ্ধ মধুররসে বাধা জন্মাইবেন, ইহা তাঁহার প্রাণে সহিল না। আর এদিকে,গোপিকাগণও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতা হইয়া অভিমান করিলেন। সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান হইলেন। শ্রীরাধা যে সকলের নেত্রী, তিনিই যে অনন্তপ্রেমের উৎস, এবং তাঁহার জন্যই যে তাঁহারা এই রাসরসাস্বাদনে অধিকারিণী হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই শ্রীরাধাকে লইয়া রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন। গোপিকাগণ কাঁদিয়া আকুল। প্রতি তরুলতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও নাথের সন্ধান পাইলেন না; অবশেষে কতদূরে যাইয়া শ্রীমতী রাধাকে একাকিনী বিরহবিধুরা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, শ্রীমতীর বিরহব্যথা তাঁহাদের অপেক্ষা কোটীগুণে অধিক। তাঁহারা শ্রীমতীকে লইয়া যমুনাপুলিনে আসিলেন। কতক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দেখা দিলেন। এই মধুর ঘটনাটী অতি সংক্ষেপে বলা হইল। যাহা হউক, ব্রজগোপিকাগণ ইহার পর হইতে শ্রীমতীকে লইয়াই কৃষ্ণভজন করিতেন, ইহাতে তাঁহাদের আর আত্মসুখেচ্ছা থাকিত না। রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপের নিকট মদন পরাভব স্বীকার করিয়া দূরে পলায়ন করে। সারী পাখী সত্যসত্যই বলিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বামে

শ্রীরাধা যতক্ষণ, ততক্ষণই তিনি মদনমোহন, নতুবা শুধুই মদন। এই যে দ্বারকাদি ধামত্রয়ের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে ব্রজধাম আনন্দ-নিকেতন, পূর্ণানন্দের আদর্শস্থল, মথুরাধাম ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি, দ্বারকাধাম সংসারের আদর্শস্থল। এই ধাম নিত্য চিন্ময়। সর্ব্বত্রই ইহার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করা যায়। মানুষ স্ব স্ব বাসনানুরূপ ইহার কোন একটী আদর্শ করিয়া চলিবে। পূর্ণানন্দ পাইতে হইলে গোপিকার অনুগত হইতে হইবে।

গৌরলীলা বুঝাইবার জন্যই কৃষ্ণলীলার এই সকল কথা সংক্ষেপে বলা হইল। কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ একই বস্তু। দ্বাপরযুগের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই কলিকালের শ্রীগৌরচন্দ্র হইয়া ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি সকল লীলা স্তরে স্তরে নদীয়াধামে প্রকাশ করিলেন। বেদমাতা গায়ত্রীস্বরূপা দেবী সরস্বতীর পতিরূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বিদ্যা ও জ্ঞানের অপার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। অর্থের ঐশ্বর্য্য এখানে পদানত। অভিমানী পণ্ডিতগণ জানিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সরস্বতী-পতি। সুতরাং তাঁহারা তাঁহার পদানত হইলেন। এই সময় শ্রীপ্রভু লক্ষ্মীপতি, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠনায়ক এবং সংসারী। প্রভুর পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সকলেরই পাণ্ডিত্যাভিমানরূপ প্রধান কুণ্ঠা বিদূরিত হইল; সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ইনিই সেই বেদাতীত পরমপুরুষ। তখনও শ্রীগৌরাঙ্গ মধুর প্রেমের খেলা প্রকাশ করেন নাই। তিনি তখন সংসারী। শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে নিয়া সংসার করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া নাগরীগণ ভুলিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহারা বড় একটা শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে আসিতেন না। লক্ষ্মীদেবীও তখন তাঁহাদের ভাবের পোষণ করিতেন না, কারণ, তখনো শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়ানাগর রসিকশেখররূপে আপনাকে প্রকাশ করেন নাই। লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিয়া তিনি কয়েকদিন পরেই পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন।

সংসারীবেশে অর্থোপার্জ্জন করা ইহার বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার

অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য ছিল প্রেমের বন্যা বহাইয়া জীবগণকে আকর্ষণ করা। প্রভু পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিলে লক্ষ্মীদেবী বিরহে দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু এটী একটী লৌকিক কথা। ভগবানের বিরহে ভক্তের দেহত্যাগ করা অসম্ভব। শ্রীপ্রভু শ্রীনীলাচলধামে বসিয়া শ্রীল সনাতনকে শিক্ষাচ্ছলে এই কথা স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন। ঘটনাটী এই, সনাতন নিজকে অতি তুচ্ছ এবং কৃষ্ণসেবার অনুপযোগী মনে করিয়া আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া সনাতনের কাছে যাইয়া বলিলেন,—"সনাতন, দেহত্যাগ করিলেই যদি কৃষ্ণ মিলে, তবে এই অসারদেহ কোটীবার ত্যাগ করিতে পারা যায়। কিন্তু বাস্তবিক দেহত্যাগ করার বাসনা তমোধর্ম্ম। দেহত্যাগ করিলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। সাধনভজন ও সেবাগ্রহণ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হয়।" শ্রীপ্রভু এই কথা বলিয়া আবার বলিলেন, "তবে যে, কোন কোন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহে দেহত্যাগ করিতে চাহেন, সে কথা স্বতন্ত্র। এ অবস্থায় ভক্ত দেহ ছাড়িতে চাহিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেন না। বিরহে যখন প্রাণ বাহিরিয়া যাইতে যায়, কৃষ্ণ তখন দর্শন দিয়া প্রাণরক্ষা করেন।" লক্ষ্মী দেবীর যখন প্রবল বিরহ হয়, তখন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি বৈকুণ্ঠনায়ক শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র কি তাহা জানিতেন না? নিশ্চয়ই জানিতেন। এবং বিরহে অন্যান্য ভক্তের প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার সময় তিনি দর্শন দিয়া রক্ষা করিতে পারেন, আর লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন দিয়া রক্ষা করিতে পারিতেন না? নিশ্চয়ই পারিতেন। কিন্তু প্রভু জানিতেন যে, তাঁহার ঐশ্বর্য্যলীলা সাঙ্গ হইয়াছে, এখন তাঁহার মাধুর্য্যের লীলা বিকাশ করিতে হইবে, তাই তিনি লক্ষ্মীদেবীকে স্বীয় দেহে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। আর লক্ষ্মীদেবীও জানিতেন যে, তাঁহার লীলা ফুরাইয়াছে, তাই তিনি শ্রীপ্রভুর দেহে অথবা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহে প্রবেশ করিয়া অন্তরালে রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া যখন একই বস্তু, তখন ইহাতে আর কোন কথা হইতে পারে না।

পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে যে, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরসঙ্গতা হইবার বহুপূর্ব্বেই গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার পথে বয়স্তাগণ সমভিব্যাহারে শ্রীগৌরচন্দ্রকে দেখিতে পান, তখন চারিচক্ষের মিলন হয়। আর গৌরাঙ্গের নাম ও রূপগুণের কথা শুনিয়াছেন অবধি বালা বিষ্ণুপ্রিয়া যে আপনাকে শ্রীগৌরাঙ্গচরণে মনে মনে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিয়াছেন, ইহাও পাঠক পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। এমন কি, বালা বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরনাম এতই মিষ্ট বোধ হইত যে, তিনি ইহা মনে মনে সর্ব্বদা জপ করিতেন। এ অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গের অবশ্যই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসঙ্গত হইতে হইবে। আমরা ইহা লৌকিকভাবে ধরিলাম। আর দেবী বিষ্ণুপ্রিযা ও গৌরাঙ্গের যে সময় পথে চারিচক্ষে মিলন হয়, তখন গৌরচন্দ্র অবিবাহিত নহেন; তিনি লক্ষ্মী-দেবীর সহিত পরিণীত। বিবাহ হইলেত আর কথাই নাই, বিবাহ না হইলেও কোন সাধুপুরুষ পরের মেয়ের পানে চক্ষে চক্ষে চাহেন না, তাঁহাকে তিনি কন্যা, ভগিনী বা মাতৃভাবে দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু চক্ষে চক্ষে চাহিয়া আকর্ষণ করিতে পারেন না। একজন সাধুপুরুষই যখন ইহা পারেন না, তখন সকল সাধুপুরুষের পরিপূর্ণ আদর্শ গৌরাঙ্গই তাহা পারিবেন কিরূপে? তাঁহার লীলাতেও দেখা যায় যে, তিনি বয়স্তগণের সঙ্গে কত চপলতা, কত রসরঙ্গ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নারী দেখিলেই তিনি একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করা দূরের কথা, তাঁহাদিগের প্রতি নয়নকোণেও চাহিতেন না। এহেন গৌরাঙ্গসুন্দর সনাতনসূতা বালা বিষ্ণুপ্রিয়ার—যিনি তখনো অবিবাহিতা তাঁহার দিকে চাহিলেন কেন? তাঁহার কারণ বলিতেছি শুনুন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জানেন, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া কি বস্তু। তিনি জানেন যে,

ইনি পরিপূর্ণ প্রেমস্বরূপিণী, ইঁহার সহিত তিনি শীঘ্রই মিলিত হইবেন, কারণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যলীলা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, মাধুর্য্যলীলা প্রকাশ করার সময় প্রায় উপস্থিত, ব্রজের উজ্জ্বলরস নদীয়ায় উন্নতোজ্জ্বল করিয়া বিকাশ করিতে হইবে এবং যাহা চিরকাল অনর্পিত ছিল, তাহা জীবকে সমর্পণ করিতে হইবে, শ্রীগৌরাঙ্গ বালা বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে চোখে এই সকল কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে বলিয়া ফেলিলেন, আর বালা বিষ্ণুপ্রিয়াও ইহা শ্রবণ করিলেন। তাই আমরা দেখিয়াছি, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চারিচক্ষের মিলন সময় হইতে প্রেমাধিক্যবশতঃ গৌরসঙ্গতা হইবার নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলেন। যাহা হউক, যখন সময় হইল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষ্মীদেবীকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মিলিত হইলেন। ইহার পর হইতেই নাগরীগণের গৌরভজনের সহায়তা হইল।

নাগরীগণের মধ্যে একটী রঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। গৌরাঙ্গ নাগর বেশে যখন বাহির হইতেন, কুলবধূগণ তাঁহাকে দেখিয়া তখনই তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার পত্নী হইতে চাহিতেন। এমন কি নদীয়াবাসিনী বৃদ্ধাগণও—যাঁহাদের অবিবাহিতা কন্যা ছিল, তাঁহারা গৌরাঙ্গের মত জামাতা পাইবার জন্য বাসনা করিতেন। কিন্তু যখন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াযুগল মিলিত হইলেন, তখন আর কাহারো গৌরাঙ্গকে ভিন্নরূপে পাওয়ার বাসনা রহিল না। যুগলকে সাজাইয়া পরাইয়া, যুগলের সেবা করিয়া, যুগলের রূপ সন্দর্শন করিয়াই তাঁহারা আনন্দসাগরে ভাসিতেন, অর্থাৎ নাগরীগণ তখন প্রেম পাইলেন, তাঁহাদের আত্মসুখবাঞ্ছা আর রহিল না। তাই বলিতে-ছিলাম, সারী পাখী যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্যসত্যই বলিয়াছে। নাগরীগণের পূর্ব্বাপর অবস্থা দর্শন করিয়া—সারী পাখীর প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি,

শ্রীগৌরাঙ্গের বামে যতক্ষণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, ততক্ষণই তিনি মদনমোহন, নতুবা তিনি শুধুই মদন। ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই, শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণু-প্রিয়া-যুগলভজনে পূর্ণপ্রেম-প্রাপ্তি হয়, নতুবা কিছু না কিছু আত্মসুখবাঞ্ছা থাকিয়া যায়।

উপরে যে শ্রীল রূপগোস্বামীকৃত 'অনর্পিত' 'উন্নতোজ্জ্বল' রস সম্বন্ধে একটী শ্লোকের আভাস দেওয়া হইল সেই শ্লোকটী এই—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

অর্থাৎ—যাহা কখনো কাহাকেও অর্পণ করা হয় নাই, সেই উন্নতোজ্জ্বল-রসসম্বলিত স্বীয় ভক্তিরূপ সম্পত্তি জীবকে সমর্পণ করিবার জন্য—যিনি করুণা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি সুবর্ণ হইতেও রমণীয় কান্তি সমুদ্দীপিত, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদিগের হৃদয়কন্দরে সর্ব্বদা স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

এই যে উন্নতোজ্জ্বলরস সম্বন্ধে বলা হইল, এই রসটী কি, একবার বিচার করিয়া দেখুন। এই রসটীই নবদ্বীপ রস। কেহ কেহ বলেন, এইটী ব্রজরস। শ্রীগৌরাঙ্গ এই ব্রজরস দিতে নবদ্বীপে আসিলেন এবং তিনি কৃষ্ণভজন জীবকে শিখাইয়া শ্রীকৃষ্ণে মিশিয়া গেলেন, তিনি আর স্বয়ং ভজনীয় রহিলেন না। কিন্তু এই কথায় "অনর্পিতচরীং" কথার অর্থসঙ্গতি হয় না। ব্রজরস পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, কাজেই অর্পিত হইয়াছে। ব্রজের যে উজ্জ্বল রস, উহাই উন্নতোজ্জ্বল করিয়া সম্যকরূপে অর্পণ করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন। এই উন্নতোজ্জ্বলরসই অনর্পিত ছিল। ইহাই নবদ্বীপ রস। আবার দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ

হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তাহা নহে, তাহা হইলে শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অংশবিশেষ হইয়া যান। তাই বলা হইয়াছে, কলিকালে শচীনন্দন অবতীর্ণ হইলেন। 'স্বভক্তি শ্রী' কথার সার্থকতা গ্রহণ করুন। নিজের প্রতি যে ভক্তি-সম্পত্তি, তাহা দিবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইলেন। এখানে 'স্ব' বলিতে শচীনন্দন শ্রীগৌরহরিকেই বুঝায় এবং শচীনন্দনই হৃদয়ে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন, এই কথা বলা হইয়াছে। শচীনন্দনের মধ্যদিয়া আর কেহ আসিয়া হৃদয়ে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন, ইহা বলা শ্রীল রূপগোস্বামীর অভিপ্রায় নহে। আর তাহা হইলে যুগানুবর্ত্তি ভজন কথাও থাকে না। তাই, সকল কথার সামঞ্জস্য করিয়া দেখিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, উন্নতোজ্জ্বলরসের আস্বাদন করিতে হইলে রসময়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই জীবের একমাত্র ভজনীয়। ইনিই দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর এই চারিটী রসের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি। মধুর রসের আস্বাদন করিতে হইলে নদীয়ানাগরী ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া নদীয়ানাগর শ্রীগৌরচন্দ্রকে আস্বাদন করিতে হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গত হইয়াছেন পর হইতেই নদীয়ানাগররূপে প্রকাশিত হইয়া নাগরীকুলকে আকর্ষণ করিলেন। নাগরীবৃন্দ কেন, সর্ব্বজীবের মধ্যেই তিনি প্রেমের ভাব জাগ্রত করিয়া দিলেন। এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াকিশোর এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নদীয়াকিশোরী। নাগরীগণ এই যুগলকিশোরকেই ভজন করিয়াছিলেন। নাগরীগণ কেন, সকলেই এই যুগলকিশোরের ভজন করিয়াছেন। তবে কেহ দাস্যভাবে, কেহ বাৎসল্যভাবে, কেহ সখ্যভাবে, কেহ মধুরভাবে। এই যুগলকিশোরই সকলের একমাত্র ভজনীয়। দাস্যভাবই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও প্রথম স্তর; এইভাবে সকলেই অনায়াসে ভজন করিতে পারে। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু, এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুপত্নী। আমরা তাঁহাদের দাসদাসী। এইভাবে প্রতিগৃহে

শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া সেবিত হইলে কর্ম্মের লাঘব হয়, পাপপুণ্যের অতীত হওয়া যায়, গৃহখানি শান্তিময় হয়। তাঁহারাই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদেরই নিদেশক্রমে আমরা যাবতীয় কর্ম্ম করিতেছি, আমরা তাঁহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র। সুতরাং ভালমন্দ, লাভলোকসান সবই তাঁহাদের। এ অবস্থায় জীব সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা হইতে অনায়াসে অব্যাহতি পায়। যে মুক্তির জন্য মানুষ কত যুগযুগান্তর ধরিয়া যোগতপস্যা করিয়াছে, কত কঠোর সাধনা করিয়াছে, এখনও কত লোক কত কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে, কত লোক বা পথ না পাইয়া এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং কোন পথই অবলম্বন করিতেছে না, সেই মুক্তি এতাদৃশ দাস্যভক্তির নিকট অতি সহজ। মুক্তি অর্থ শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলিয়া যাওয়া নহে; ইহার অর্থ ভবযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া; এই পরিত্রাণের পর শ্রীভগবৎসঙ্গ-জনিত একটী অপার আনন্দ হয়, তাহা অব্যক্ত, শুধু নিজবোধগম্য। এই সংসারে থাকিয়াই মুক্ত হওয়া যায়, তখন তাহাকে জীবন্মুক্ত বলা হয়, এবং এই সংসারে থাকিয়াই এই জীবন্মুক্ত অবস্থায় শ্রীভগবৎসঙ্গজনিত পরমানন্দ-সুখ আস্বাদন করা যায়। এই আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন আর তাহার দৈহিক বন্ধন থাকে না, কাজেই সে জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া যায়। সে শুদ্ধ চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করে। যে ভাবেই থাকুক না কেন, সে সচ্চিদানন্দময় রাজ্যে বিচরণ করে।

এই দাস্য ভাবের একটী অলৌকিক দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করুন, আপনি যদি কাহারও অধীনে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তবে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মও অবশ্য নিরূপিত থাকিবে। আপনি তখন স্বীয় দৈনন্দিন কর্ম্ম করিয়া কর্ত্তাকে বুঝাইয়া দিলেই আপনি অবসর পাইলেন। কর্ত্তা যে ভাবে বলিতেছেন, আপনি সেই ভাবেই কার্য্য করিতেছেন; সুতরাং ইহার ভালমন্দ লাভ লোকসান তাঁহার, আপনি কর্ম্ম বুঝাইয়াই খালাস।

অবশ্য এই কর্ম্মের জন্য আপনি কিছু নির্দ্ধারিত পুরস্কার প্রাপ্ত হন। আপনার কর্ত্তা যদি সজ্জন হন, তবে আপনাকে শুধু পুরস্কার দিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, আপনার কর্ম্মপটুতার জন্য আপনাকে কত ভাল বাসিবেন এবং সময় সময় কৃতজ্ঞতাও জানাইবেন, আর যদি আপনি অপটু হন, তবে তিনি আপনাকে মন্দ না বলিয়া ক্রমে কর্ম্ম শিখাইয়া লইবেন। দাস অপেক্ষা প্রভুর দায়িত্ব বেশী, চিন্তাও বেশী; দাস প্রভুর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত; সুতরাং সে প্রভু অপেক্ষা অধিক সুখী। পুত্রের পিতামাতার প্রতি যে ভক্তি, তাহাও এই দাস্যভক্তির অন্তর্গত। ছেলে মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত। শ্রীভগবান্ ও জীবের মধ্যে এই সম্বন্ধ ধরিলে ইহা আরও মধুর ও উজ্জ্বল হইবে। কারণ লৌকিক সম্বন্ধ নিত্য ও বিশুদ্ধ নহে। মানুষ ভ্রমপ্রমাদ ও ক্রোধাদি রিপু-বিবর্জ্জিত নহে। আমরা শ্রীভগবানের নিত্য দাস; এই দাস্যভাব অঙ্গীকার করিয়া আমাদের কার্য্য করিতে হইবে। লৌকিক প্রভু দাসের কর্ম্ম নিরূপিত করিয়া বলিয়া দেন; কিন্তু যিনি প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তাঁহার জগদ্বাসী সকলকে পরিচালন করিতে হইবে; তিনি বাহিরে কোন কথা বলিয়া কাহারও কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্দ্ধারিত করেন না। তিনি অন্তর্য্যামী পুরুষ, ইহা সকলেরই অন্তরে অন্তরে জাগাইয়া দেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি অন্তরালে থাকিয়া জীবগণকে পরিচালনা করিতেছেন; সুতরাং কখন কি করিতে হইবে এজন্য ভাবিতে হইবে না বা তাঁহার আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই হইল। লৌকিক প্রভু সজ্জন হইলেও সম্পূর্ণ দোষ-বিহীন নহেন। কিন্তু আমাদের পরম প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর অদোষদর্শী। জীবের স্বভাব তিনিই দিয়াছেন, মায়া তিনিই দিয়াছেন। কাহার কি শক্তি, কে কোন্ স্তরে আছে এবং কোন কার্য্য করিতে সমর্থ, তাহা তিনি জানেন।

জীব তাহা জানে না। সুতরাং জীবের আর ভাবিবার কি আছে? তিনিইত বুঝিয়া তাঁহার জীব চালাইয়া নিবেন। লৌকিক দাসত্বে অধীনতা বোধ আছে ও তাহাতে দুঃখ ও অপমান বোধ আছে। কিন্তু শ্রীভগবানের দাস্যভাবে আত্মগৌরব বোধ হয়। ভগবানের দাস বলিয়া পরিচয় দেওয়া আত্মশ্লাঘার বিষয় এবং ইহাতে নির্ম্মল নিরবচ্ছিন্ন সুখ হয়। না চাহিতেই এই দাসত্বের পুরস্কার পাওয় যায়। তিনিই বুদ্ধি ও শক্তি দিয়া কার্য্য করাইয়া লয়েন; দোষও তিনিই গ্রহণ করেন না, সুখ স্বচ্ছন্দতারূপ পুরস্কার ত দিয়াই থাকেন; ইহার অতিরিক্ত তিনি অযাচিতভাবে আরো একটী পুরস্কার দিয়া থাকেন, সে পুরস্কার সর্ব্বোচ্চ, সেটী পাইলে জীবের আর অভীপ্সিত কিছু থাকে না। সেটী প্রেম ও আনন্দ—'শ্রীভগবান্ আমাকে বড় ভাল বাসেন', প্রতি কার্য্যে ইহার উপলব্ধি ও তজ্জনিত আনন্দোপভোগ। তখন বিশ্বসংসার সুখময়—পরমানন্দময় হইয়া যায়।

জীব শ্রীভগবানের নিত্যদাস। জীবের স্মৃতি না থাকাতেই সে আনন্দ পায় না, মায়া তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করে। এই দাস্যভাব জাগ্রত রাখার জন্য প্রত্যহ উপাসনা করা প্রয়োজন। উপাসনা অর্থ নিকটে বসা, অর্থাৎ, শ্রীভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি করা। শ্রীভগবান্‌কে দূর হইতে ডাকিয়া আনিতে হইবে না। তিনি নিকট হইতেও অতি নিকট, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই আনন্দ হয়। এইজন্যই শ্রীমূর্ত্তির প্রয়োজন। জীবগণকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অনন্তরূপের উৎস শ্রীভগবান্ যে মূর্ত্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সেই মূর্ত্তি চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া, কিংবা, মৃত্তিকা বা দারু প্রভৃতি কোন দ্রব্যদ্বারা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা সম্মুখে রাখিতে হয়; ইহার মধ্য দিয়া শ্রীভগবানের রূপ ও লীলামাধুরী হৃদয়ে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার অনুধ্যানেই প্রেমের প্রস্রবণ খুলিয়া যায়।

যাঁহারা মূর্ত্তি পূজার বিরোধী, তাঁহাদের নিকট বক্তব্য এই, আপনারা কি আপনাদের প্রিয়জনের ফটো রাখেন না? তাহাতে কি প্রিয়ব্যক্তির গুণাবলীর কথা হৃদয়ে জাগেনা ও তাহাতে প্রীতি বর্দ্ধিত ও হৃদয় বিশুদ্ধ হয় না? পরম প্রেমমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের মত প্রিয়বস্তু আর কি হইতে পারে? ভজন-পূজন আর কিছুই নহে—যাঁহার পূজা করা হয়, তাঁহার ভাবের অনুধ্যান করা এবং সেইভাবে নিজের ভাবকে গঠিত করা। জগতে যে অনন্ত প্রেমের ভাব রহিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি সেই ভাবসমূহের সমষ্টি। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট লীলাকালীন ভক্তগণ স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, কিংবা অধুনাতন ভক্তগণ সেই পন্থা অবলম্বনে অথবা তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ যে ভাবে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ভাবে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যেরূপ ভজন করিতেছেন, সেইরূপ মূর্ত্তি করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রকে সম্মুখে রাখিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া চিদানন্দ মূর্ত্তি, তাহাইত হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্যান করিলে ভজন হয়; তাহাদের আবার মৃণ্ময়ী বা দারুময়ী মূর্ত্তি করার প্রয়োজনীয়তা কি? আমরা বলি, ইহা সত্য বটে, কিন্তু মূর্ত্তি করিয়া সম্মুখে রাখিলে মনন ও চিন্তন সহজ হয়, ভাব সহজে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, তাঁহার লীলামাধুরী সহজেই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। প্রিয়ব্যক্তির ফটোখানি সম্মুখে রাখিলে তাঁহার স্মৃতি যে সহজে জাগ্রত হয় এবং দর্শনমাত্রেই যে একটী নবভাবের সঞ্চার হয়, অন্যথা তাহা হয় না, ইহা কে অস্বীকার করিবেন? শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্ত্তি সম্বন্ধেও এই কথা। আর এককথা মনে রাখিবেন, যিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব। তিনি এতাদৃশ মূর্ত্তির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে পারেন না, বা ভাব ফুটাইতে অসমর্থ, জিদের বশবর্ত্তী হইয়া এই ধারণা করিয়া বসিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য

নহে, তাহাতে শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তারও খর্ব্বতা করা হয়। আর এক কথা, কেহ কেহ বলিতে পারেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতে যাই কেন? তিনি যে ভগবান্, তাহার বিশ্বাস কি? ভাল কথা, আপনা অপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞ ও বহু বিচারশীল পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া ভজন করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী, যিনি সন্ন্যাসীর রাজা ছিলেন, যাঁহার মত পণ্ডিত তখন জগতে আর ছিল না, তিনি এবং তাঁহার মত কত বড় বড় পণ্ডিত, কত মহাজন শ্রীগৌরাঙ্গকে কলির জীবের একমাত্র আরাধ্য বস্তু বলিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গভজন করিতে পারেন, ভাল, নতুবা আর একটী কথা বিচার করুন। শ্রীগৌরাঙ্গ জগতের গুরু। তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারেন, তাহাতে ক্ষতি নাই। তাঁহার লীলা মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন এবং তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করুন, দেখিবেন, তাঁহার প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্য, প্রতি কথা কত উপদেশপ্রদ; তাঁহার জীবন মানবের পরিপূর্ণ আদর্শ। দেখিবেন, শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পরিপূর্ণ আদর্শ পতিপত্নী। ইঁহারা প্রেমের প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি। জগতে এরূপ আর হয় নাই। একদেশদর্শিতা পরিশূন্য হইয়া সমালোচকভাবেও আপনি যদি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন, তিনি জগদ্‌গুরু; বিশ্বপ্লাবনী ভক্তি ও প্রীতি তাঁহা হইতেই আসিয়াছে। তর্ক করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারিব, এ আশা আমাদের নাই; তর্ক করিতে আমাদের বাসনাও নাই। আমরা প্রাণে প্রাণে যাহা বুঝিয়াছি, যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। আমরাও কোন সময় মায়াবাদী ছিলাম, যীশুখ্রীষ্টের উদার প্রাণ দেখিয়া আমরাও মুগ্ধ হইয়াছিলাম, মহম্মদের ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমরাও

কোন সময় মূর্ত্তির বিরোধী ছিলাম, কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় গৌরলীলার যখন আস্বাদন পাইলাম, তখন দেখিলাম, ইহার মধ্যে সকল ধর্ম্মেরই রস রহিয়াছে; অধিকন্তু ইহার মধ্যে আর একটী রস আছে,—যাহা অন্য কোথাও নাই। সরল ভাবে শ্রীভগবানের নিকট সত্য বস্তু জানিতে চাহিলে তিনি নিশ্চয়ই প্রেমরসপরিপূর্ণ তাঁহার সর্ব্বোত্তম গৌরলীলা হৃদয়ে প্রকাশ করিবেন। যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যখন বিশ্বগুরু, তখন তাঁহাকে আদর্শ করিয়া চলা, তাঁহার মহাভাবময়ী মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার ধ্যান এবং তাঁহার লীলারসে প্রাণখানি অভিসিঞ্চিত করা সকল জীবেরই কর্ত্তব্য।

এখন আর একটী কথা। শ্রীভগবান্ কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব নহেন। তিনি সকলেরই নিজজন। সকলের পক্ষে যে ভজন সহজ, তাহাই তিনি প্রকাশ করিবেন। যোগ প্রাণায়ামাদি সকলের পক্ষে সাধ্যায়াত্ত নহে। তিনি তাই, প্রভু, সখা, পুত্র, কান্ত, এই সংসারের ভাবচতুষ্টয় লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। সংসারে মায়াবদ্ধ জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়া মানুষ সুখ পায় না, তাই তিনি জীবকে প্রকৃত সুখ প্রদান করিবার নিমিত্ত জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে আসিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, তোমার দাস্যভাব ভাল লাগে, আমাকেই প্রভু কর; বন্ধুভাব ভাল লাগে, আমিই তোমাদের বন্ধু; ইত্যাদি। তিনি জানাইলেন যে, এই সম্বন্ধ নিত্য ও পরম সুখপ্রদ, ইহাতে মায়ার লেশমাত্র নাই। আবার তিনি আহারাদি করিয়া দেখাইলেন যে, যিনিই যেভাবে তাঁহাকে দর্শন করুন না কেন, তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে শয্যা, আসন, ভোজনাদি সামগ্রী দিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারেন। ইহাতে কোন মন্ত্র-তন্ত্র বা বিধির অপেক্ষা করে না। তিনি শুধু প্রাণ-খানি চান। যিনি পরিপূর্ণ, তাঁহার ভজন অতি সহজ, তাঁহার ত কোন জিনিষের অভাব

নাই, যে তাহা না দিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না! জীবের সেবা করিয়া কাহারও সুখ হইতে পারে না, তাহার সর্ব্বদাই অভাব। কোন জিনিষ দিয়াই তাহার তৃপ্তি জন্মান যায় না। সে আরো চায়, আরো চায়। শ্রীভগবান্‌কে প্রাণ খুলিয়া যাহা দেওয়া যায়, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। তাই, আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করি, যাহা যাহা আমাদের প্রিয়, তাহা যেমন আমাদের কোন প্রিয়ব্যক্তিকে দিলে আমাদের সুখ হয়, শ্রীভগবান্‌কে তাহা দিলে তদপেক্ষা কোটী-গুণে সুখ হয়, কারণ তাঁহা অপেক্ষা আর কেহ প্রিয় হইতে পারে না। অতএব শ্রীমূর্ত্তি যে গৃহে থাকিবেন, সেই গৃহে শয্যাসনাদি স্ব স্ব ভাবানুরূপ তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। আমরা যাহা ভোজন করিব, তাহা রন্ধনাদি করিয়া আমাদের ভোজনের পূর্ব্বে সেই গৃহে নিয়া স্বীয় ভাবানুযায়ী তাঁহাকে দিতে হইবে। পরে তাঁহার খাওয়া হইলে অবশেষ অর্থাৎ প্রসাদ আনিয়া নিজেদের গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি ভোগ-রাগ লাগাইতে অসমর্থ, তিনি কেবল মাত্র তাঁহার শ্রীচরণকমলে চন্দন-লিপ্ত তুলসী সমর্পণ করিয়া স্বীয় অসমর্থতা ও দৈন্য জানাইবেন, ইহাতেই আত্মার শোধন হইবে। ইহা শ্রীভগবানের আদেশ। তিনি এতই ভক্ত-বৎসল যে তাঁহার শ্রীচরণে কেবলমাত্র তুলসী-জল অর্পণ করিলেই তিনি ভক্তের নিকট বিক্রীত হন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যিনি সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তভাবে ভজন করিবেন, তাঁহার ভগবচ্চরণে তুলসী দিবার প্রয়োজন কি? আমরা বলি, যাঁহার ভাব গাঢ় হইয়াছে, তিনি আর কাহারও নিকট পরামর্শ লইবেন না। তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথাও বলা হইতেছে না। কিন্তু সে ভাব দুর্লভ। শচীমা, বিষ্ণুপ্রিয়া সকলে হইতে পারেন না। অনেকের ভাবই সাময়িক। তাঁহারা সময় সময় প্রেমাস্বাদন

করেন বটে, কিন্তু যখন আবার জীবভাব প্রবল হইয়া উঠে, তখন দাস্যভাব দ্বারা প্রেমের ভাবকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিতে হইবে। সেই জন্যই মহাজনগণ বলিয়া থাকেন যে, দাস্যভাব সকল ভাবের ভিত্তি। এই ভাবের ক্রমোৎকর্ষে অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ হয় বটে, কিন্তু দাস্যভাব একবারে যায় না। ইহা গেলে স্বেচ্ছাচারিতা ও অভিমান আসিয়া পড়ে। অন্যের কা কথা, প্রেমের মূর্ত্তি গোপিকাগণও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিনা মূল্যের দাসী।

এখন কথা এই, যাঁহার ভোগরাগ দিতে ইচ্ছা আছে, তিনি কি কি দ্রব্য দ্বারা এবং কি প্রকারে ভোগ দিবেন; তবে শুনুন, শ্রীভগবান্ শুদ্ধ সত্ত্বস্তু, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে আপনারও শুদ্ধ সত্ত্বভাবাপন্ন হইতে হইবে। তাহা হইলেই, যে সকল দ্রব্য এই ভাবস্ফূরণের অনুকূল, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করা এবং তাহা দ্বারাই শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ভোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আবার বাসী জিনিষ খাওয়া সত্ত্ব-ভাববিরোধী এবং এমন কি পূর্ব্বদিনের হাঁড়িতে রন্ধন করিয়া খাইতেও বড় একটা প্রবৃত্তি হয় না। প্রত্যহ ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলে আপনারই যখন প্রীতিকর হয়, তখন আপনার প্রিয় অভীষ্ট বস্তুকেও সেইভাবে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রূপে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীপ্রভু যখন প্রকট থাকিয়া লীলা করেন, তখন তিনি যে যে দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহার লীলাগ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই। সেই সকল গ্রন্থে বর্ণিত দ্রব্যাদি দ্বারাই আমাদের ভোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। তার পর, ভোগের দ্রব্যাদি প্রভুর মন্দিরে নিয়া আসনের সম্মুখে রাখিয়া তদুপরি তুলসী-মঞ্জরী বা তুলসী পত্র স্থাপন করিতে হইবে। তুলসী প্রভুর পরম প্রিয় অর্থাৎ ইহা সত্ত্বভাবসম্পন্ন। ইহা সেবন করিলে আপনার

সত্ত্বভাবের উদয় হইবে। কাজেই অন্নব্যঞ্জনাদির উপর তুলসী স্থাপন করিয়া শ্রীপ্রভুকে দ্রব্যাদি ভক্তি সহকারে নিবেদন করিয়া প্রণাম করিবেন। প্রভু ইহা গ্রহণ করিয়া প্রসাদ করিয়া দিবেন। আপনি শ্রীপ্রসাদ পাইয়া ধন্য হইয়া যাইবেন।

আর দেখুন, আপনার প্রিয় কোন মায়িক জীবকে সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত কোন একটা প্রতিদান পাওয়ার আশা অনেক সময় বিড়ম্বনা মাত্র হয়। অবশ্য কাহারও সেবা করিয়া প্রতিদানের আশা করা কামেরই অন্তর্গত। শুদ্ধ ভালবাসায় এতাদৃশ স্বার্থগন্ধ থাকিবে না। এই ভালবাসায়, প্রিয়ব্যক্তিকে যে কোন দ্রব্য দেওয়া যায়, তিনি উহা গ্রহণ করিলেই দাতার আনন্দ। কিন্তু গ্রহীতা তাহা ছাড়িবেন কেন? তিনিও ভালবাসিয়া ভাল ভাল দ্রব্য আনিয়া প্রত্যর্পণ করিবেন। কিন্তু মায়িক জীব আর কত দিতে পারে? প্রেমিক ভক্তও শ্রীভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। তিনি তাঁহাকে অতি নিজ-জন-বোধে খাওয়ান, পরান। কিন্তু ভগবান তাহা ছাড়িবেন কেন? তিনি ভক্তের ভাবোচিত ভাব গ্রহণ করিয়াই ভক্ত-দত্ত দ্রব্যাদি অঙ্গীকার করেন এবং অন্তরালে তাঁহার ঐশ্বর্য্য শক্তি প্রকাশ করিয়া ভক্তকে তাহার শতগুণ দিয়া থাকেন। প্রথমতঃই ত দেখুন, তাঁহার ভোগের নিমিত্ত যে সকল দ্রব্যাদি দেওয়া হয়, তাহা তিনি অঙ্গীকার করিয়া তাহাতে এক অপ্রাকৃত আস্বাদন করিয়া দেন। আপনি দিবেন তাঁহাকে সামান্য অন্ন ব্যাঞ্জন, এবং তিনি তখনই তাহাতে এক অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত আস্বাদন ও চিচ্ছক্তি প্রদান করিয়া উহা প্রত্যর্পণ করিবেন, উহা গ্রহণ করিলে আপনার প্রেমের সঞ্চার হইবে। আর তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া আপনার যে স্বাভাবিক সন্তোষ হইবে, তাহার ত আর কথাই নাই। আপনি যখন প্রাণে প্রাণে বুঝিবেন, মানস নয়নে এবং এমন কি, কখন কখন লৌকিক লোচনেও দেখিবেন যে,

আপনার প্রদত্ত দ্রব্য শ্রীপ্রভু গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ত আপনার আনন্দের আর অবধি থাকিবে না। তিনি যে দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন, ইহার প্রমাণ তিনি রাখিয়া দেন এবং প্রাণে প্রাণেও বুঝাইয়া দেন। আপনার যদি ইহাতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না হয়, তবে শ্রীভগবানের এতাদৃশ ভজন ব্যাপারকে কিম্ভূত কিমাকার বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া, কিছু দিন এই ভাব অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, অথবা যে ভক্তের উপর আপনার শ্রদ্ধা হয়, কিছুদিন তাঁহার সঙ্গ করিয়া তাঁহার সেবা-প্রণালী সন্দর্শন ও সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া দেখিবেন। আপনার উহাতে লোভ হইবে। সঙ্গ হইতেই ভাবের স্ফুরণ ও বৃদ্ধি হয়। যাহাদের শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, তাঁহাদের জন্যই এই সকল কথা বলা হইল। অন্য পাঁচটাও দেখিতেছেন, আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম বহুদিন হইতেই দেখিয়া আসিতেছেন, এই প্রীতির ধর্ম্মও একবার বিচার করিয়া দেখুন, পরীক্ষা করুন, কয়দিন জীবনে অনুসরণ করুন। যদি প্রাণে শান্তি পান, হৃদয়ের আরাম হয়, তবে গ্রহণ করিবেন, নতুবা ছাড়িয়া দিবেন। যাহাদের আকাঙ্ক্ষা না হইয়াছে, সংসারে কর্ম্মস্রোতে যাহারা বিমুগ্ধ হইতেছেন, তাঁহারাও একবার এই সহজ সুধাময় পন্থাটী অবলম্বন করিয়া দেখুন, দেখিবেন, ভজনের প্রারম্ভেই শান্তি! দুদিন স্থির হইয়া অনুধাবন করিলে ত আর কথাই নাই! দেখিবেন, আপনার কর্ম্ম-বন্ধন ছুটিয়া যাইবে, প্রাকৃত ক্ষোভে আপনার হৃদয় উদ্বেলিত হইবে না; বিশুদ্ধ প্রেম-প্রস্রবণ উথলিয়া উঠিবে, বিশ্ব সুখময় দেখিবেন।

এই ভজনে আপনি আর একটী সুখময় ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। আপনারা জানেন, এই সংসারটী মায়ার খেলা, অথচ এই সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য জীবের কত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, কত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। আপনারা ইহাও জানেন যে, মায়া চিদানন্দ রাজ্যেরই

ছায়া মাত্র। আলোর প্রকাশে ছায়া স্বভাবতঃই সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ছায়াকে সঙ্গে রাখার জন্য কাহারো কোন চেষ্টা করিতে হয় না, কাহাকেও কোন প্রার্থনা করিতে হয় না। সেইরূপ আপনি যদি শ্রীগৌর-ভজনে ব্যাপৃত থাকেন, তবে দেখিবেন মায়িক সংসারের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে আপনা হইতেই সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। আপনি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, যে মায়ার সংসারে উন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনাকে কত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, সেই মায়ার সংসার নিজেই আপনার সুখ-সাধনের নিমিত্ত ছায়ার মত সর্ব্বদাই আপনার অনুগত হইয়া থাকিবে; শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট এজন্য কোন প্রার্থনাও করিতে হইবে না, আপনারও সংসারের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না; আপনি ঐহিক ও পারমার্থিক উভয় সুখই যুগপৎ প্রাপ্ত হইবেন, ও অবশেষে ঐহিক সুখ পারমার্থিক সুখে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে— য ঐহিক সুখ পারমার্থিক সুখের প্রতিকূল, ত'হা অনুকূল হইয়া যাইবে।

(১১)

শ্রীগৌরচন্দ্র বিদ্যারসে বিভোর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি প্রায় সর্ব্বদাই শিষ্য লইয়া অধ্যাপনায় ব্যস্ত থাকেন, গার্হস্থ্যরস আস্বাদন করিবার সময় পান না। তিনি যে অর্থোপার্জ্জনের জন্য অধ্যাপনা কার্য্যে বিব্রত রহিয়াছেন, তাহা নহে; কারণ, অর্থ তাঁহার করতল-গত। তাঁহার চাল-চলন বড় মানুষের মত ছিল না বটে, ঘরে অর্থও সঞ্চিত থাকিত না, কিন্তু অর্থের অভাবও ছিল না। তাঁহার দৈনিক ব্যয়ও প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার গৃহখানি প্রাসাদ তুল্য জাঁকজমকশালী ছিল না বটে, কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্রের কি অভূতপূর্ব্ব আকর্ষণে এবং শ্রীশচীমাতার অপার্থিব স্নেহে, সেই দীন ভবনে যাইয়াই অনেকে প্রাণের জ্বালা জুড়াইত, অন্য কোথাও কেহ আশ্রয় না পাইলে তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া সকলেই

আশ্রয় পাইত। শুধু আশ্রয় নহে, নানাবিধ উপচারে ভোজন করিত এবং তদুপরি এক অপার্থিব আনন্দ পাইয়া ধন্য হইয়া যাইত। অতিথি অভ্যাগতের বিরাম নাই। সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, গৃহী, ধনী, দরিদ্র, উচ্চশ্রেণী, নিম্নশ্রেণী, সকলেই সেথানে সমভাবে আদৃত হইতেন। তখন নদীয়া নগরের ঐশ্বর্য্যের অবধি ছিল না। জ্ঞানের গৌরব ইহার প্রধান ঐশ্বর্য্য ছিল। প্রেমের ঐশ্বর্য্য তখনও বিস্তৃত হয় নাই। নবদ্বীপের নাম শুনিয়া জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত বিভিন্ন দিগ্‌দেশ হইতে পাঠার্থিগণ এখানে আসিতেন; অনেকেই বাসা করিয়া থাকিতেন; কেহ কেহ বা সমৃদ্ধিসম্পন্ন কোন মহাশয় ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন। যিনি অন্য কোথাও আশ্রয় না পাইতেন, তিনি অনন্যোপায় হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের শরণাপন্ন হইতেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গও তাঁহাকে আশ্রয় দানে কৃতার্থ করিতেন। ইহা ছাড়া, শ্রীগৌরাঙ্গ যে জগতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, নবদ্বীপের একমাত্র গৌরব এবং নবদ্বীপের গৌরব বলিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের গৌরব, তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। ইঁহার ভুবনমোহন অঙ্গকান্তির কথাও সকলে শুনিয়াছেন। তখনও তিনি ভগবান্ রূপে প্রকাশিত না হইলেও তিনি যে অসীমক্ষমতা-সম্পন্ন একজন মহাপুরুষ, সকল মানব হইতেই যে তিনি শ্রেষ্ঠ, একথা অনেকেই বুঝিয়াছেন। স্বীয় গর্ব্ব বশতঃ কেহ কেহ বাহিরে ইহা প্রকাশ না করুন, কিন্তু প্রাণে প্রাণে একথা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে, তিনি যে ভগবান্ বা তাঁহার অতি নিজ-জন, ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। কাজেই তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন দিগ্‌দেশ হইতে বহুলোক আসিয়া নদীয়ানগরে উপস্থিত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ী আসিয়া থাকিতেন। জনপ্রবাহের আর বিরাম ছিল না। নিমাইয়ের সংসারে পরিবারের মধ্যে তিনি, বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা এবং ঈশান নামক একজন ভৃত্য, এই চারিজন মাত্র। আর

শ্রীমতার পিত্রালয় হইতে যে দাস দাসী আসিয়াছেন, তাঁহারাও পরিবার-ভুক্ত হইয়াছেন। সংসারে এই কয়জন মাত্র লোক বটে, কিন্তু তাহা ছাড়াও প্রত্যহ বহুলোকের আহারের আয়োজন হইত। শ্রীনিমাইচাঁদের এই সকলেরই অন্নের সংস্থান করিতে হইত। কোথা হইতে যে অর্থাগম হইত, কেহ বলিতে পারিত না। লক্ষ্মী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৃহে আনিবার পূর্ব্বে কোন কোন দিন হয় ত শচীমাতাকে নিমাইয়ের কাছে অভাব জানাইতে হইত, নিমাইও অভাব পূরণের জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেন। তিনি যে, কোন দিন কাহারও নিকট কিছু চাহিয়া আনিতেন, তাহা নহে, নদীয়ানগরে এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না। নদীয়ায় ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। বহু ধনবান্ ব্যক্তি সেখানে বাস করিতেন। পণ্ডিতেরও তখন প্রভূত সম্মান। কোনও ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে কোন পণ্ডিত দ্বারস্থ হইলে তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিতেন এবং তাঁহাকে সাধ্যানুরূপ ও পণ্ডিতের মর্য্যাদানুযায়ী অর্থ দিয়া নিজেই কৃতার্থ বোধ করিতেন। কোন পণ্ডিতের বড় একটা প্রার্থনা করিতে হইত না। ধনশালী ব্যক্তিগণ পণ্ডিতদিগকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে পোষণ করিতেন, কিন্তু গৌরচন্দ্র কাহারও দ্বারস্থ হইতেন না। বৃত্তিও গ্রহণ করিতেন না, একথা সমস্ত নদীয়ানগরে বিদিত ছিল, তথাপি তিনি যেন কোথা হইতে গৃহের সমস্ত অভাব পূরণ করিতেন। লক্ষ্মীদেবী আসার পর, এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধান হইলে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া গৃহখানি অলঙ্কৃত করিলে পর ত আর কথাই নাই, গৃহে কোন অভাবই ছিল না। শচীমাতার আর তখন কোন অভাবের কথা নিমাইকে বলিবার অবসর হইত না। শ্রীমতীর পিতা পণ্ডিত সনাতন মিশ্র অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিলেন বটে, এবং বিবাহের সময় তিনি যৌতুকও অনেক দিয়াছিলেন, এমন কি, মধ্যে মধ্যে তিনি বহু দ্রব্য সামগ্রীও পাঠাইতেন।

কিন্তু, নিমাইয়ের বাড়ীতে যেরূপ প্রত্যহই উৎসব, প্রত্যহই অন্নসত্র, তাহাতে সেই অর্থেও সঙ্কুলান হওয়ার কথা নহে। মানববুদ্ধির অগোচর কি এক লুক্কায়িত ঐশ্বর্য্য আসিয়া নিমাইয়ের ভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রাখিত। কিন্তু তথাপি নিমাইয়ের চালচলন বড় মানুষের মত ছিল না। এতাদৃশ স্বচ্ছলতা ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই শচী মা তাঁহার সমবয়স্কা প্রতিবেশী-গণের নিকট বলিতেন যে, তাঁহার বধূমাতা গৃহে আসা অবধি আর তাঁহার কোন অভাব নাই; তাঁহার বধূমাতার দেহে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজ করেন।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। শচী মা কখনও মনে করিতেন না যে, তাঁহার বধূমাতা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াই স্বয়ং লক্ষ্মী। তিনি ভাবিতেন যে, লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার দেহে বিরাজ করেন, অথবা লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগতা হইয়া গৃহখানিকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন। এই কথাটী বিচার করিয়া দেখুন, দেখিবেন ইহার মধ্যে গূঢ় তত্ত্ব, অথচ সহজ মধুর ভাব রহিয়াছে। লক্ষ্মী অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী। যেখানে তাঁহার প্রভাব পরিপূণ মাত্রায় বিরাজিত, সেখানে শুধু ঐশ্বর্য্যের খেলা, সেখানে প্রেমের মধুরতা নাই। ঐশ্বর্য্যে মোহ আছে, মাদকতা আছে, মধুরতা নাই; কিন্তু প্রেমে মধুরতা আছে, এবং ঐশ্বর্য্য ইহার অনুগামী থাকিয়া ইহার পোষণ করে, অথচ সে ঐশ্বর্য্যে বিকার নাই, বরং ইহা প্রেমের অঙ্গসৌষ্ঠব করে। ভাষায় ইহা বুঝান যাইবে না। যিনি প্রেমরসের আস্বাদন করিয়াছেন, তিনিই ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছেন। ধরুন, আপনি শ্রীভগবান্‌কে অতি নিজজন বোধে ভালবাসেন, কিন্তু আপনি অতিশয় কাঙ্গাল। তথাপি শ্রীভগবান্‌কে আপনার একটী জিনিষ খাওয়াইতে ইচ্ছা হইতেছে, কিম্বা শয্যা, আসন বা বসনের কোন একটী বহু মূল্য দ্রব্য আপনার তাঁহাকে দিতে ইচ্ছা হইতেছে।

নিজের সুখ-বাঞ্ছা নাই, অথবা লৌকিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ কোন স্বজনকে দিতে ইচ্ছা হইতেছে না, কিম্বা শ্রীভগবান্‌কে একটী জিনিষ দিয়া তাহার প্রতিদান স্বরূপ কিছু পাওয়া যাইবে, এ দুর্ব্বাসনাও নাই। মোট কথা, কাম-গন্ধ একবারেই নাই। শুদ্ধ প্রীতিবশতঃ শ্রীভগবান্‌কে কোন জিনিষ অর্পণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে; অথচ দেখিতেছেন, সে জিনিষ আপনার অধিগম্য নহে। তখন, কাঙ্গাল আপনি, প্রেমের প্রবলতায় আপনার আকুলপ্রাণে ক্রন্দন ছাড়া আর উপায় নাই। দেখিবেন, সেই জিনিষ কি এক অপ্রাকৃতভাবে আসিয়া আপনার হস্তগত হইতেছে। তখন আপনি সেই জিনিষটী আপনার অভীষ্ট বস্তুকে প্রদান করিয়া চরিতার্থ হইবেন। গাছে ফুল নাই, দেখিবেন আপনার শুদ্ধ প্রীতিময়ী বাসনার ফলে গাছে ফুল ফুটিয়াছে; নিকটে জল নাই, কোথা হইতে জল আসিবে; ঘরে খাবার নাই, ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। এইরূপ শ্রীভগবানের প্রেম-সেবায় ঐশ্বর্য্যকে প্রেমের চিরানুকূল দেখিতে পাইবেন; কিন্তু ঐশ্বর্য্য এখানে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রেমকে খর্ব্ব করিতে পারিবে না। ভগবদ্‌বিষয়ক বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া মাত্র ইহা কে যেন অন্তরালে থাকিয়া পূর্ণ করিয়া দেন! শ্রীভগবান্‌ই এই ঐশ্বর্য্য গোপনে বিস্তার করিয়া তাঁহার প্রেমসেবার সহায়তা করিয়া উত্তরোত্তর আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া দেন। আবার দেখুন, যেখানে ঐশ্বর্য্যের জন্য ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান করা হয়, সেখানে ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করা ও রক্ষণ করা কত ক্লেশ-কর! সেখানে প্রেম ত দূরের কথা, আনন্দের লেশমাত্র নাই,—কেবল জ্বালা। শ্রীবৃন্দাবনধামে নিত্যই যে এই মাধুর্য্যের খেলা হইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন, ব্রজগোপগোপীগণ কংস ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত থাকিতেন। কংস-প্রেরিত অসুরগণ অনায়াসেই নিহত হইত। ইহা যে শ্রীকৃষ্ণ কোন বীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া করিতেন, তাহা নহে। যশোদানন্দন নন্দের দুলাল

বনমালী শ্রীকৃষ্ণ, যে প্রেমের মূর্ত্তি, সেই প্রেমের মূর্ত্তিই থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি সেখানে অন্য মূর্ত্তি ধরিতেন, তবে গোপগোপীদের প্রেমের থর্ব্বতা হইয়া যাইত, তাঁহাদের হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিত। তাই, ঐশ্বর্য্য সেখানে লুক্কায়িত থাকিয়া কার্য্য করিত। আবার দেখুন, গোপগোপিকারা সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমের ঠাকুরকে কিছু খাওয়াইতে পরাইতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহা মিলিয়া যাইত। রাসলীলার বর্ণনা যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণের কি অপার ঐশ্বর্য্যের লীলা বিস্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু গোপগোপীদের প্রেম-প্রবণ হৃদয় বৃন্দাবনের কোন ঐশ্বর্য্য দ্বারাই বিক্ষুব্ধ হইত না। ঐশ্বর্য্য প্রেমের অনুগত থাকিয়া ইহার সহায়তা সাধনে তৎপর থাকিত। এই বৃন্দাবনের প্রেমরসই নবদ্বীপধামে আরো সহজ ও উজ্জ্বলতর করিয়া প্রকাশ করা হইল। শচীমা নিমাইকে ভালবাসেন; শুধু নিমাইকে কেন, নিমাইএর সঙ্গী, তাঁহার শিষ্য, দেশদেশান্তর হইতে যে সকল ব্যক্তি নিমাইকে দর্শন করিতে আসেন, তাঁহারা এবং যিনিই শচীমা'র কাছে আসিতেন, তিনিই, শচীমার প্রীতির ভাজন ছিলেন। আপনারা দেখিবেন, যিনি শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসেন, তিনি জগৎকেই ভালবাসেন। তাঁহার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ, সংকীর্ণতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। যিনি জড়ভাবাপন্ন মানুষকে ভালবাসেন, তিনি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁহার হৃদয় মায়ায় মুগ্ধ। শচীমা নিমাইকেও ভালবাসিতেন, বিশ্ববাসী জনগণ সকলকেই ভালবাসিতেন। শচীমা'র এই প্রেম স্বাভাবিক ছিল। তিনি হিসাব কিতাব করিয়া ভালবাসিতেন না। জ্ঞানের বিচার করিয়া দেখিতেন না যে, যেহেতু সকল জীবই শ্রীভগবানের, সুতরাং সকলকেই প্রীতির চক্ষে দেখিতে হইবে। প্রেমে তাঁহার হৃদয় ভরপুর ছিল, বিচার করার অবসরও ছিল না। ইহার কারণ একমাত্র

শ্রীনিমাইচাঁদ। নিমাইকে ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই সমগ্র জগৎ তাঁহার প্রীতির সামগ্রী। সমস্ত বিশ্ব তিনি মধুময় দেখিতেন—ইহা তাঁহার স্বভাব। এখন বুঝুন, শ্রীনিমাইচাঁদ বস্তুটী কি! যাঁহারা আজকাল প্রেমের কথা বলেন, প্রেম দ্বারা জগতে শান্তিস্থাপন করার কথা বলেন, তাঁহারা একবার নদীয়াধামে শচীর আলয়ের দৃশ্য অবলোকন করুন, এই প্রেমকে আদর্শ করিয়া জগতে প্রেম বিস্তার করিতে প্রয়াসী হউন। যিনি যে ভাবে পারেন, নিমাইচাঁদকে ভালবাসুন, দেখিবেন জগৎ ধন্য হইয়া যাইবে। কারণ, নিমাইচাঁদ অনন্ত ভালবাসার কেন্দ্র, অনন্ত প্রেমের উৎস, ইঁহাকে ভালবাসিতে পারিলে আর বিচার করিয়া জগৎকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিতে হইবে না। অনন্তপ্রেম-নিলয় শ্রীগৌরচন্দ্রের সংসর্গে থাকিয়া ভালবাসা আপনাদের স্বভাব হইয়া যাইবে। যে প্রেমের জন্য মানুষ কত কথা বলে, কত যুক্তিতর্ক করে, শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা কত বুঝাইতে চেষ্টা করে, সেই প্রেম যদি আপনার স্বাভাবিক হইয়া যায়, তখন আর আপনার চাই কি? আপনার আর আনন্দের অবধি থাকিবে না।

যাহা হউক, শচীমা সকলকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু তিনি দরিদ্র। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে বাৎসল্য প্রেম ও ইহার বিষয় শ্রীনিমাইচাঁদ। সুতরাং তাঁহার অর্থের অনটন থাকিবে কেন? সহজ কথায়ও আমরা বুঝিতে পারি যে, পরম অর্থ বলিতে প্রেম বুঝায়; যাঁহার এই অর্থ প্রাপ্তি হইয়াছে, অন্যান্য অর্থ তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিবে। শচীমা এই প্রেম-সম্পত্তিতে ধনশালিনী, তাঁহার আবার অভাব কিসের? তবে যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আগমনের পূর্ব্বে শচীমাকে নিমাইয়ের নিকট দুই একবার অভাবের কথা বলিতে হইয়াছিল এবং শ্রীমতী আসিলে পর আর তাঁহার একবারেই অভাব বোধ হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, শ্রীমতীর আগমনে শচীমা'র বাৎসল্য প্রেম আরও পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তখন তাঁহার বাৎসল্য প্রে

পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইয়াছিল। কাজেই তাঁহার হৃদয়ে অভাববোধের স্থানও ছিল না, আর পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে যে, শ্রীলক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদাই শ্রীমতীর অনুগামিনী থাকিয়া অলক্ষ্যে গৃহখানি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে পূর্ণ রাখিতেন, এবং প্রেমের পরিপোষণের জন্য যে ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন, তাহা যোগাড় করিতেন, এবং লক্ষ্মীদেবীও প্রেমের সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন।

নিমাইয়ের কথা বলি কেন! ঐশ্বর্য্য যে মাধুর্য্যের পূর্ণ অনুগত, তাহা ভক্তের জীবনীতেই আমরা দেখিতে পাই। এখনও অনেক ভক্ত স্বীয় জীবনে ইহা উপলব্ধি করিতেছেন। ভক্তপ্রধান শ্রীবাস পণ্ডিতের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, দেখিবেন, তিনি কোন কার্য্য করিতেন না, কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতেন না, আর, করিবার তাঁহার অবসরও ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই নিমাইয়ের প্রেমে বিভোর থাকিতেন। তিনি আবার একাকী নহেন। তাঁহারা চারি ভাই। সকলের পত্নী আছেন। সন্তানাদিও আছেন। দাস দাসী আছে। দাস দাসী নিজের সেবার জন্য নহে,—প্রভুর সেবার জন্য। তিনি ভাবিতেন, তিনি প্রভুর সেবাই করিতেছেন এবং সেই সেবার বিনিময়ে প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে বেতন স্বরূপ পরমপুরুষার্থ প্রেম দিতেছেন, সুতরাং পার্থিব অর্থের জন্য তিনি আবার আর কাহার সেবা করিতে যাইবেন! এই ভাবিয়া প্রেম পাইয়া তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতেন, অথচ কি এক অপ্রাকৃতভাবে তাঁহার সংসারযাত্রা অতি অনায়াসে সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। তাঁহার বাড়ীতে বহু ভক্তও প্রসাদ পাইতেন। ইহা কোথা হইতে হইত? যেখানেই প্রেমের বিকাশ, সেইখানেই লক্ষ্মী দেবী অন্তরালে থাকিয়া কার্য্য করেন। শ্রীবাসের এই ভাব দেখিয়া শ্রীপ্রভু একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও যদি অন্নাভাব হয়, তথাপি শ্রীবাসের

গৃহে কখনও অন্নকষ্ট হইবে না। ইহার অর্থ এই, যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের জন্যই ঐশ্বর্য্যের সেবা করেন, তাঁহাদের অভাব বোধ হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু যাঁহারা প্রেমের সেবা করেন, সকল ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের করতলগত। এই প্রেমের খেলা দেখাইবার জন্যই শ্রীগৌরচন্দ্র ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন।

যাহাহউক, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে শিষ্যগণ লইয়া অধ্যাপনা কার্য্যে বিব্রত থাকিতেন, তাহার কারণ অর্থোপার্জ্জন করা নহে; ইহার অন্য অনেক কারণ ছিল। প্রথম কারণ এই যে, তিনি যখন যে কার্য্যটী ধরিতেন, তখন তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিয়া দেখাইতেন যে, কোন কার্য্য করিতে হইলে তাহা কিরূপ সুষ্ঠু করিয়া সম্পাদন করিতে হয়। দ্বিতীয় কারণ এই এবং ইহাই সর্ব্ব প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয় যে, তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজে আচরণ করিয়া মানবগণকে দেখাইলেন যে, স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ভগবদ্ভক্তি; এই ভক্তির ক্রমোৎকর্ষেই প্রেম প্রাপ্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। কারণ উহা ভয়াবহ। তিনি আবার বলিলেন, সম্যকৃরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইলেও স্বধর্ম্ম শ্রেয়স্কর। এই বলিয়া তিনি অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন যে, তিনি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হইলেও ভাল, জয়লাভ হইলেও ভাল। এখানে স্বধর্ম্ম বলিতে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝাইতেছে। আবার গৌর-লীলাতেও শ্রীপ্রভু রামানন্দের মুখ দিয়া বলাইলেন যে, স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়, অর্থাৎ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেই শ্রীভগবানে জীবের ভক্তি হয়; ইহাই ভক্তির প্রথম স্তর। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিতে, যিনি যে কার্য্য সংসারে বাছিয়া লইয়াছেন, তাহা এবং সংসারে থাকিলে তাহার আনুষঙ্গিক কর্ম্মই বুঝায়। সমগ্র জগতের কর্ম্ম লইয়াই শ্রীভগবানের কর্ম্ম। সকল

কর্ম্মই যখন শ্রীভগবানের, এবং কোন একটী কর্ম্ম না করিলেই যখন কর্ম্ম-সমষ্টি পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তখন কোন কর্ম্মই সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিতে হইবে না। রুচি অনুসারে যিনি যে কর্ম্ম বাছিয়া লইয়াছেন, অথবা যাঁহার উপর যে কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাঁহাকে তাহা সম্যকরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং ইহার ফলেই শ্রীভগবৎ ভক্তি ও প্রেমলাভ হইবে। অজ্ঞলোকে মনে করে যে, তাহারা কর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে এবং তদ্দ্বারা নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ করে। কর্ম্মের বেতন পুরস্কারস্বরূপ তাহারা অর্থ পায় এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে ও সন্তুষ্ট থাকে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহারা মনে করে যে, কাহাকেও কিছু দান করিলে, কিম্বা উদর পুরিয়া খাওয়াইলে, অথবা ব্রতাদি কোন কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার প্রতিদানস্বরূপ কিছু পাওয়া যাইবে, এইখানেই ধর্ম্ম পর্য্যবসিত হইয়া গেল। তাহাদের ধারণা, তাহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার জন্য যে কর্ম্ম করে, ধর্ম্ম ইহা ছাড়া আর একটা কিছু। কিন্তু এ ধারণা মায়ামূলক। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অধ্যাপনারূপ কর্ম্ম করিলেন এবং এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তিনি স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন যে, কিছুকাল পরেই তাহার এ কর্ম্ম ফুরাইয়া গেল; এবং ভক্তভাবে তিনি দেখাইলেন যে, এই কর্ম্মের পরিসমাপ্তিতে তিনি ভক্তির অধিকারী হইলেন। কর্ম্মের ফল লৌকিক অর্থ নহে। আপনি কর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন এবং পরিবার প্রতিপালন করেন, ইহা আপনার ভুল বিশ্বাস। কর্ম্ম করা আপনার স্বভাব। আপনার প্রকৃতিতেই আপনাকে কর্ম্ম করাইতেছে। আপনারই রুচি অনুসারেই আপনি কর্ম্ম করিতেছেন। আপনার যদি অর্থোপার্জ্জন নাও হয়, কিম্বা প্রচুর অর্থোপার্জ্জনও হয়, তথাপি আপনি স্বীয় স্বভাববশতঃ কর্ম্ম না করিয়া পারিবেন না। আপনি স্বভাববশতঃ

কর্ম্ম করিতেছেন, আর শ্রীভগবান্ আপনার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতেছেন, এবং অন্যান্য অভাবমোচন করিতেছেন; তাহা ছাড়াও তিনি কৃপা করিয়া আপনার সুখ-সাধনার্থ আপনাকে স্ত্রী, পুত্র এবং অন্যান্য আপ্তবর্গ পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়া তাঁহাদেরও ভরণপোষণ করিতেছেন। আপনি কাহারও ভরণপোষণ করেন, এ কথা হয় না। কারণ, আপনি যখন দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তখন কি আপনার পরিবারবর্গের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইবে না। আপনার চোখের সাম্‌নেইত কত শত দৃষ্টান্ত দেখিতেছেন যে, শ্রীভগবান্ সকলের ভরণপোষণ করিতেছেন। অবশ্য আপনি নিমিত্ত মাত্র হইতে পারেন। তাহাতেই আপনি কর্ত্তা হইলেন না। এখন দেখুন, আপনার আচরিত কর্ম্মটী কি? আপনি যে কর্ম্ম করিতেছেন, ইহা শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াই করিতেছেন। ইহাই ভগবৎ কর্ম্ম। যদি তাহাই হইল, তবে ধর্ম্মের জন্য আপনার আর পৃথক্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। এই কর্ম্মই আপনাকে ভক্তি ও প্রেম আনয়ন করিয়া দিবে। তবে আপনি শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন, ইহা আপনার ধারণা করিতে হইবে। কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের অর্থ নাই, সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত থাকা বশতঃ তাঁহারা নির্জ্জনে বসিয়া অথবা সংসার ছাড়িয়া যাইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারেন না। কিন্তু এটী তাঁহাদের ভুল। সংসার ছাড়িয়া গেলেই ধর্ম্ম হয় না। বৃক্ষতলে গেলেও মনের মধ্যে সংসার স্থান পাইতে পারে। ভগবান্ ত সর্ব্বত্রেই আছেন। তাঁহাদের জন্য আবার যাইতে হইবে কোথায়? এই সংসারটীও ত তিনি দিয়াছেন। ইহার উপর বিরক্তি প্রকাশ করা ভক্তজনোচিত কার্য্য নহে। তবে সংসারটি মায়াপ্রসূত। শ্রীভগবান্ চিদানন্দময়;— মায়া তাঁহা হইতেই আসিয়াছে বটে। আমাদেরও চিদানন্দময় হইতে

হইবে। সুতরাং শ্রীভগবানের দিকে মতি রাখিয়া, তাঁহার সংসার মনে করিয়া কার্য্য করিলে সংসার আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে না; আমরাই সংসারের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিব। তখন সংসার প্রতিকূল না হইয়া ভগবৎ ভজনে অনুকূল হইবে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আর, নিজের ও পরিজনবর্গের প্রতিপালন উপযোগী অর্থ পাইলেই যে নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীভগবানের নাম গুণ লীলাদি আস্বাদন করিতে সমর্থ হওয়া যাইবে, তাহার বিশ্বাস কি? উহাতে আরও অর্থস্পৃহা বাড়িয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কর্ম্ম করা মায়াবদ্ধ জীবের স্বভাব। কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে, শ্রীভগবানের দাস বোধে, কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু নহে। অর্থ হইলেই যে নির্জ্জনে বসিয়া হরিনাম করা যায় না, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত আপনারা চক্ষের উপর দেখিতেছেন। আমি একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ত্রিপুরা জেলায় একজন পরম ভাগবত আছেন; তিনি সর্ব্বদাই শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহার বাড়ীতে বহু স্থান হইতে বহুভক্ত আসিয়া মিলিত হন। এক দিন একটী ভদ্রলোক তাঁহার নিকট দুঃখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার অর্থ আছে, সুতরাং তিনি প্রাণ খুলিয়া মনের আনন্দে হরিনাম করিতে পারেন; কিন্তু সেই ভদ্রলোকের অর্থের জন্য ইতস্ততঃ ঘুরিতে হয়, নানাবিধ চিন্তা করিতে হয়, তাই তিনি ভগবদ্‌চিন্তা করিতে পারেন না। ইহার উত্তরে সাধু বলিলেন, "আচ্ছা, আপনার সেজন্য চিন্তা কি? অর্থ সমাগম হইলেই যদি আপনি ভগবদ্‌চিন্তা করিতে পারেন, তবে আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি যে, আপনার পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা আমি মাসে মাসে দিব। আপনি ভগবদ্ধ্যানে বিনিযুক্ত হউন।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি ইহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না, কারণ তাঁহার মন বিষয় সংলিপ্ত। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে এবং বিচার

করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, কর্ম্ম করা মানুষের স্বভাব। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, কর্ম্ম না করিলে দেহযাত্রাও সম্পাদিত হইতে পারে না। দেহধারী মানবের কর্ম্ম করিতেই হইবে। তবে শ্রীভগবানে এই কর্ম্ম অর্পিত হইলেই কর্ম্ম ধর্ম্ম হইয়া যায়। ইহা ছাড়া আর পৃথক্ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হইবে না। এই কর্ম্মের পরিপক্কাবস্থাই ভক্তি ও প্রেম। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অধ্যাপনারূপ কর্ম্ম করিয়া জীবকে এই শিক্ষা প্রদান করিলেন। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ পরিপূর্ণ আদর্শ। মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর্শ করিয়া জীবন পথে চলিতে হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গের অধ্যাপনারূপ কর্ম্ম করার আর একটী হেতু এই যে, তিনি বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া, সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়া ও পড়াইয়া দেখাইলেন যে, সমস্ত বিদ্যার সার শ্রীভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান এবং জ্ঞানের পরিণতি ভক্তি ও প্রেম। তিনি দেখাইলেন যে, সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিলে তাহার ফলস্বরূপ প্রেমামৃতরসই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহাই জীবের নিত্য উপভোগ্য। তাঁহার পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন—জ্ঞানের জন্য নহে; জয় পরাজয়ের জন্য তর্ক করিতেন,—মীমাংসার জন্য নহে। তিনি দেখাইলেন, ফল হইলে যেরূপ পুষ্প আপন হইতেই ঝরিয়া পড়িয়া যায়, সেইরূপ শাস্ত্রাধ্যয়নের ফল প্রেম প্রাপ্ত হইলে আর শাস্ত্রের আবশ্যকতা থাকে না। ইহা তিনিও দেখাইয়াছেন এবং ভক্তগণের জীবনীতেও ইহা প্রতিফলিত করিয়াছেন। রূপসনাতন অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা যখন বৃন্দাবনে বৃক্ষতলবাসী হইয়া শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া জগতে প্রেমামৃতরস বিতরণ করিতেছিলেন এবং ভজনানন্দে বিভোর ছিলেন, তখন এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া জয়পত্রী প্রাপ্তির আশায় বিচার করিতে চাহিলে গোস্বামীদ্বয় দ্বিরুক্তি না করিয়া হেলায় জয়পত্রী লিখিয়া দিলেন।

জগতের অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পণ্ডিত সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীর শিরোমণি সরস্বতী প্রকাশানন্দ পবিত্র কাশীধামে বসিয়া যখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি সন্ন্যাসীর নেতৃত্ব ছাড়িয়া দিয়া, বিদ্যার অভিমান ভুলিয়া গিয়া, প্রেম-নিকেতন শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইয়া ভজনানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে অধ্যাপকরূপে বিহার করিতেন, তাহার আর একটী কারণ আছে। তাঁহার প্রকাশের পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ বড় দাম্ভিক ছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের লোকগণ স্ব স্ব জাতি ও কুলমর্য্যাদার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া অভিমানে স্ফীত থাকিতেন। বংশগত মর্য্যাদা অনুসারে উচ্চ নীচ বিচার করা হইত এবং এই হিসাবে যাঁহারা উচ্চ, তাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে ঘৃণা করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলীর অগ্রগণ্য হইয়া, ইহার পরেই আবার শ্রীভগবৎপ্রেমে বিহ্বল অবস্থায় সর্ব্বজীবে সমভাবে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া দেখাইলেন, শ্রীভগবানের কাছে জাতিকুলের বিচার নাই, পণ্ডিত মূর্খের তারতম্য নাই, মনিব-চাকরের প্রভেদ নাই, যাঁহাব ভক্তি আছে, তিনিই সকলের নমস্য। এই যে এত বড় নিমাই পণ্ডিত, তিনিই আবার অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়া দাস্যভাবে ভক্তের সেবা করিয়াছেন। কোন ভক্তের ফুল তুলিয়া দিয়াছেন, কাহারও কাপড় কাচিয়া দিয়াছেন কাহারও চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাহার চরণধূলি লইয়াছেন। তিনি এত বড় পণ্ডিত হইয়া শেষে অতি দীনহীনভাবে যার তার কাছে কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা চাহিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি দেখাইলেন যে, কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন বা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বা উচ্চবংশজাত হইলেই যে সে শ্রীভগবদ্‌ভজনে অধিকারী হইবে এবং অন্যের ইহাতে অধিকার থাকিবে না, তাহা নহে। উচ্চারণ শুদ্ধ করিয়া সংস্কৃত মন্ত্র বলিতে

পারিলেই যে শ্রীভগবানের উপর তাহার বেশী দাবী থাকিবে, অন্যের তাঁহাকে পাইতে অধিকার থাকিবে না, তাহা নহে। পণ্ডিতই হউন, আর মূর্খই হউন, ভক্তি ও প্রেম দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে পাইতে সকলেই সমান অধিকারী। যিনিই শ্রীভগবদ্ভক্ত, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই বুদ্ধিমান্। এই ভক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে, অথবা প্রাণে যে স্বাভাবিক ভক্তি আছে তাহা উদ্‌বুদ্ধ করিয়া কর্ষণ করিতে হইলে যে শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করা সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। বিদ্বান্ হইলেই যে ভক্তিমান্ হইতে পারিবে, অন্য কেহ ভক্তিলাভ করিতে পারিবে না, এ কথা ভুল। তাহা হইলে তিনি এত বড় বিদ্বান্ হইয়া দানাতিদীনভাবে অন্যের নিকট ভক্তি যাচ্ঞা করিবেন কেন? তিনি নিজেই সকল জীবের জন্য শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া প্রেমামৃতরস রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ভক্তি জীবের স্বাভাবিক। ইহা খুঁজিয়া আনিতে হইবে না বা শাস্ত্রে অন্বেষণ করিতে হইবে না। শ্রীভগবান্‌কে বলিলেই হইল, "প্রভু, আমি তোমার দাস।" স্বভাবতঃই জীব শ্রীভগবানের দাস। কিন্তু মায়ার অধীন হইয়া ইহ সে ভুলিয়া গিয়াছে। ঐরূপ বলিতে বলিতে জীবের দাস্যভাব জাগ্রত হইবে। তখন সে কি বস্তু এবং শ্রীভগবান্ কি বস্তু তাহা সে বুঝিতে পারিবে এবং তার পরই ভক্তি ও প্রেমজনিত আনন্দরসের আস্বাদন হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে বহু কথার অবতারণা করা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি একটী মহান্ পরম শিক্ষাপ্রদ ভাব গ্রহণ করিতে না পারিলে তাঁহার অন্তঃপুরলীলা আস্বাদনে অধিকার হইবে না। ইহা সাধারণ নায়ক-নায়িকার ক্রীড়ার মত বোধ হইবে। একটু স্থিরচিত্তে অবধারণ করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন, তাঁহার প্রতি কার্য্যে প্রতি লীলার মধ্যে কত ভাব-গাম্ভীর্য্য রহিয়াছে। তাঁহার যে লীলার দিকেই দৃষ্টিপাত করিবেন, দেখিবেন যে, উহাতে অনন্ত ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হইতেছে, ক্ষুদ্র মানব তাহা আর কত

পরিমাণ করিতে সমর্থ হইবে; যাঁহার যেরূপ অধিকার বা সামর্থ্য, তিনি তাহা হইতে ততটুকু গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়া যাইবেন।

যাহা হউক, প্রভু শিষ্যগণ লইয়া অধ্যাপনা কার্য্যে এতই ব্যস্ত থাকিতেন যে, বাড়ীতে শ্রীমতীকে লইয়া একটু নিভৃতে বসিবেন তাহার বড় একটা অবসর পাইতেন না। দিনের বেলায় আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিতেন, আবার পড়াইতে যাইতেন। রাত্রিতেও প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পড়াইতেন। তবে শচীমাতার অনুরোধে কখন কখন ইহার পূর্ব্বেও আসিতেন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে যে দিন অনধ্যায় থাকিত, সেইদিন তিনি অবসর পাইতেন। আজকাল যেরূপ সপ্তাহে রবিবার ছুটি থাকে এবং পর্ব্বে পর্ব্বেও ছুটি থাকে, হিন্দুদেরও সেইরূপ একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি, অষ্টমী, পঞ্চমী, ত্রয়োদশী তিথির রাত্রি এবং চৈত্র, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও অন্যান্য বিষয়কর্ম্ম করা নিষিদ্ধ; কারণ, এই সকল তিথিতে শ্রীভগবচ্চিন্তা করা বিধেয়। ভগবচ্চিন্তা করা প্রত্যহই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া এই সকল তিথির কথা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি সর্ব্বদা তাঁহাকে ভাবিতে না পারিবেন, তিনি অন্ততঃ পক্ষে এই কয়দিন শ্রীভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে কর্ত্তন করিবেন এবং ইহা করিতে করিতে অভ্যাস ও ভগবানের নামগুণগানে আকর্ষণ হইলে, তখন আর তাঁহার তিথিবিচার থাকিবে না। এই সম্বন্ধে এখানে একটী মহাপুরুষের কথা বলিতেছি। শ্রীজীব গোস্বামী নামে একজন বৈষ্ণব গোস্বামী ছিলেন। ইনি রূপসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। বৃন্দাবনে থাকিতেন। ইহার পাণ্ডিত্যের কথা বেশী পরিচয় দিতে হইবে না, কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইনি সকল দর্শনশাস্ত্রের সার, জগতে সর্ব্বোত্তম দর্শনশাস্ত্র ষট্সন্দর্ভ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি আরো অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া

গিয়াছেন। এই অশেষ-শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতটী বৃক্ষতলবাসী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ভজনানন্দে বিভোর থাকিতেন। পূর্ব্বে যে রূপসনাতনের সঙ্গে একটী পণ্ডিতের বিচারের কথা বলা হইয়াছে, সেই পণ্ডিতটীই রূপ সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্রী লইয়া আসিয়া শ্রীজীবের নিকট আসিলেন। শুনিয়াছেন তাঁহারও অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি ভাবিয়াছেন, রূপসনাতন পরাজয়ের ভয়ে ভীত হইয়াই বিচার না করিয়াই জয়পত্রী দিয়াছেন, এখন যদি শ্রীজীবকে জয় করিতে পারেন, তবে বৃন্দাবনের পণ্ডিতগণকে তাঁহার জয় করা হয় এবং তাহা হইলেই পশ্চিম ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, কারণ তখন বৃন্দাবনের এই অঞ্চলে রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব এই তিনজন গৌরভক্তই পাণ্ডিত্যে সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন; পণ্ডিতটী যখন শ্রীজীবের নিকট আগমন করিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, শ্রীজীব তখন যমুনায় স্নান করিতেছিলেন। তিনি আসিয়া জীবের নিকট বলিলেন, তিনি রূপসনাতনকে বিচারে পরাজয় করিয়া আসিয়াছেন এবং এখন তাঁহার সঙ্গে বিচারপ্রার্থী হইতেছেন। এই বলিয়া তিনি জয়পত্রী দেখাইলেন। শ্রীজীবেরও জয় পরাজয়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; কিন্তু রূপসনাতন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত—সেই জন্য নহে, কারণ তাঁহাদের তখন লৌকিক সম্বন্ধ চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা এখন শ্রীগৌরাঙ্গের সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; শ্রীজীব দেখিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভুবনবিদিত পরমপণ্ডিত, ভাগবতোত্তম, শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় নিজজন, তাঁহাদের প্রতিভা অসীম, পণ্ডিতটী তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রূপসনাতন যে বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া জয় পরাজয় উপেক্ষা করিয়া পণ্ডিতটীর জয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে জয়পত্রী দিয়াছেন, পণ্ডিত তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ইহাতে পণ্ডিতের আরও গর্ব্ব হইয়াছে। এই গর্ব্বই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির

পক্ষে অন্তরায়। পণ্ডিতটীর প্রতি শ্রীজীবের কৃপা হইল। বৈষ্ণবের অশেষ কৃপা। শ্রীজীব বিনয়সহকারে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমার সহিত বিচার করিতে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভুদ্বয় আমারই জ্যেষ্ঠতাত। তাঁহাদের নিকটই আমার শিক্ষা দীক্ষা। আমার সহিত বিচার করিলেই আপনি তাঁহাদের জ্ঞানের গভীরতা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা বৈষ্ণবোচিত দীনতা বশতঃই আপনার সহিত তর্ক করিতে বিরত হইয়াছেন। তাঁহারা ভজনানন্দে বিভোর। অথচ পরমোজ্জ্বল বৈষ্ণবধর্ম্মের জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের গাম্ভীর্য্য বিস্তার করা প্রয়োজন, তাই বোধ হয় তাঁহারা কৃপা করিয়া আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং বিচারের ভার আমার উপর দিয়াছেন। তবে আসুন, তাঁহাদের শক্তিতেই শক্তিমান্ হইয়া আমি বিচার করিতেছি।" এই কথা বলিতেই পণ্ডিতটী প্রথম তর্ক উঠাইলেন, "এখন সন্ধ্যাকালে আপনি সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া কিরূপে তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন? ইহাতে কি আপনার প্রত্যবায় হইবে না?" ইহা বলিতেই শ্রীজীব বিনয়মধুর বচনে বলিলেন, আপনি জানেন, অশৌচ হইলে সন্ধ্যা করা নিষেধ। আমার সম্প্রতি দুইটী অশৌচ হইয়াছে। একটী মৃতাশৌচ ও অন্যটী জাতাশৌচ। শ্রীল রূপ ও সনাতন গোস্বামী মহোদয়দ্বয়ের কৃপায় আমি শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আশ্রয় পাইয়াছি; তাহাতে আমার মায়ানাম্নী মাতার মৃত্যু হইয়াছে ও ভক্তি নাম্নী একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা জন্মিয়াছে; এরূপ অবস্থায় কিরূপে সন্ধ্যা আহ্নিক করিত বলুন দেখি! আরো দেখুন, গোস্বামী মহাশয়দ্বয়ের কৃপায় আমি আলোক ও অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সন্নিধানে অবস্থান করিতেছি, সুতরাং আমি দিবা রাত্রির সন্ধিস্থলও অবলোকন করি না. তাই

আমার সন্ধ্যার কথাও মনে আসে না। ইহা বলিয়াই পরম পণ্ডিত শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, মায়াবস্তুটী কি, শ্রীভগবানের স্বরূপ কি, শ্রীভগবানের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, এই সকল বিষয় অতি সুন্দররূপে সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তার্কিক পণ্ডিতটীর আর তর্কস্পৃহা রহিল না। তিনি জানিবার জন্য ক্রমেই উৎসুক হইয়া পূর্ব্বপক্ষ করিতে লাগিলেন, এবং শ্রীজীব একে একে সমস্ত উত্তর দিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন—শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, প্রেম জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ, এই প্রেম দ্বারা শ্রীভগবানের ভজনা করিতে হয়। এই প্রেম শিখাইবার জন্য শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর স্বয়ং জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিই কলিকালে জীবের একমাত্র উপাস্য। এই প্রেমের স্রোতে বিধির বন্ধন ছুটিয়া যায়, আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম ভাসিয়া যায়। সেই বিচারপ্রার্থী পণ্ডিতটী নিরস্ত হইলেন। শুধু নিরস্ত হইলেন তাহা নহে, তিনি সেই মুহূর্ত্তে শ্রীজীবের চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া বিক্রীত হইলেন। শ্রীজীবের নিকট হইতে তিনি গৌরপ্রেম পাইয়া ধন্য হইয়া গেলেন।

উপরি বর্ণিত ঘটনা হইতে আমরা দেখিতে পাই, জীব কোন্ স্তরে থাকিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদির নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ সময় নিরূপিত করে এবং কোন্ কোন স্তরে উন্নীত হইলে, ইহার আর কালাকালের অপেক্ষা করে না। মানবের পরিপূর্ণ আদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভুও লোকশিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার অধ্যাপনারূপ কর্ম্মজীবনে অনধ্যায় তিথিসমূহ শাস্ত্রানুরূপ মানিয়া চলিতেন। এই দিনে তিনি পড়াইতেন না। সুতরাং বাড়ীতে থাকিয়া মায়ের সঙ্গে শ্রীমতীর সঙ্গে এবং অন্যান্য পরিজনবর্গের সঙ্গে পারিবারিক সুখ আস্বাদন করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার বাড়ীতে বহুলোক সমাগত হইত। ইঁহারা সকলে শচীমার বাড়ীতে প্রসাদ পাইতেন বটে, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ তাঁহাদের অন্যত্র বিশ্রাম ও শয়নের বন্দোবস্ত করিতে হইত।

মহাপ্রভুর বাটীতে পশ্চিমের ভিটিতে একখানি ঘর ছিল, ইহার দক্ষিণের প্রকোষ্ঠে প্রভু শয়ন করিতেন। এই শয়নকক্ষের দক্ষিণদিকে একটী দরজা ও দুইটী জানালা ছিল এবং পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুই দিকে দুইটী জানালা ছিল। শয়নকক্ষের সঙ্গেই দক্ষিণদিকে একটী মাধবীকুঞ্জ। এইখানে শ্রীমতী অনেক সময় বিকালবেলা সখীগণ লইয়া বসিতেন এবং প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেন। এই ঘরের উত্তরদিকে যে একটী কক্ষ ছিল, এই কক্ষে শচীমা সময় সময় থাকিতেন; কিন্তু তিনি প্রায়ই দক্ষিণের ভিটীর ঘরে শয়ন করিতেন। উত্তরের ভিটীতে বিষ্ণুর মন্দির ছিল। এই বিষ্ণুর মন্দিরের পশ্চিমদিকে এবং প্রভুর শয়ন মন্দিরের উত্তরদিকে তুলসী কানন ছিল। পূর্ব্বের ভিটীতে যে একখানি ঘর ছিল, তাহাতে শ্রীপ্রভুর ভৃত্য ঈশান থাকিতেন। দক্ষিণের ঘরের পূর্ব্বদিকেও একটী তুলসীকানন ছিল। প্রভুর শয়নমন্দিরের দক্ষিণপশ্চিম কোণে এবং শচীমার ঘরের পশ্চিম দিকে মাধবীকুঞ্জের পশ্চিমদিকে রন্ধন হইত এবং প্রভু অনেক সময় এই রন্ধনশালার পূর্ব্বপ্রকোষ্ঠে বসিয়া ভোজন করিতেন। বাড়ীখানি বিবিধপুষ্পে শোভিত ছিল। যে দিন প্রভুর পড়াইতে হইত না, সেই দিন তিনি বাড়ীতে থাকিয়া প্রকৃতির সুষমা নিরীক্ষণ করিতেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে দিন অনধ্যায় তিথি থাকিত, সেই দিন শ্রীপ্রভু বাড়ীতে থাকিয়া পারিবারিক সুখ আস্বাদন করিতেন। এই সুখে আবিলতা নাই। ইহা মায়িক জগতের সুখ নহে। আপনারা মনে রাখিবেন, চিন্ময় বস্তুর সকলই চিন্ময়। পরিপূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মায়ামানুষরূপে লীলা করিয়া দেখাইলেন, কি ভাবে কি আদর্শ লইয়া মানবজীবন গঠিত হইলে মানুষ মায়ার পরপারে যাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়। তিনি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, এবং মাতা শচীদেবী এবং পরিজনবর্গকে লইয়া বসিতেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও

অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ভক্তি ও প্রেমের কথা সকলকে লইয়া আস্বাদন করিতেন।

কোন দিন শ্রীপ্রভু শ্রীমতীকে লইয়া নির্জ্জনে বসিতেন এবং সেই সময়ে উভয়ে কত বিশ্রম্ভ আলাপ করিতেন। একদিন শ্রীমতী কৌতূহলপরবশ হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাণেশ্বর, তুমি ত সকলকে বিদ্যাদান করিতেছ, সকলেই বলিয়া থাকে, তুমি অনন্তশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আমিও দেখি, দিনরাত পরিশ্রম করিয়া তুমি শিষ্যবর্গকে পড়াইয়া থাক। প্রাণনাথ, এই শাস্ত্রসমূহের সার অর্থ কি এবং শিষ্যগণকেই বা তুমি কি শিক্ষা প্রদান কর, ইহা শুনিতে আমার বড় বাসনা হইতেছে।"

শ্রীপ্রভু বলিলেন, তুমি নারী, আরো তোমার বালিকা বয়স, তুমি কি সেই সব শাস্ত্রের কঠিন মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া—আমি বালিকা হইলেও তোমারই ত ঘরণী। তুমি ত ভুবনবিদিত অদ্বিতীয় পণ্ডিত। আমি কি তোমার সেই ধনের কিছু অধিকারিণী হইতে পারি না। আরো আমি লোকমুখে শুনিয়াছি, তুমি নাকি শাস্ত্রের সকল মর্ম্ম সহজ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া বল। আমি যাহাতে বুঝি তুমি কি সেরূপ করিয়া আমাকে বলিতে পার না? নিশ্চয়ই পার। তবে আমি নারী বলিয়া আমাকে বঞ্চনা করিও না। প্রাণেশ্বর, শুনিয়াছি, শাস্ত্রজ্ঞান না হইলে নাকি ভক্তির অধিকারী হয় না। আমরা নারী বলিয়া যদি সেই অধিকারে বঞ্চিত হই, যদি আমরা উপেক্ষিত হইয়া থাকি, তবে এ নারীজন্ম কেন হইল! নারীজন্ম লইয়া ভক্তিবহির্ভূত হইয়া থাকা কি বিধির বিধান?

প্রভু—নারীর ধর্ম্ম প্রেম। ভক্তি তাঁহাদের স্বাভাবিক। তাঁহারা ভক্তিধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত বা উপেক্ষিত, এ কথা বলিতেছি না। এবং ইহা কখনো বিধির বিধান হইতে পারে না। আমার কথার উদ্দেশ্য এই,

শাস্ত্রের কঠিন কঠিন কথা অনেক সময় ভক্তির পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, দ্বিধা ও সন্দেহ আনয়ন করে। নারীগণের সহজ সরল মধুরভাব অতিশয় সুন্দর, বড়ই বিশুদ্ধ। তাঁহাদের সহজ স্বাভাবিকভাবের নিকট শাস্ত্রই উপেক্ষিত হইয়া যায়। শাস্ত্র কখনও রমণীগণের সহজভাবকে উপেক্ষা করিতে পারে না। অনেকে বলিয়া থাকেন বটে যে, শাস্ত্রজ্ঞান না জন্মিলে ভক্তির উদ্রেক হয় না, কিন্তু সে কথা সংসারলিপ্ত বহির্ম্মুখ অজ্ঞান জীবের জন্য। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে অন্তর্ম্মুখ করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। প্রেমপ্রবণ কোমল-প্রাণ নারীগণের সে উদ্দেশ্য বিনাশাস্ত্রেই যখন সাধিত হয়, তখন আর শাস্ত্রের কি প্রয়োজন?

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রিয়তম, তুমি যাহা ব'ললে, তাহা সকলই সত্য বলিয়া বুঝিলাম। তথাপি, তুমি কিরূপ পড়াও এবং ছাত্রগণকে কি শিক্ষা দেও, তাহা আমার জানিতে বাসনা হইতেছে।

শ্রীপ্রভু বলিলেন,—প্রিয়তমে, আমরা পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করি এবং বাহিরে পণ্ডিতের মত কত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করি। ইহা বড় কঠিন কার্য্য, ইহাতে হৃদয় কঠোর ও কর্কশ করে। প্রাণেশ্বরি, আমরা পুরুষ জাতি বড়ই নীরস। তোমাদের সঙ্গগুণেই প্রাণে বল পাই, কঠিন প্রাণ কোমল হয়, নীরস হৃদয় সরস হয়। মায়ের স্নেহ, তোমার ভালবাসা, তোমার সঙ্গিনীগণের অহৈতুকী প্রীতি, ইহাতে যত আনন্দ হয়, ইহার কোটি ভাগের একভাগও অধ্যাপকভাবে পাই না। তোমাদের এই ভালবাসায় আমার আর পড়াইতে সাধ হয় না, কিন্তু ছাত্রগণের ভালবাসায় আমি তাহাদিগকে আর ছাড়াইতে পারি না, আমার সাধ হয়, তোমাদের সঙ্গেই আনন্দে কালাতিপাত করি, কিন্তু তাহাদের প্রীতিতে তাহাদিগকে আর না পড়াইয়া পারি না; তাই শ্রীমায়ের যত্নে যে বিদ্যা আমার অর্জ্জন করা হইয়াছে, তাহাই তাহাদিগকে অর্পণ করি। আজ

এই অনধ্যায়ের দিনে তোমাদের সঙ্গসুখ আস্বাদনের অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছি, আজ কেন, প্রিয়তমে, আবার সেই কঠোর নীরস কথার অবতারণা করিয়া আমাকে সেই সুখ হইতে বঞ্চিত করিবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণবল্লভ, তোমার যদি ইহাতে রসভঙ্গ হয়, তবে আর তোমাকে আমি একথা জিজ্ঞাসা করিব না, তোমার যাহাতে প্রীতি হয় তাহাই কর।

এই বলিয়া শ্রীমতী স্বীয় ভুজলতা প্রাণনাথের গলদেশে অর্পণ করিয়া তাঁহার বুকে মস্তক স্থাপন করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

শ্রীপ্রভু বলিলেন—প্রিয়ে, রাগ করিও না, পাছে বা তোমার সুখ-ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে আমি ইহা বলিতে বিরত ছিলাম। তবে তোমার যখন ইহা জানিতে কৌতুহল হইয়াছে, তখন সেই কৌতূহল নিবারণার্থ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রভু বলিলেন—অধ্যাপকগণ প্রথমতঃ ব্যাকরণশাস্ত্রই অধ্যাপনা করেন, আমিও তাহাই করি। এই শাস্ত্রের প্রথমতঃ আবশ্যকতা এই যে, ইহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে ইহার সহায়তায় কাব্য পড়া সহজসাধ্য হয় এবং তদনন্তর দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি সহজে অধ্যয়ন করিয়া সকলতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ব্যাকরণশাস্ত্রে কোন রস নাই, সুতরাং ইহা পড়িতে ও পড়াইতে অনেকেরই কষ্ট হয়। এইজন্য আমি এই ব্যাকরণ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য ও অন্যান্য শাস্ত্রাদিও অধ্যাপনা করিয়া থাকি। ভাষা ব্যাকারণের অনুগামী নহে। ব্যাকরণই ভাষার অনুগামী। পূর্ব্বে ভাষার উৎপত্তি, তাহা হইতে পরে ব্যাকরণ হইয়াছে। যাহারা সহজ অবস্থায় থাকে, তাহাদের ব্যাকরণ পড়ার আবশ্যকতা নাই। কারণ, ভাষা তাহাদের স্বাভাবিক হইয়া যায়; তাহারা যাহা বলে, তাহাই মধুর, তাহাই বিশুদ্ধ এবং শাস্ত্রে যাহা ভাষায় নিবদ্ধ, তাহা তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় অনায়াসেই

বুঝিতে পারে, শ্রীভগবান্ অনন্তভাবের নিলয়। ভাষা ভাবেরই অভিব্যক্তি, সুতরাং অনন্তভাষা তাঁহা হইতেই আসিয়াছে। এই ভাষাই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধ ভগবানে নিবদ্ধ, তাঁহাদের হৃদয়ে সমস্ত ভাষাই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীব অপূর্ণ, সে পরিপূর্ণ ভগবান্ হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ লীলার নিমিত্ত মানুষকে মায়ার আবরণ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তরে স্থাপন করিয়াছেন। যাহার মন যে পরিমাণে মায়ার আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রীভগবানের বিভিন্ন ভাব ও তদনুরূপ ভাষা পরিগ্রহ করিতে সমর্থ। এই ভাষারও একটী পরিপক্কাবস্থা আছে, সেই অবস্থায় বাহিরের ভাষা নীরব হইয়া যায়। অনন্ত ভাষা ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এই ভাবের রাজ্যে পৌছাইবার জন্যই ভাষার অনুশীলন করিতে হয়, এবং ইহার ক্রমানুশীলনেই ভাবের স্ফূর্ত্তি হয়। যাঁহাদের এই ভাব স্বাভাবিক, তাঁহাদের আর ভাষার অনুশীলন করিতে হয় না। কিন্তু এতাদৃশ মানব অতিশয় বিরল। অধিকাংশ জীবই ভাষার আশ্রয় করিয়া ভাবকে গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রিয়তমে! তুমি সকলই জান। তোমাকে যে আমি বালিকা বলিয়াছিলাম, তাহা কেবল রসাশ্রয়ের নিমিত্ত। তুমি যে আমাকে রস প্রদান করিতেছ, ইহা জ্ঞানের রাজ্যের অতি উর্দ্ধে অবস্থিত। তুমি সকলই অবগত আছ। প্রিয়তমে! তুমি জান যে, বেদ হিন্দুদের প্রধান শাস্ত্র। ইহাকে শ্রুতি বলে। ইহা ভগবানের বাণী। ইহা জীবগণ কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছে বলিয়াই ইহা শ্রুতি নামে অভি-হিত। অনন্তভাবনিলয় শ্রীভগবান্ তাঁহার ভাবসমষ্টি প্রথমতঃ শব্দে অর্থাৎ ভাষায় প্রকাশ করিলেন এবং উহাই ক্রমে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র সমুত্থিত হইয়াছে এবং তাহা হইতেই ব্যাকরণের উৎপত্তি। এইজন্যই যিনি ব্যাকরণ

জানিবেন, তিনি সমস্ত শাস্ত্রেই অধিকারী হইবেন এবং ক্রমে সেই শাস্ত্রাতীত মহাভাবকে অবলম্বন করিতে পারিবেন; কিন্তু কেবল ব্যাকরণের নিমিত্ত যদি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা হয়, তবে তাহার সকল শাস্ত্রে অধিকার লাভ করা দূরে থাকুক, ব্যাকরণশাস্ত্রেও অধিকার জন্মে না। সময়ের স্রোতে পণ্ডিতগণ সারভাগ ফেলিয়া অসার বস্তুকে ধরিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা শাস্ত্রের সারমর্ম্মে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অসার ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। এইজন্য অনেকেই ব্যাকরণকে শিশুশাস্ত্র বলিয়া থাকেন। তুমি হয়ত শুনিয়া থাকিবে, এই নদীয়া নগরে কেশবকাশ্মিরী নামক একজন ভারতবিখ্যাত অদ্বিতীয় পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। দৈবক্রমে আমার সহিত যখন তাঁহার আলাপ হইল, তখন তাঁহারই রচিত গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণনাত্মক একটী শ্লোক লইয়া বিচার করিতে বলিলে, তিনি প্রথমতঃ আমাকে উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ব্যাকরণ শিশুশাস্ত্র, আমি নাকি সেই শাস্ত্র অধ্যাপনা করি, সুতরাং আমার তাঁহার সহিত বিচারের অধিকার নাই। কিন্তু অবশেষে যখন আমার একান্ত অনুরোধে তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার রচিত শ্লোকের মধ্যে বহুভ্রম, অনেক দোষ রহিয়াছে। দোষ-গুণ বিচার করা কিছুই নহে। যাহা ভক্তির বিরোধী ও ভগবদ্‌ভাবের প্রতিকূল, তাহাই দোষ; এবং যাহা ভক্তির সহায় ও ভগবদ্‌ভাবের অনুকূল, তাহাই গুণ। যাঁহার এই ভক্তি জাগ্রত হইয়াছে, যাঁহার শুদ্ধভাবের সমুদয় হইয়াছে, তিনিই এই দোষ গুণ বিচার করিতে সমর্থ। প্রিয়ে, তুমি জান গঙ্গার কি মাহাত্ম্য। শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম হইতে ইনি সমুত্থিতা। ইঁহার প্রভাবে জীবের শ্রীভগবদ্ভক্তি হয়। তিনি যখন গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, তখন তাঁহার সেই শ্লোকে ভক্তিবিরোধী কথা আমার হৃদয়ে লাগিয়া গেল।

তিনি ভাষার পাণ্ডিত্যে গর্ব্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাবের নিকট তাঁহার ভাষা অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিল। আমি যে ব্যাকরণ অধ্যাপনা করি, সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অনুশীলন ও ক্রমেই ভাবের পরিবর্দ্ধন হয়। প্রিয়ে! আর এক কথা, এই যে, অনন্তভাবে অনন্তশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, মানুষ বিভিন্ন ভাবে এই সকল পড়িয়া ইহার কূলকিনারা পায় না। তাই, পণ্ডিতসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, এক একজনে এক এক শাস্ত্র পড়িয়া তাহাতে সুপণ্ডিত হয়, এবং স্বীয় শাস্ত্রমর্ম্ম সঙ্কীর্ণ-গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া ব্যাখ্যা করিয়া অন্য শাস্ত্র খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হয়, ও স্ব স্ব প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে তৎপর হয়। ইহার ফলে তর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, মানুষের জিগীষাবৃত্তি বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে পরম সুখদ প্রেম সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আর একটী কুফল দাঁড়াইয়াছে যে, যাঁহারা তর্কপরায়ণ নহেন ও শাস্ত্রের কূট অর্থ করিতে পারেন না, যাঁহারা সরল সহজভাবে শ্রীভগবানের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি পণ্ডিতসমাজের একটা ঘৃণা জন্মিয়াছে। তাহাতে কেবল সন্দেহেরই উদ্রেক হইয়াছে এবং এমন কি যাঁহারা শ্রীভগবানে শ্রদ্ধাবান্ ও ভক্তিপরায়ণ, তাঁহাদের ভক্তির পথে একটী প্রবল কণ্টক উপস্থিত করা হইয়াছে, তাঁহারা স্ব স্ব আচরিত ভক্তিপথে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারিতেছেন না। পণ্ডিতগণ এই সহজ সত্যটী ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এক মহাভাব হইতেই অনন্ত ভাবের উদয় হইয়াছে, এবং বিভিন্ন ভাব যেমন পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া সেই মহাভাবে যাইয়া মিলিত হয়, সেই ভাব-নিচয়ের অভিব্যক্তি শাস্ত্রসমূহের মধ্যেও তেমন একটী মিলনস্থান আছে, এই কেন্দ্রটী স্থির করিতে পারিলে আর বিরোধ থাকে না, সকলের মধ্যেই এক অপূর্ব্ব প্রেম সংস্থাপিত হয়। প্রাণতমে! আমি তাই ছাত্রগণকে যখন অধ্যাপনা করি, তখন একই সময়ে একসঙ্গে সকল শাস্ত্র অধ্যাপনা

করিয়া থাকি। খগোল বল, ভূগোল বল, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, অথবা সকল রসের সার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই বল, সকলের মধ্যেই এক মহা-সত্য—এক মহাভাব নিহিত রহিয়াছে, আমি সকল গ্রন্থই অধ্যাপনা করিয়া ছাত্রগণকে এক মহাভাবের দিকে উন্মুখ করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। এই ভাবে অধ্যাপনা করাও যেমন সহজ, অধ্যয়ন করাও সেইরূপ অতিশয় সহজ। ছাত্রগণকেও দেখিতে পাই যে, তাহারা এক মহাসত্যের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখা বশতঃ সকল শাস্ত্রই অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে। আমি শুনিতে পাই যে, আমার ছাত্রগণ সহজেই সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে। এই যে সহজ উপায়ের কথা বলিলাম, ইহাই একমাত্র কারণ, ইহাতে মানুষ জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়। মানুষের একটা ধারণা যে, এই জগত ছাড়া আর একটী সুখময় রাজ্য আছে, এই কর্ম্মের জগত ছাড়াইয়া সেই সুখময় জগতে পৌঁছাইতে হইবে। কিন্তু এই জগত যে পরমানন্দধামেরই ছায়া মাত্র, এই জগতের মধ্য দিয়াই যে সেই চিদানন্দধামের রস আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায় ও এই জড়জগতই যে চিদানন্দরাজ্য হইয়া যায়, মানুষ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। সেই ভাব পুনরায় আনয়ন করাই আমার শাস্ত্রাধ্যাপনার উদ্দেশ্য। আমি ইহার সূচনা করিয়া দিতেছি। জগতের যাবতীয় জীব যখন এই ভাব অবলম্বন করিতে পারিবে, তখন জগত ধন্য হইয়া যাইবে।

পরম-প্রোজ্জ্বল-রস-মূর্ত্তি শ্রীমতী নীরবে সকল কথা শুনিতেছিলেন। তখন তিনি শ্রীপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হৃদয়েশ্বর! তুমি কত কথাই বলিলে! আমি শুনিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম। তুমি বলিলে, ভাষা ভাবেরই অভিব্যক্তি, এ কথায় আমার বড় আনন্দ হইল। সত্য সত্যই ত আমরা যাহা ভাবি, তাহাই ভাষায় পরিব্যক্ত করি। এখন আমার জানিতে

ইচ্ছা হইতেছে, তবে আর আমরা ভাষার অনুশীলন করি কেন ? ভাবের অনুশীলন করিলেই ত আমরা পরমানন্দপ্রদ মহাভাবে উপস্থিত হইতে পারি। ভাষায় আর আমাদের প্রয়োজনীয়তা কি ?" এই বলিয়া শ্রীমতী প্রেমবিগলিতা হইয়া মধুর দৃষ্টিতে শ্রীপ্রভুর বদনচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। দেখিতে দেখিতে শ্রীমতী শ্রীপ্রভুর শ্রীচন্দ্রবদনে মুখখানি রাখিয়া প্রাণবল্লভকে জড়াইয়া ধরিলেন। শ্রীপ্রভু তখন শ্রীমতীকে অঙ্কে ধারণ করিয়া ধীরবচনে মধুরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "প্রাণেশ্বরি ! ভাষায় ভাবের মাধুর্য্য বর্দ্ধন করে এবং ভাবও ভাষার মাধুর্য্য পোষণ করে। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, তৃণগুল্ম প্রভৃতি সকল জীবই স্ব স্ব ভাষায় আপনার ভাব ব্যক্ত করে এবং একের ভাব অপরের মধ্যে প্রদান করিয়া আনন্দের ক্রমান্বয় পরিবর্দ্ধন করে। এটীও লীলাময় শ্রীভগবানের একটী লীলা। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে দেখিও যে, সর্ব্বত্রই একটী ভাবসামঞ্জস্য রহিয়াছে। পরস্পর আদান-প্রদানে এই ভাবের পরিপুষ্টি হয়। ভাবের যখন প্রাবল্য হয়, তখন নীরবতার মধ্যেও একটী ভাষার স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। যে ভাগ্যবান্ এই ভাব ধরিতে পারিয়াছেন, তিনি ভাষার অতীত হইয়া এই ভাষার মধ্যে থাকিয়াই পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার ভাষা ও কার্য্য—ভাবের অনুকূল হইয়া তাঁহাকে পরমানন্দ প্রদান করে। এমন দিন জগতে আসিতেছে, যখন ভাবময় রাজ্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তুমি পরিপূর্ণ ভাবময়ী। তোমাকে আদর্শ করিয়া সকলে ভাব প্রাপ্ত হইবে। জগত যে প্রেমের খেলা দেখিতেছে, তুমি সেই অনন্ত প্রেমের কেন্দ্র। তোমাকে আশ্রয় করিয়া সকলেই প্রেম পাইবে।"

এই কথায় শ্রীমতী একটু লজ্জিত হইলেন। তাঁহার শ্রীমুখখানি আরক্তিম হইল এবং কি ভাবে যেন তাঁহার শ্রীগণ্ড বাহিয়া নয়নজল পড়িতে

লাগিল, আর শ্রীগৌরচন্দ্র স্বীয় অঞ্চল দিয়া শ্রীমতীর নয়নজল মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। এমন সময় কয়েকটী নদীয়ানাগরী আসিয়া সেখানে মিলিত হইলেন। শ্রীমতী তখন জনে জনে প্রত্যেকের গলা ধরিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। নারীগণ প্রেমে আত্মহারা হইয়া গান ধরিলেন—

অনন্ত প্রেমের অনন্ত উৎস
নদীয়া-যুগলে পেয়েছি আজ।
তাইত মোদের চলিয়া গিয়াছে,
সরম ভরম কুলের লাজ॥
যে প্রেম লাগিয়া শিব সনকাদি
ভুবন মাঝারে নিয়ত ঘুরে।
সে প্রেম-মূরতি রসের আরতি
উদিত হয়েছে নদীয়াপুরে॥
যে প্রেমপ্রভাবে সুমধুর ভাবে
মায়ার বাঁধন ছুটিয়া যায়।
মোদের ভাগ্যেতে শচীর আলয়ে
সে প্রেম-মূরতি শোভিছে হায়॥

এই গান গাহিয়া নারীগণ শ্রীমতীকে লইয়া সাজাইতে বসিলেন। তাঁহাকে সাজাইয়া পরাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বামে বসাইলেন। বসাইয়া তাঁহারা যুগলরূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ইহার কি প্রতিদান দিবেন! তিনি ইঁহাদের ভালবাসা পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। তখনও তিনি পণ্ডিত মানুষ। তিনি ভাবিলেন, তিনি আর কি দিয়া তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিবেন। আর কিছু না পাইয়া তিনি শ্রীমতীকে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীমতী ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি পুস্তকাধার হইতে নামাইলেন। শ্রীপ্রভু বইখানি খুলিয়া দশম

স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলা পড়িতে লাগিলেন, মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে যে অশেষ প্রীতি করেন, সেই বাৎসল্যরস আস্বাদন করিতে তিনি বড় আনন্দ পান। মা যশোদার বাৎসল্যরস বর্ণনা করিতে করিতে শচীমা যে তাঁহাকে অশেষ স্নেহ করেন, সেই ভাব তাঁহার উথলিয়া উঠে, মায়ের স্নেহ পাইয়া যে তিনি কত ধন্য হইয়াছেন, এই কথা শতমুখে প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা যে সর্ব্বোত্তম লীলা, ইহা সকলকে বুঝাইয়া বলেন। প্রেমের এমনই অপূর্ব্ব প্রভাব, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, অতিশয় প্রকাণ্ড বস্তু, যাঁহাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলে অতিশয় বৃহৎ বস্তু মনে করিয়া ভক্তি করিয়া থাকে, মা যশোমতী প্রেমের প্রভাবে সেই বৃহৎ বস্তুটীকে আপন শিশুজ্ঞানে তাড়ন ভৎর্সন করেন; যিনি সকলকে লালন-পালন করেন, সকলের আহার যোগান, মা যশোদা তাঁহাকেই লালন-পালন করেন এবং তাঁহাকে ক্ষীরসর ননী দিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি সম্পাদন করেন। বলিতে বলিতে শ্রীগৌরসুন্দর একদিকে যেমন সর্ব্বতত্ত্বসার প্রেমতত্ত্ব সহজ করিয়া মধুরভাবে বুঝাইয়া দেন, অন্যদিকে আবার প্রেমের কথা বলিতে বলিতে নিজেই প্রেমবিগলিত হইয়া সকলকে প্রেমরস আস্বাদন করান। একদিনে তাঁহার বেশী আস্বাদন করা হয় না। দুই একটী শ্লোক লইয়া তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতে করিতেই তিনি আত্মহারা হইয়া যান। শ্রীমতী নারীগণকে লইয়া প্রেম-বিহ্বলচিত্তে এই সকল প্রেমের কথা শুনিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকেন। কোনদিন বা শচীমাতা ও তাঁহার সমবয়স্কা বৃদ্ধাগণ সেই সঙ্গে বসিয়া নিমাইয়ের মুখে ভাগবত শুনিতেন এবং প্রেমাশ্রুতে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত, ক্ষণপরেই শচীমা যাইয়া খাবার আনিয়া সকলকে খাওয়াইতেন। পাঠ বন্ধ করিয়া সকলে শচীমার স্নেহ পাইয়া আর এক আনন্দসাগরে ভাসিতেন, ভাগবতের যে বাৎসল্যরসের কথা নিমাইচাঁদ পাঠ করিতেন, সকলে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া আরও আনন্দ পাইতেন।

এইভাবে শ্রীগৌরচন্দ্র পারিবারিক সুখ আস্বাদন করিতেন। কোন দিন বা তিনি শ্রীমতীকে লইয়া প্রকৃতির মাধুরী নিরীক্ষণ করিতেন। তিনি শ্রীমতীকে দেখাইতেন যে, এই বিচিত্র বিশ্বে বিবিধ বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, সকলই মধুময়, সকলই শ্রীভগবানের প্রীতির পরিচায়ক। তিনি যেমন বিবিধ বস্তু কত মনোমোহন করিয়া সৃজন করিয়াছেন, উহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য আবার জীবকে তদুপযোগী ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। বাহ্যপ্রকৃতি ও জীবের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে সুমধুর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পরমানন্দময় শ্রীভগবান্ জীবকে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। শ্রীভগবান্ যে প্রেমময়, তিনি যে জীবকে বড় ভালবাসেন, প্রতি পত্রে, প্রতি পুষ্পে তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃতি নবনব সাজে সজ্জিত হইয়া জীবের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। ভগবান্ যে নিত্যই নূতন, অনন্তরূপের উৎস, অশেষ প্রেমের অফুরন্ত প্রস্রবণ, প্রকৃতি তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে সাক্ষ্য দিতেছে। আজ সূর্য্যটী যে ভাবে গগনমণ্ডলে উদিত হইল, কাল সে আর এক ভাব ধারণ করিয়া জগতখানিকে উদ্ভাসিত করিবে। চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণ আজ যে ভাবে আনন্দ প্রদান করিল, কাল উহা আর এক নবভাবে হৃদয়খানিকে উল্লসিত করিয়া তুলিবে। আজ ফুলটী যে ভাবে হাসিল, কাল উহা হইতে আর এক নূতন মাধুর্য্য বিচ্ছুরিত হইবে। বৃক্ষের পত্রটী এখন যে ভাবে দুলিল, পর মুহূর্ত্তে উহা আর এক অভিনব ভাব ধারণ করিয়া আনন্দ দিতে উদ্যত হইবে। শস্যক্ষেত্রখানি আজ যে ভাবে সৃজন-মাধুর্য্য প্রকাশ করিল, কাল উহাতে আর এক নূতন মাধুর্য্য পরিলক্ষিত হইবে। আজ প্রভাতে বিহগকুল যে ভাবে মধুর কুজন করিল; কাল উহারা আর এক নবভাবে গান করিয়া জীবের চিত্তবিনোদন করিবে। এইরূপ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকৃতি নবনব বেশ ধারণ করিয়া জীবের মনোরঞ্জন করিতেছে।

শ্রীপ্রভু শ্রীমতীকে লইয়া, কখন কখন বা শ্রীমতীসমভিব্যাহারে নাগরীগণকে লইয়া, এইরূপ রসাস্বাদন করিতেন; আর শ্রীভগবান্ যে কত রসময়, তিনি যে রসিকশেখর, তাহা বলিয়া বলিয়া কত আনন্দ পাইতেন এবং প্রেমাশ্রুপাত করিতেন। ভাবনিধি শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবের আর অবধি নাই। কোন দিন কোন সময়ই তিনি পুরাতন কথা বলেন না। যিনি তাঁহার কথা শুনেন, তিনি সকল সময়ই নবনব রসের আস্বাদন প্রাপ্ত হন। আবার শচীমা যে সকলকে স্নেহ করেন, সেই স্নেহও যেন সকলে সকল সময়ই নূতন বলিয়া অনুভব করেন, এবং সর্ব্বদাই তাঁহারা অভিনব রসে সিঞ্চিত হন। শ্রীগৌরচন্দ্র ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এই রসের কেন্দ্র। বাৎসল্যরসেই হউক, কিংবা সখ্যরসেই হউক, যিনিই যে ভাবে এই প্রেমের বস্তু দুইটী আশ্রয় করিতেন, তিনিই অপার্থিব রস প্রাপ্ত হইয়া জগতখানি সুখময় দেখিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সংসারখানি এইরূপ আনন্দনিকেতন। তাই শচীমার গৃহখানি আদর্শ সংসার। এই গার্হস্থ্যধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া পরমানন্দ বিস্তার করার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গার্হস্থ্যরস আস্বাদন করিলেন। আমাদের মতই সংসার পাতিলেন। তবে পার্থক্য এই, আমাদের মত সাধারণ জীবের সংসারে ত্রিতাপ আছে। আমাদের সংসারে সুখ আছে বটে, কিন্তু ইহাতে জ্বালাও আছে, এবং এই জ্বালা অন্তিমে ও দেহান্তে সুখ আস্বাদন করিতে দেয় না। আমাদের সংসারে মায়া প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রেমরস আস্বাদন হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে ও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দেহজনিত যন্ত্রণার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। শ্রীগৌরাঙ্গ বাহিরে মায়িক ভাবে বিচরণ করিয়া মায়ার মধ্যে থাকিয়াও এমন আদর্শ প্রীতির সংসারধর্ম্ম করিলেন যে, সেই প্রীতির নিকট মায়ার প্রভাব খর্ব্ব হইয়া গেল এবং দেহ থাকিতেও দেহজনিত জ্বালা-যন্ত্রণা

তাঁহার সংসারে স্থান পাইল না। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী প্রেম লইয়া সংসারখানি গঠিত। কিন্তু সাধারণ সংসারে প্রেমের এই চারিটী স্তরের কোনটীই প্রোজ্জ্বলরূপে বর্ত্তমান নাই, তাই সেখানে জীব তাপত্রয়ে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের সংসারে প্রেম পরিপূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, তাই সেখানে ত্রিতাপজ্বালা নাই। জগতে সকল সংসার যখন এই আদর্শে গঠিত হইবে, তখন সমগ্র জগত প্রেমময় হইয়া যাইবে,—গোলোক ভূলোকে স্থাপিত হইবে; এ জগত সে জগত এক হইয়া যাইবে। জীব অবশ্যই শ্রীভগবান্ হইতে পারেনা। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণপ্রেমময়, জীব তাঁহার অংশ। শ্রীগৌরাঙ্গের সংসারখানি আদর্শ করিলে জীব তাহার নিজের পরিমাণে পূর্ণ হইবে, তাহার আর কোন অভাব অভিযোগ থাকিবে না। প্রেমের নিকট আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, ও আধ্যাত্মিক এই তাপত্রয় কিরূপে স্থান পায় না বলিতেছি। আপনার সংসারে যে প্রীতির চারিটী বিষয় আছে, তাহার প্রতি বিশুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়া প্রেমের কর্ষণ করিতে পারিলে আপনার হৃদয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে। প্রেম শুদ্ধ চিন্ময় বস্তু। দেহ রক্তমাংসময় জড় বস্তু। তথাপি দেহের মধ্য দিয়াই প্রেমের বিকাশ হয়। দেহটী প্রেমবিকাশের যন্ত্রস্বরূপ বলিলে বলা যায়। দেহের মধ্যে যে দেহী বা আত্মা আছেন, ইনি চিন্ময় ও আনন্দময়। ইহার সহিতই চিদানন্দময় শ্রীভগবানের সম্বন্ধ,—জড়দেহের সহিত নহে। দেহটী মায়া-গঠিত, যদি মায়ার প্রাবল্য হয়, তবে দেহের প্রভাব আত্মায় প্রতিফলিত হয় এবং ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ প্রেমস্বরূপ আনন্দময় আত্মার স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ হইলে দেহের উপর ইহার প্রভাব বিস্তার করে। তখন দেহখানি আত্মার ভাবোপযোগী আকৃতি ধারণ করে। আত্মায় মধুর ভাবের স্ফুরণ হইলে দেহটীও মধুর হয়, ইহা কেবলমাত্র যে নিজের আনন্দবর্দ্ধনে

সহায়তা করে তাহা নহে, অন্যকেও আনন্দ প্রদান করে। আমরা তাই অনেক সময় দেহের আকৃতি ও হাবভাব দেখিয়া মানুষের আত্মার ভাব বুঝিতে সমর্থ হই। কাহাকেও দেখিলে আকৃষ্ট হই ও পরমানন্দপ্রাপ্ত হই, আবার এমন লোক আছেন যে, তাঁহার সঙ্গ করিলে অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, মন কলুষিত হয় বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি আত্মার স্বাভাবিক বিশুদ্ধপ্রীতির কর্ষণ করি তাহা হইলে আমাদের দেহও আত্মার ভাবোপযোগী হইয়া যাইবে; তখন আর আত্মার উপর দেহের প্রভাব বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিবে না, সুতরাং দেহজনিত দুঃখ আর থাকিবে না। তখন সংসারের যে ভালবাসা বন্ধনের হেতু বলিয়া অনেকের ভীতি জন্মায়, তাহাই চিদানন্দ প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী, স্ত্রীপুত্র, দাসদাসী, প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন লইয়া যে সংসার গঠিত হয়, সেই সংসারেই প্রীতির বিষয়সমূহ লইয়া সকল বিষয় শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া প্রেমের কর্ষণ করা জীবের কর্ত্তব্য। ইহাই ধর্ম্ম। ইহা ব্যতিরেকে আর একটা কিছু ধর্ম্ম নাই। যাহাতে আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করে, যাহাতে নিত্যশুদ্ধ আত্মার পরিপূর্ণতৃপ্তি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। আত্মা যখন পরম প্রেমময় শ্রীভগবানের অংশ, তখন প্রেমরস আস্বাদনই করাই পরম ধর্ম্ম, এবং ইহাই জীবের চরম লক্ষ্য। কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া সংসারবাসনা বৃদ্ধি করা ধর্ম্ম হইতে পারে না, উহা দেহের ধর্ম্ম—আত্মার ধর্ম্ম নহে। পরিবার-পরিজন লইয়া এই যে প্রেমের অনুশীলন করার কথা বলা হইল, ইহা জীব স্বীয় শক্তিতে পারে না; কারণ সে স্বতঃই মায়ার অধীন—কামের মোহে মুগ্ধ। দৈহিক সুখবাসনা পরিতৃপ্ত করার নামই কাম। প্রেমের অনুশীলন সহজ করিবার নিমিত্তই শ্রীভগবান্ পরম প্রেমমূর্ত্তি শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে প্রকাশিত হইয়া শচীর আলয়ে সংসারী হইয়া লীলা করিলেন। এখানে

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী প্রেমেরই মাধুর্য্য ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষকতা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করা জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহা সকলেই জানেন যে, যে বস্তুর সঙ্গ করা যায়, সেই বস্তুরই গুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পরম প্রেমস্বরূপ। ইঁহাদের সঙ্গ করিলে আমাদের প্রেম প্রবুদ্ধ হইবে, আমরা আত্মার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইব। ইঁহাদের সঙ্গ কিরূপে করিতে হইবে, পূর্ব্বে তাহা কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। এখানে আর একটু বিস্তৃত করিয়া বলিতেছি।

আপনি সংসার পাতিয়া বাস করিতেছেন; শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াকেও আপনার সংসারে লইয়া আসুন। আপনার বাসের নিমিত্ত একখানি গৃহের প্রয়োজন, এই দুইটি প্রেমের মূর্ত্তির জন্যও একখানি গৃহ করুন। অবশ্য আপনার সাধ্যানুরূপ গৃহখানি সুন্দর হইবে। এই গৃহে একখানি সুন্দর আসনে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীবিগ্রহ—দারুমূর্ত্তি কিংবা মৃণ্ময় মূর্ত্তি অথবা শ্রীচিত্রপট স্থাপন করুন। যে বস্তু দুইটির মূর্ত্তি রাখিলেন, ইঁহারা আপনার গৃহের কর্ত্তা এবং আপনি তাঁহাদের দাস বা দাসী। আপনার গৃহের অন্নবস্ত্রের সংস্থান ইনিই করিতেছেন। সুতরাং ইঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য; আর যদি শ্রীগৌরাঙ্গকে আপনজন বলিয়া আপনি মনে করেন ও তাঁহার প্রতি আপনার প্রেম হইয়া থাকে, তবে ত আর কথাই নাই; তখন আপনি আপনা হইতেই আপনার অভিরুচি অনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিবেন। যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে কর্ত্তা স্থির রাখিবেন। তাঁহার গৃহে তাঁহার শয়নোপযোগী খট্টা শয্যা প্রভৃতি প্রদান করিবেন। আপনি তাহাকে নিজজন বোধে সেবা করিতেছেন, সুতরাং আপনার যেরূপ শয্যাদির প্রয়োজন, তাঁহাকেও তদ্রূপ দিতে হইবে। এই যে গৃহখানি

হইল, এইখানি হইল আপনার ঠাকুর-মন্দির। প্রত্যহ ঠাকুরকে প্রণিপাত করিয়া বলিবেন 'প্রভু, আমি তোমার দাস'। কর্ম্মোপলক্ষে অন্যত্র কোথাও যাইতে হইলে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া যাইবেন, এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ঠাকুরকে পুনরায় দণ্ডবৎ করিয়া জানাইবেন যে, আপনি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীভগবান্ অবশ্য সকলই জানেন, তিনি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। তবে তাঁহার এই অনন্ত অসীম ভাব লইয়া তাঁহাকে ভজন করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। তিনি আমাদেরই মত না হইলে তাঁহার সহিত আমাদের প্রেম হইতে পারে না। কিন্তু তিনি আমাদের মত বাহিরে প্রতীয়মান হইলেও তাঁহার অন্তরালে আমাদের অগোচরে এক অনন্ত ঐশ্বর্য্য ক্রিয়া করে, তাহাতে আমাদের সহিত তাঁহার মধুরভাব আরো মধুর করিয়া দেয়। আপনি বলিবেন, 'প্রভু, আমাকে অনুমতি দাও, আমি এই কর্ম্মটী করিয়া আসি।' আপনি প্রাণে প্রাণে বুঝিবেন, ইহা ঠাকুরের অভিপ্রেত কিনা। আপনি কোন জিনিষ ঠাকুরকে অর্পণ করিতেছেন, আপনি মানসনেত্রে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, তিনি আপনার জিনিষ গ্রহণ করিয়া কত আনন্দ বোধ করিতেছেন। প্রত্যহ স্নান করিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীপাদপদ্মে তুলসী-চন্দন অর্পণ করিবেন। তুলসী-চন্দন অর্পণ করিবার সময় কোন সংস্কৃত শ্লোক বা মন্ত্র বিশেষ উচ্চারণ করিয়া দিলেই যে তিনি গ্রহণ করিবেন ও তাহাতে পরিতুষ্ট হইবেন তাহা নহে। শাস্ত্রকার বলেন—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

অর্থাৎ, কেবলমাত্র তুলসীদল কিংবা গণ্ডুষমাত্র জল শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলেই ভক্তবৎসল শ্রীপ্রভু আপনাকে ভক্তের নিকট বিক্রী করেন।

শ্রীভগবান্ পরমদয়াল, জগতের বন্ধু। আপনি সংস্কৃত জানেন, মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন, আপনিই শ্রীভগবান্‌কে পাইবেন, আর আমি মূর্খ, আমি তাঁহাকে পাইব না, ইহা কি সম্ভবপর? ভক্তচূড়ামণি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কেবলমাত্র তুলসীদল ও গণ্ডুষমাত্র জল শ্রীনারায়ণকে অর্পণ করিয়াই সর্ব্বাবতারতারী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে অবতরণ করাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শালগ্রামশিলা অর্পণ করিলেন, তখন তিনি এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, "রঘুনাথ, তুমি প্রত্যহ এককুঁজা জল দিয়া ইঁহাকে স্নান করাইও এবং তদনন্তর তুলসীপত্র অর্পণ করিও।" শ্রীমন্মহাপ্রভু আর কোন মন্ত্রের কথা বলিয়া দিলেন না। শ্রীভগবান্ কোন কথা চাহেন না, তিনি হৃদয়ের দেবতা, প্রাণের পরম আরাধ্য বস্তু, মন্ত্রের দেবতা নহেন। অবশ্য যাঁহারা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাঁহার সেবা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছি না এবং তাঁহাদিগকে তাহা পরিত্যাগ করিতে বলা হইতেছে না। যাঁহারা মন্ত্র জানেন না, সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকেই বলা হইতেছে যে, তাঁহারা যেন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভগবদ্ভজনের অধিকার পাইতে বঞ্চিত না হন। তুলসীচন্দন অর্পণান্তে পুষ্প ও মাল্য দ্বারা তাঁহাকে সাজাইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন আপনার অতি নিজজন, তখন তাঁহাকে ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আপনার ভাবানুরূপ মনোজ্ঞ করিয়া সুশোভিত করিবেন। তদনন্তর অন্নব্যঞ্জনাদি পরিস্কৃতভাবে রন্ধন করিয়া ঠাকুর-মন্দিরে লইয়া গিয়া ইহা দ্বারা তাহাকে ভোগ দিবেন। আপনি যে যে দ্রব্য দ্বারা আহার করিতে ভালবাসেন এবং আপনি যে ভাবে ভোজন করেন, ঠাকুরকেও সেই সেই দ্রব্য দ্বারা সেইভাবে আহার করাইবেন। অবশ্য, আতপ, সৈন্ধবাদি নিরামিষ সাত্ত্বিক খাদ্যদ্রব্য দ্বারাই ভোগ দিতে হইবে, কারণ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকটলীলাকালীন এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন।

মৎস্য-মাংসাদি তামসখাদ্য সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। আপনি বলিতে পারেন, মৎস্য-মাংসাদি না খাইলে শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না; কিন্তু এ কথা ভুল। পুষ্টিসাধন অর্থ তামসভাব বৃদ্ধি করা নহে। আর এ কথা মনে রাখিবেন যে, শ্রীভগবানে অর্পণ করিলে সেই বস্তুতে অপ্রাকৃত আস্বাদন ও অপ্রাকৃত শক্তি সঞ্চারিত হয়। এটী শ্রীপ্রভুর কৃপা। প্রসাদী শাকান্নে আত্মার যেরূপ প্রসাদ, শরীরের পুষ্টিসাধন ও স্ফূর্ত্তি হয়, মৎস্য-মাংসাদিতে তাহা হয় না। প্রত্যেক বস্তুতেই আস্বাদন ও শক্তি প্রদান করার কর্ত্তা একমাত্র শ্রীভগবান্। সাধারণভাবে তিনি এক এক বস্তুতে এক একটী আস্বাদন ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারই প্রদত্ত বস্তু আবার তাঁহাকে অর্পণ করিলে উহাতে তাঁহার বিশেষ শক্তি ও আস্বাদন প্রদত্ত হয়। বেশী কথায় প্রয়োজন কি? আপনারা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এইরূপ অন্নব্যঞ্জনাদি কেন, যখন যাহা আপনার আহার করিতে হইবে, তখনই তাহা শ্রীপ্রভুকে নিবেদন করিয়া লইবেন। অবশ্য একবার যাহা নিবেদিত হইয়াছে তাহা পুনরায় তাঁহাকে নিবেদন করিবেন না। কিন্তু প্রসাদী জিনিস একবার কেন, বহুবারও গ্রহণ করিতে পারেন। এই অন্নব্যঞ্জনাদির ভোগরাগ ও তুলসীচন্দন অর্পণ করার কথা বলা হইল, ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের ইহাতে অধিকার নাই। ইহা মনে করা ঠিক নহে। আমরা স্ব স্ব সন্তান, ভ্রাতা, পিতামাতা প্রভৃতিকে খাওয়াইতে পরাইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করি না, কারণ তাহারা আমাদের অতি নিজজন। কিন্তু শ্রীভগবান্ অপেক্ষা আমাদের নিজজন আর কে হইতে পারে? তিনি আমাদের পরম আত্মীয়, পরম বান্ধব, প্রাণের প্রাণ। তাঁহাকে আমরা প্রাণ খুলিয়া মনের কথা সকল বলিব, ইহাতে আবার মধ্যস্থের কি প্রয়োজন? প্রাণটী ঢালিয়া দিয়া আমরাই মনের অভিলাষানুরূপ বিশুদ্ধভাবে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি

দ্বারা শ্রীপ্রভুকে ভোগরাগ অর্পণ করিব, ইহাতে আবার অপরের সহায়তার প্রয়োজন কি? আমরা আতপ চাউল, কলা, ফুলদূর্ব্বা লইয়া বসিয়া রহিব, দুপ্রহর অতীত হইয়া গেলে ব্রাহ্মণ আসিয়া দুই একটী সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়া জল ছিটাইয়া না দিলে আর আমরা সুস্থ হইতে পারিব না! ইহা কি আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? অনর্থক আমরা এরূপ অযোগ্য ব্যক্তির পদতলে আশ্রয় লইতে যাই কেন? অবশ্য যে ব্রাহ্মণ যোগ্য, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সর্ব্বোপরি ভক্তিমান্, তাঁহার অনুগত হওয়া বিধেয়। ভক্তিমান্ হইলে ব্রাহ্মণই হউন, আর চণ্ডালই হউন, সকলেই নমস্য, ভক্তিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই অনুগত হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। এই কথায় কাহাকেও উপেক্ষা করা হইতেছে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।" সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান রহিয়াছে। জীবমাত্রই ভগবানের নিত্যদাস। শ্রীভগবান্ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, আমরা সেই সচ্চিদানন্দেরই অংশ। সুতরাং শ্রীভগবানের নিকট আমরা জাতিভেদ রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহা হইতে দূরে পড়িয়া রহিব কেন? আমি আমার প্রভুকে আমারই ভাবানুরূপ ভজনপূজন করিব, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অবশ্য ভজনপদ্ধতি কাহারো নিকট শিক্ষা করা যাইতে পারে, সেই শিক্ষাদাতা ব্রাহ্মণও হইতে পারেন, চণ্ডালও হইতে পারেন।

আর এক কথা। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করিলে আর ব্রতাদি বা আনুষ্ঠানিক কোন কর্ম্ম কিংবা কোন দেবদেবীর ভজন-পূজনের প্রয়োজন হইবে না। এই সকল ব্যাপার বহির্ম্মুখ ব্যক্তির জন্য। শুভফল প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং অশুভ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ব্রতাদিকর্ম্ম ও দেব-দেবীর পূজার বিধিব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বটে এবং বিধি অনুরূপ আচরণ করিলে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু দেবদেবী প্রভৃতি সকলেই যখন একমাত্র শ্রীভগবানের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া শুভাশুভ ফল

প্রদান করিতেছেন, তখন আর বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা না করিয়া একমাত্র শ্রীভগবানের ভজন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। মনে করুন আপনি কোন দেবতার পূজা করিলেন, তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং আপনি তাহার ফলস্বরূপ কিছু প্রাপ্ত হইলেন। আবার অন্য এক দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে অশুভ ফল দান হইতে বিরত করিলেন; কাহাকেও পূজা করিয়া আপনি রোগমুক্ত হইলেন ইত্যাদি। কিন্তু এক শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজনেই যখন আপনার সর্ব্বার্থসিদ্ধ হয়, তখন আর বিভিন্ন দেবদেবীর ভজনপূজনে প্রয়োজনীয়তা কি? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করে, পত্রে বা শাখায় করে না; মূলদেশে জল দিলেই শাখাপল্লবাদির সন্তোষ হয়। তদ্রূপ বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রেই একমাত্র শ্রীভগবানেরই ভজন করিয়া থাকেন, বিভিন্ন দেবদেবীর আর ভজনপূজন করেন না, শ্রীভগবদ্ভজনেই দেবদেবীগণ পরম সন্তোষলাভ করেন এবং ঐহিক শ্রীবৃদ্ধি আপনা হইতেই হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মায়ারাজ্য চিন্ময়রাজ্যের ছায়ামাত্র। ঐহিক উন্নতি মায়ারাজ্যের অন্তর্গত। ছায়া যেরূপ স্বভাবতঃই বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে থাকে তজ্জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না, মায়াও তদ্রূপ স্বভাবতঃই আমাদের অনুগামী হইয়াই চলিবে; মায়িক উন্নতির জন্য দেবদেবীর পূজা অনাবশ্যক। আমরা যদি পরম পরিপূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের সেবায় নিরত থাকি, তাহা হইলে মায়া স্বতঃই আমাদের সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করিবে, সে ইহ জগতে আমাদের সুখের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবে এবং শ্রীভগবৎসঙ্গ করিবার সময় স্বয়ং দূরে সরিয়া যাইবে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া জীবের জন্য এই সহজ পন্থা প্রকাশ করিয়া দিলেন। তিনি জানাইলেন, শ্রীভগবদ্ভজনে জাতিবিচার নাই, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, পুরুষ নারী, সকলেই তুল্যরূপে অধিকারী, তিনি অতি নিজজন, তাঁহার ভজন মধ্যস্থ দ্বারা হয় না; তাঁহার ভজনে সংস্কৃত মন্ত্র না হইলেও

চলে, তিনি প্রাণের ভাব গ্রহণ করেন, দেবদেবীর পূজা নিষ্প্রয়োজন; ব্রতাদি আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম অনাবশ্যক। তিনি জানাইলেন যে, তাঁহাকে জল তুলসী দিলেই তিনি ভক্তের নিকট বিক্রীত হন। এমন সহজ পন্থা তিনি প্রদর্শন করিয়া গেলেন! তিনি তুলসীদলে আপনাকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন! এমন সহজ উপায়ে যদি আমরা শ্রীভগবান্‌কে পাইলাম, তবে আর আমরা বিধিব্যবস্থা, ব্রাহ্মণাদি দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনাবশ্যক কার্য্যের মধ্যে যাই কেন? যদি শ্রীভগবানই আমাদের নিকট বিক্রীত হইয়া যান, তাঁহাকেই যদি আমরা পাই, তবে জগৎ সংসার, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই ত আমরা পাইব; সুতরাং আমরা আর সাধারণ পার্থিব উন্নতির জন্য, রোগ শান্তির জন্য, শুভাশুভের নিমিত্ত দেবদেবীর আরাধনা করিতে যাই কেন? আপনি বলিতে পারেন, প্রত্যহ তাঁহাকে তুলসীচন্দন অর্পণ করিলেই যে পাইব তাহার বিশ্বাস কি? এ সব তর্কের কথা। কোন দেবদেবীর পূজা করিয়া যে আপনি কোন ফল পাইবেন তাহারই বা স্থির-নিশ্চয়তা কি? সেও শাস্ত্রবাক্য, ইহাও শাস্ত্রবাক্য। তবে যেটি সহজ এবং কলিহত দুর্ব্বল জীবের জন্য যাহা কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর স্বয়ং প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের সর্ব্বথা অনুসরণীয়। সুতরাং আমাদের সর্ব্বতোভাবে "শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া"র সেবা করা সর্ব্বথা বিধেয়। নদীয়ার যুগলসেবা আশ্রয় করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। সকলেরই যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে সেবা করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যিনি যতদূর পারেন, তিনি ততদূর করিবেন। ভগবানের সেবা জীবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে করিতে পারে না। তবে যিনি যে স্তরে থাকিয়া যতদূর সেবা করিতে অধিকার প্রাপ্ত হন, তিনি ততদূর রসাস্বাদন করেন। ভক্তের মধ্যে ছোট বড় নাই। "যাঁর যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।" যিনি যে ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা লইয়াই তিনি শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করিতে

পারেন। দাস্যভাব ত সকলেই পাইতে পারেন, ইহা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আপনি বিচার করিয়া এই পথ ধরিতে পারেন ত ভাল, যদি বিশ্বাস করিয়া এই ভজন গ্রহণ করিতে পারেন, সেও ভাল, একান্ত যদি না পারেন, তবে ছয়টী মাস আপনি একখানি শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার চিত্রপট রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে 'হরেকৃষ্ণ' নামাত্মক * মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রত্যহ শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীচরণযুগলে তুলসীচন্দন অর্পণ করিয়া দেখুন, আপনি কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। আপনার আর তর্কে স্পৃহা থাকিবে না। শ্রীভগবৎসঙ্গজনিত পরমানন্দের অধিকারী হইবেন। আপনার সময়ের অল্পতা হইলে যতক্ষণ আপনি সময় করিয়া লইতে পারেন, তাহার মধ্যেই সেবা করিয়া লইবেন।

(১২)

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শচীমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আমি যে ভাগবত হইতে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করি, তাহা কি তোমার হৃদয়ঙ্গম হয়? আমার ভয় হয়, পাছে বা এই রস-নিলয়গ্রন্থখানি তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিতে না পারায় তোমার রসভঙ্গ হয়।" অপার স্নেহময়ী শচীমাতা নিমাইয়ের এই দীনমধুর বচন শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাছা, আমি ভাগবত শুনিয়া বুঝিব কি? আমি ভাগবত স্বচক্ষে দেখিতেছি।" নিমাই এই কথা শুনিয়া একটু লজ্জিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার মাতার কাছে ভাগবত ব্যাখা করিতে প্রয়াস পাওয়া নিষ্ফল; কারণ, যিনি সত্য সত্যই ভাগবত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছেন,

---

* মহামন্ত্র যথা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

জপ করিবার জন্যও প্রভু এই মহামন্ত্রের বিধান করিয়াছেন।

তাঁহার নিকট কৃষ্ণলীলা বুঝাইয়া তাঁহার মানসনয়নে লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া দিতে চেষ্টা করার আর আবশ্যকতা কি? সেইদিন হইতে তিনি আর মায়ের নিকট বা পবিবার পরিজনের নিকট ভাগবত ব্যাখা করেন না।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কি বস্তু তাহা তিনি জানেন। মা যশোদাই যে এখন শচীমাতারূপে বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রজেশ্বরী যশোমতীর কৃষ্ণই যে এখন শচীরাণীর নিমাইরূপে ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা তাঁহার অবিদিত নাই। তথাপি লৌকিকভাবে লোকশিক্ষার্থ তিনি কয়েকদিন ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে শুনাইলেন। পরে মায়ের মুখ দিয়া তিনি যখন সকলকে শুনাইলেন যে, তিনি ভাগবত প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সর্ব্বলীলার সার সেই বৃন্দাবনলীলাই তিনি নিমাইয়ের মধ্যে আরো উজ্জ্বলভাবে দর্শন করিয়া আনন্দ পাইতেছেন, তখন আর তিনি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা বুঝাইতে প্রয়াস পাইবেন কেন? শুধু শচীমাতা কেন, শচীমায়ের স্নেহে তাঁহার আলয়ে যিনিই আসিতেন, তিনিই এই লীলা প্রত্যক্ষ করিতেন। নিমাইএর মধ্য দিয়া যে কৃষ্ণলীলা প্রত্যক্ষ করিতেন তাহা নহে, বৃন্দাবনের সেই মধুরলীলাই আরো উন্নতোজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতেন। নিমাইকে যে কৃষ্ণ ভাবিয়া রসাস্বাদন করিতেন, তাহা নহে, বৃন্দাবনে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ রসাস্বাদনের বিষয়, এখানে সেইরূপ শ্রীনিমাইচাঁদই সকল রসের বিষয়। শিশুকাল হইতেই নিমাই এইরূপ রস বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত হইয়া তিনি আত্মগোপন করিতে চাহিয়ছিলেন। স্নেহময়ী মায়ের নিকট তাহা পারিলেন না। কাজেই তিনি মায়ের নিকট পরাস্ত হইয়া বালক-ভাবে বিহার করিয়া তাঁহার আনন্দ-বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

নিমাই পড়াইয়া বাড়ী আসিয়া যখনই 'মা' বলিয়া ডাক দিতেন, অমনি মা দৌড়িয়া আসিয়া নিমাইকে গৃহে লইয়া গিয়া কত আদর

সোহাগ করিতেন। তাড়াতাড়ি তখন স্নানের নিমিত্ত তৈল আনিয়া দিতেন। বউমা মায়ের সাহায্য করিতেন। মা নিজহস্তে বালকের মত নিমাইকে তৈল মাখাইয়া দিতেন। কোনদিন বা স্বহস্তে স্নান করাইয়া দিতেন। মায়ের কাছে নিমাই সর্ব্বদাই বালক। ইহাই স্নেহাতিশয্যের প্রবল গুণ। আবার নিমাই যখন ভোজনে বসিতেন, তখন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবেশন করিতেন, আর শচীমা নিকটে বসিয়া বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে কত করিয়া খাওয়াইতেন। কখন বা নিজেই খাওয়াইয়া দিতেন। নিমাইও যে বস্তুটী ভাল দেখিতেন, উহা শ্রীহস্তে ধরিয়া বালকের মত মায়ের মুখে তুলিয়া দিতেন। মা ইহাতে কত সুখ পাইতেন! কোনদিন বা শীতকালে নিমাই নিজহাতে খাইতেন না, মা তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেন, আর তিনি আনন্দসাগরে ভাসিতেন। এত প্রীতি এত স্নেহ জীবে অসম্ভব।

বিবাহ হইয়াছে অবধি প্রতি মাসে প্রতি পর্ব্বেই পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের বাড়ী হইতে বহুবিধ দ্রব্যাদি লইয়া শচীমার বাড়ী লোক আসিত, দেবী মহামায়া বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্ব লইবার নিমিত্ত প্রায়ই লোক পাঠাইতেন, এবং সেই সঙ্গে খাবার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া কন্যা ও জামাতার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিতেন। তত্ত্ব লইতে এইরূপ লোক প্রেরণ করা ও সেই সঙ্গে সাধ্যানুসারে দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দেওয়া প্রেমের পরিচায়ক, দুর্ভাগ্যক্রমে আজ কাল অনেক স্থলে ইহা লৌকিক ও সামাজিক ব্যবহার হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাতে প্রীতির পরিবর্ত্তে অপ্রীতির উদ্ভব হইতেছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় নিমাইএর বিবাহ হইয়াছে। ইহার পর নিমাই কখন বা একাকী, কখন বা শ্রীমতীকে লইয়া শ্বশুর বাড়ী গমন করিয়া দেবী মহামায়াকে আনন্দ প্রদান করেন। কখন বা নিমাই নিজে মনে না করিলেও শচীমা স্বয়ং নিমাইকে পাঠাইয়া দেন এবং

বউমাকেও সেই সঙ্গে প্রেরণ করেন। দুই একদিন পরে পরেই খবরা-খবর লওয়া হয়। ক্রমে তাঁহাদের এতই ঘনিষ্টতা হইয়া গেল যে, দুইটী পরিবার যেন এক পরিবার হইয়া গেল। শচীমাও কখন কখন দেবী মহামায়ার বাড়ী গমন করেন এবং দেবী মহামায়াও শচীমার বাড়ী আগমন করেন। দুই একদিন পরে পরেই শ্রীমতীর পিত্রালয় হইতে যদি লোক জন না আইসেন, তাহা হইলে শ্রীমতীও উৎকণ্ঠিত হন, শচীমাও ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আবার যখন সনাতনমিশ্র কিংবা যাদবচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হন, তখন শ্রীমতীর আর আনন্দ ধরে না; শচীমাও ইঁহাদের সহিত শ্রীমতীর মিলন দেখিয়া আনন্দে অশ্রুপাত করেন। শচীমা তখন নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সকলকে ভোজন করান। কখন বা তিনি স্বয়ং রন্ধন করিতে যান এবং শ্রীমতীকে তাঁহার পিতা বা অন্য আত্মীয়স্বজনের সহিত আলাপ করিতে অবসর প্রদান করেন। শচীমার এতাদৃশ স্নেহে শ্রীমতীও আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, মায়ের কাছ ছাড়া হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার সে বোধ নাই, আর সনাতনমিশ্রও আপনাকে বড় ভাগ্যবান্ মনে করেন যে, তাঁহার কন্যারত্ন এত স্নেহের অধিকারিণী হইয়াছেন। শ্রীমতী স্বয়ং রাঁধিতে গেলেও শচীমা তাঁহাকে রন্ধন করিতে দেন না, তাঁহাকে তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। স্নেহময়ী শচীমা নিমাইকে ভাল বাসিয়া প্রাণে প্রাণে জানেন, বাৎসল্যরস কি বস্তু, সনাতনের নিকট বিষ্ণুপ্রিয়া কত আদরের ধন, কত প্রাণের প্রিয় সামগ্রী। তাই, সনাতনমিশ্রের নিকট বউমাকে রাখিয়া তাঁহাকে এই বাৎসল্যরস আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য প্রদান করেন, আর এদিকে শচীমা স্বয়ং গৃহকর্ম্মাদি করেন। কখন কখন নিমাইচাঁদ মাকে রাঁধিতে নিষেধ করিয়া বলেন যে, এখন আর তাঁহার কষ্ট কি, এখন ত

তাঁহার বধূমাতাই গৃহকর্ম্মাদি করিবেন; তথাপি তিনি কেন স্বয়ং রন্ধন করিতে যান; এই বলিয়া নিমাই মায়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু শচীমাতা বলেন "বউমা আমার বালিকা। সে সকল কাজ করিতে পারিবে কেন? আমার কাজ কর্ম্ম করিতে বড় সুখ হয়। বিশেষতঃ বউমা'র পিত্রালয় হইতে যে লোক আসিয়াছে, তাঁহার সহিত বউমা কথাবার্ত্তা বলিয়া আনন্দ পাইলে আমি তাহাতে বড় সুখ পাই। নিমাই রে! বউমা'র সুখেই আমার সুখ। আমার এ সুখে তুই বাধা দিস্ কেন?" নিমাই পরাজয় স্বীকার করিয়া অবনত মস্তকে চলিয়া যান এবং মায়ের এত স্নেহ দেখিয়া আনন্দে অধীর হন ও প্রেমাশ্রুপাত করেন। কোনদিন বা নিমাই বেশী করিয়া বলিলে শচীমা বলেন, বউমাই-ত রাঁধে, আমি আর রাঁধি কই। বউমা এখনও ছেলেমানুষ, তাই আমি তাকে দেখাইতে আসিয়াছিলাম। আমিই তাহাকে কর্ম্মান্তরে পাঠাইয়াছি এবং ব্যঞ্জনটী নষ্ট না হয়, আমি তাই বসিয়া দেখিতেছি। আমার ইহাতে কোন কষ্ট হইতেছে না।' কখনো বা শচীমার ভগ্নী চন্দ্রশেখরের পত্নী আসিয়া রন্ধন করিতেন এবং কখনো বা নদীয়া-নাগরীগণ কেহ কেহ আসিয়া রন্ধনের ভার লইতেন। ইহাতে সকলেই বড় সুখ পাইতেন। নিমাইকে ও শ্রীমতীকে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে সকলেরই সাধ; ইহাতে সকলেই প্রীতি পান। কখন কখন নিমাইচাঁদ কৌশল করিয়া সনাতনমিশ্রের নিকট আসিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা বলেন, কাজেই শ্রীমতী সেখান হইতে চলিয়া যান, যাইয়া রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং শচীমা তখন নিমাইকে লইয়া সনাতনমিশ্রের নিকট বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করেন। এইরূপে নিমাই সনাতনমিশ্রকেও কত আনন্দ প্রদান করেন। নিমাইচাঁদ যখন বিনয়াবনত হইয়া শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম করেন এবং বিনয়-

মধুর বচনে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করেন, তখন পণ্ডিত সনাতনের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তিনি আপনাকে কত সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করেন। পণ্ডিত সনাতনমিশ্র যখন জামাতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার অধ্যাপনা কার্য্য কিরূপ চলিতেছে, নিমাই তখন অতি বিনীত ভাবে বলেন, 'আপনাদের কৃপায় ভালই চলিতেছে। আপনা-দের মত আমার সতত শুভানুধ্যায়ী থাকিতে আমার কোন কার্য্যেই অকুশল হইতেছে না।' জামাতার বিনয় দেখিয়া ও তাঁহার মধুর কথা শুনিয়া সনাতন পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। সনাতন যে নিমাইকে অতিশয় স্নেহ করেন এবং নিমাইএর মধুর ব্যবহারে সনাতন বড়ই আনন্দিত হন, ইহা দেখিয়া শচীমা'র আনন্দ আরো বাড়িয়া উঠে। ক্ষণপরেই নিমাই আবার শচীমাকে লইয়া সেখান হইতে অন্যত্র যান এবং মাতা পুত্রে পরামর্শ করেন, কি দিয়া তাঁহারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবেন। নিমাই সর্ব্বদাই ভাবেন, তিনি বড় কাঙ্গাল, তাঁহাকে সকলেই বড় ভালবাসে, কিন্তু তিনি কাহাকেও ইহার প্রতিদান দিতে পারেন না। শচীমা আবার নিমাইএর দৈন্য সহিতে পারেন না। তিনি বলেন, "তুই বাছা ভাবিস্ কেন, আমার গৃহে লক্ষ্মী বউমা থাকিতে আমার অভাব কিসের? আর ইঁহারা তোমাকে ভালবাসিয়াই সুখী। ইঁহারা কিছু প্রত্যাশা করেন না। আর আমার বউমা আসিয়াছে অবধি আমার গৃহে কোন অভাবই নাই। তুই ভাবিস্ না, নিশ্চিন্ত হ।" শচীমা'র এতাদৃশ স্নেহে নিমাইএর নয়নযুগল দিয়া প্রেমাশ্রু পতিত হয়। শচীমা তখন, দেবী মহামায়া যে সকল দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সকল দ্রব্য কিছু কিছু আনিয়া নিমাইএর শ্রীমুখে ধরেন। নিমাই উহা গ্রহণ করিয়া এবং দেবী মহামায়া যে তাঁহাকে এত স্নেহ করেন, তাহা দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। শচীমা আবার

রন্ধনশালা হইতে বউমাকে ডাকিয়া আনিয়া স্বীয় হস্তে তাঁহাকে ঐ সকল দ্রব্য কিছু কিছু করিয়া খাওয়াইয়া দেন এবং নাগরীবৃন্দ, যিনি যিনি উপস্থিত থাকেন, সকলকেই শচীমা নিজ হস্তে খাওয়াইয়া দেন। পণ্ডিত সনাতন মিশ্র এই প্রীতির খেলা দেখিয়া আনন্দে অধীর হন।

রন্ধনাদি হইলে সনাতন মিশ্রকে বিশিষ্ট আসনে বসাইয়া কত আদর করিয়া, কত যত্ন করিয়া শচীমা ভোজন করান, শচীদেবী নিকটে বসিয়া থাকেন। সনাতনকে তাঁহার কন্যাই পরিবেশন করেন। নিমাই সেখানে আহার করিতে না বসিলেও সনাতনের আগ্রহে না বসিয়া পারেন না। শ্বশুর জামাতা একস্থানে বসিয়া আহার করেন। সনাতনমিশ্র তখন কন্যার প্রীতি সহকারে পরিবেশন ও শচীমা'র আদর যত্ন দেখিয়া পরমানন্দে ভোজন করেন। পণ্ডিত সনাতনমিশ্র আবার স্বীয়গৃহে দেবী মহামায়ার নিকট এই সকল প্রীতির কথা, শচীমা'র আদর যত্নের কথা এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে যে শচীমা কত ভালবাসেন, এই সকল কথা যখন জ্ঞাপন করেন, তখন দেবী মহামায়া আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকেন।

আবার শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীমতীকে লইয়া শ্বশুর বাড়ী গমন করেন, তখন সেই বাড়ীতে এক উৎসব লাগিয়া যায়। অনেক সময় পূর্ব্বেই সংবাদ থাকে; কোন দিন বা শ্রীগৌরচন্দ্র সংবাদ না দিয়াই শ্রীমতীকে লইয়া যাইয়া উপস্থিত হন। দেবী মহামায়া বাড়ীর নিকটে পাল্কী দেখিয়াই তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আইসেন এবং বাড়ীতে পাল্কী খানি আসিয়া নামাইলেই মেয়ে জামাইকে কত আদর করিয়া গৃহে লইয়া যান, এবং উভয়কে কত সোহাগ করিয়া নিছিয়া পুছিয়া লয়েন; আবার, দুইজনকে দুই কোলে বসাইয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লয়েন। তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। কন্যার বদন-কমলে মুহুর্মুহুঃ চুম্বন দিতে থাকেন। শ্রীমতীর তখন গণ্ড বাহিয়া

প্রেমাশ্রু পড়িতে থাকে। মুহূর্ত্তের মধ্যে দেবী মহামায়ার সমবয়স্কাগণ আসিয়া মিলিত হন। শ্রীগৌরচন্দ্র ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া জনে জনে প্রত্যেককে নমস্কার করেন, এবং তাঁহারাও ইহাদিগকে কেহ বা কোলে তুলিয়া লয়েন, কেহবা বুকের মধ্যে টানিয়া লয়েন, কেহবা চুম্বন প্রদান করেন, কেহবা পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া আদর সোহাগ করেন। সকলেই ইঁহাদের দর্শনে আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকেন। ইতোমধ্যে বালিকাগণ ও শ্রীমতীর সমবয়স্কাগণ আসিয়া মিলিত হন। ইঁহারা শ্রীমতীকে পাইয়া যেন এক অপার্থিব ধন কিংবা কোন স্বপ্নাতীত অমূল্য বস্তু পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হন। কেহবা শ্রীমতীকে আলিঙ্গন প্রদান করেন, কেহবা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরেন। সকলেই আসিয়া শ্রীমতীকে ঘিরিয়া ধরেন। শ্রীমতীও এই মধুর মিলনে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। বালিকাগণের মধ্যে কাহাকেও কোলে লইয়া, কাহারও বা চিবুকখানি ধরিয়া আদর করেন। কাহারও বা মস্তকটী বুকের মধ্যে লইয়া, কাহারও দিকে প্রেম-দৃষ্টিতে চাহিয়া, কাহারও পানে সুমধুর হাসিয়া, সকলকেই আত্মসাৎ করিয়া লয়েন। সকলেই তাঁহার দর্শনে আনন্দে বিগলিত হইয়া যান। এ মিলনমাধুরী ভক্তগণের আস্বাদনের সামগ্রী, ধ্যানের বিষয়ীভূত—বর্ণনার বিষয় নহে। এই নিত্যলীলা ভাগ্যবান্ ভক্তগণ অদ্যাপি দর্শন করিয়া থাকেন। এই নিত্যলীলায় শুধুই প্রেমের খেলা, শুধুই পরমানন্দ। যাহা হউক, এই মিলনের পর শ্রীমতী ও তাঁহার সমবয়স্কাগণ একত্র বসিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট কত প্রাণের কথা বলেন। শ্রীমতী শচীমা'র অপার স্নেহের কথা কহিয়া কত সুখ পান। নাগরীগণ আসিয়া তাঁহাকে কত যত্ন করেন, কত স্নেহ করেন, সেই সকল কথা কহিয়া কহিয়া কত আনন্দ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের প্রীতির কথা কহিতে কহিতে

মধ্যে মধ্যে তাঁহার নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে থাকে। কোন্ দিন কখন্ শচীমা তাঁহাকে কত আদর করেন, কত যত্ন করিয়া তাঁহাকে খাওয়ান পরান, তাঁহাকে শচীমা কত ভালবাসেন, খুঁটিনাটি সকল কথা তিনি বিস্তৃতরূপে বলিয়া বড়ই সুখ পান। আর শ্রীমতী যে সেখানে বড় সুখে আছেন, তাঁহার সমবয়স্কাগণ শ্রীমতীর মুখে একথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ প্রাপ্ত হন। শ্রীমতীর কথা আর ফুবায় না, নারীগণও ইহা শুনিয়া শ্রান্ত হন না। এদিকে দেবী মহামায়া রন্ধনের যোগাড় করিতে থাকেন। তিনি আনন্দে এতই আত্মহারা হইয়া যান যে, তাঁহার বাড়ীতে যিনি আসেন, তাঁহাকেই তিনি প্রেমে বিগলিত হইয়া বলেন, 'আমার মেয়ে আসিয়াছে। যাও, অইত সে ওখানে বসিয়া কথা কহিতেছে। তোমরা সকলে আজ এখানে আহার করিও।' পণ্ডিত সনাতনমিশ্রেরও সেই অবস্থা। তিনি জনে জনে ধরিয়া জামাইকে দেখাইতেছেন, আর বলিতেছেন, 'আমার জামাই মেয়ে আসিয়াছে। আজ তোমরা মধ্যাহ্নে আমার বাড়ীতে আহার করিও।' সনাতনমিশ্রের ভাণ্ডার তখন উন্মুক্ত। তাঁহার প্রাণের পরম প্রিয় বস্তু তাঁহার গৃহে সমাগত। তিনি যাঁহাকে দেখেন, তাঁহাকেই আদর অভ্যর্থনা করিয়া নিমন্ত্রণ করেন, আর আহারের বহুবিধ সামগ্রী আয়োজন করেন। দেবী মহামায়ার সমবয়স্কাগণ সকলে আসিয়া রন্ধনের সহায়তা করেন। এইরূপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া সনাতনমিশ্রের ভবনে আগমন করিলে একটী পরম প্রীতির স্রোত প্রবাহিত হইত।

শ্রীমতী, সমবয়স্কাগণ ও বালিকাবৃন্দ, সকলকে পাইয়া তাঁহার সেই বাল্যকালের পুরাতন গঙ্গার ঘাটে নাহিতে যান, আর পথে ও স্নানের কালে কত কথা বলেন ও শুনেন। স্নান করিয়া আসিয়া সকলে এক সঙ্গে আহার করিতে বসেন। সকলেরই সাধ শ্রীমতীর সঙ্গে একত্র বসিয়া

আহার করেন। শ্রীমতীও সকলকে একত্র লইয়া বসিতে বড় ভালবাসেন। মা কত যত্ন করিয়া কন্যাকে খাওয়ান। কখন বা শ্রীমতী বলেন যে, তিনি মায়ের সঙ্গে বসিয়া আহার করিবেন। দেবী মহামায়াও তাই তাঁহাকে লইয়া আহার করিতে বসেন। তখনও বালিকাবৃন্দ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসেন। মাতা মহামায়া ভালভাল দ্রব্যগুলি কন্যার মুখে তুলিয়া দেন এবং অন্যান্য বালিকাগণকেও খাওয়ান। দেবী মহামায়া তখন প্রেমের পাথারে ভাসিতে থাকেন।

বিকালবেলা হইলে রমণীবৃন্দ ও বালিকাকুল আসিয়া কেহ বা শ্রীমতীর বেণী বিনাইয়া দেন, কেহবা সিন্দুর পরাইয়া দেন। এইরূপে সকলে তাঁহাকে সাজাইয়া পরাইয়া বড় সুখ পান। কখনো বা দেবী মহামায়া কন্যাকে লইয়া নির্জ্জনে বসেন এবং কন্যার মুখে শচীমা'র স্নেহের কথা শুনিয়া প্রেমাশ্রুপাত করেন ও আপনাকে কত ভাগ্যবতী মনে করেন, আর মনে মনে শচীদেবীর নিকট কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শ্রীমতীর পিত্রালয় হইতে কোন লোক গেলে শচীমাতা কিরূপ আনন্দিত হন, যাদবকে তিনি কিরূপ ছেলের মত আদর ও স্নেহ করেন ও কোলে লইয়া কত চুম্বন দেন, তাঁহার পিতা গেলে তিনি কিরূপ পরমানন্দিত হন এবং মাতা তাঁহার জন্য কোন দ্রব্য পাঠাইলে শচীমা কত যত্ন করিয়া স্বীয় হস্তে তাঁহাকে তাহা খাওয়ান, কন্যার মুখে দেবী মহামায়া যখন এই সকল কথা শুনেন, তখন আর তাঁহার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। এই সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীমতীও আপ্লুত হন, দেবী মহামায়াও প্রেমনীরে ভাসিতে থাকেন।

রাত্রিতে আবার পণ্ডিত সনাতনমিশ্র ও দেবী মহামায়া, জামাই, মেয়ে ও পুত্র শ্রীমান্ যাদবচন্দ্রকে লইয়া একস্থানে বসিয়া কত কথা আলাপ করেন। এই সময় নির্জ্জন। সুতরাং এই সময়ে তাঁহারা

কত গৃহস্থালীর কথা, কত পারিবারিক কথা পরস্পর আলাপ করেন। সকলে একত্র উপবেশন করেন। কোন সঙ্কোচ নাই। কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। প্রেমের নিকট সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় না। সকলে একত্র বসিয়া কত প্রীতির কথা, কত প্রাণের কথা আলাপ করেন। আবার কিছু রজনী হইলে কন্যা ও জামাতাকে শয়ন মন্দিরে প্রেরণ করিয়া নিজেরাও শয়ন করিতে যান।

কোন দিন শ্রীমতী দেবী মহামায়ার নিকট নির্জ্জনে বসিয়া প্রাণের কথা বলেন। আর যখন শচীমার কথা বলেন, তখন তিনি বিহ্বল হইয়া যান, তাঁহার আর কথা ফুরায় না। তাঁহার কোন সময় ইচ্ছা হয় যে, যদি তাঁহার অনন্ত মুখ হইত, তবে শচীমা'র স্নেহের কথা বলিয়া কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন। একদিন শ্রীমতী মায়ের কাছে বলিতেছেন, "মাগো! কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আমি সেখানে এত সুখ পাইব। শ্রীমায়ের স্নেহের কথা আর কি বলিব! আমার মনে হয়, মাগো, জগতে আমরা সর্ব্বত্র যে মাতৃস্নেহ দেখিতে পাই, তাহা শচীমা'র নিকট হইতেই সকলে পাইয়াছে। মানুষের এত স্নেহ অধিগম্য হইতে পারে না। জীববুদ্ধির ইহা অগোচর। বাবার কাছে ছেলে বেলা পুরাণে বর্ণিত যে কত দেবদেবীর কথা শুনিয়াছি, বাবা যে আমার নিকট স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও এত প্রীতির ও এত আনন্দের কথা শুনিতে পাই নাই। তিনি যে আমার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ব্রজেশ্বরী মা যশোমতীর স্নেহের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সাক্ষাৎ শচীমাতার নিকট প্রত্যক্ষ করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মা যশোমতীর অপার গভীর স্নেহ বর্ণনা কালীন বাবা কত বর্ণনা করিয়াছেন যে, একমাত্র মা যশোদার স্নেহে বৃন্দাবনধামটী পরম সুখময় রাজ্য ছিল। ব্রজবালকগণ, গোপ-নরনারীগণ, গাভীগণ

এবং এমন কি বনের পশু পক্ষিগণ পর্য্যন্ত মা যশোমতীর স্নেহ পাইয়া ধন্য। বাবা বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনিতে পশুপক্ষী বৃক্ষ লতাদি সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল, এই কথা যে ভাগবতে বর্ণিত আছে, ইহার মূলে মা যশোমতীর স্নেহ বিরাজমান। মা যশোদার স্নেহেই শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিতে ক্রিয়া করে। মাগো, তুমিও ত ভাগবতের বিষয় সম্যক্ অবগত আছ। মা যশোদা কিরূপে কৃষ্ণসখা ব্রজবালকগণকে কত স্নেহসহকারে খাওয়াইতেন, পরাইতেন, কত সুন্দর করিয়া সাজাইতেন, শ্রীকৃষ্ণের খেলার সহচরীবৃন্দকে কত সোহাগ করিতেন; সমস্ত গোপ নরনারী মা যশোমতীর স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়া কিরূপ ধন্য হইত; ইহা এতদিন শুনিয়াছি বটে, কিন্তু শচীমা'র আলয়ে ইহা এখন প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমি দেখিতেছি, শচীমা'র নিকট জগতখানি সমস্তই যেন ব্রজধাম। তিনি সকলকেই প্রাণতুল্য ভালবাসেন। কত দূর দেশদেশান্তর হইতে শচীমা'র বাড়ী অনবরত কত লোকে আসিতেছে। সকলেই যেন শ্রীমায়ের কাছে চিরপরিচিত। আর সকলেই তাঁহাকে 'মা' 'মা' বলিয়া কত ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া আমার মনে হয়, সকল মায়ের মূর্ত্তিই শচীমা'র মধ্যে বিকাশমান। তিনি আপন সন্তানের মত সকলকে কত স্নেহ করিয়া, কত আদর যত্ন করিয়া খাওয়ান; তিনি আমাকে এত ভালবাসেন যে, এত লোকের রন্ধন তিনি আমাকে বড় একটা করিতে দেন না, তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিতে যান। আমি যদি কখনো রাঁধিতে যাই, তাহা হইলে তিনি ক্ষণপরেই রন্ধনশালা হইতে কোন ছল করিয়া ডাকিয়া আনিয়া আমাকে কোলে লইয়া বাসেন এবং স্বীয় অঞ্চল দিয়া কত সোহাগ করিয়া আমার মুখ মুছাইয়া দেন, গায়ে হাত বুলায়েন ও মুখে কত চুম্বন প্রদান করেন। মাগো, আমি তাঁর স্নেহে ধন্য। আমি মায়ের সেবা ও শুশ্রূষা কিছুই করিতে পারি না। একটু কিছু কর্ম্ম

করিতে না করিতেই মা আমাকে 'বাছা' 'মণি' 'ধন' করিয়া কত বলিয়া কহিয়া কর্ম্ম হইতে বিরত করেন। মাগো, এমন স্নেহ জগতে আর হয় না। আমি সুখ পাইব বলিয়া, যে সকল নারীবৃন্দ আমার নিকট আসেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্নেহ যত্ন করিয়া আমার নিকট রাখিয়া দেন। তাঁহারাও তাঁহার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ আসিয়া আমাকে কত আনন্দ দেন। মাগো, সে স্নেহের কথা আর কি বলিব, আমি ক্রীড়া করিয়া সুখ পাইব বলিয়া তিনি সকলকেই ভালবাসেন। তাঁহার স্নেহ ও মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পাখীগণ প্রত্যহ আঙ্গিনায় আসে। সেখানে একটী মাধবীকুঞ্জ আছে। প্রত্যহ বিকালবেলায় কতশত রকমের সুন্দর সুন্দর পাখী সেখানে আসিয়া ক্রীড়া করে। এমন আশ্চর্য্য দৃশ্য আমি আর দেখি নাই। তাঁর ভালবাসায় বনের পাখী পর্য্যন্ত মুগ্ধ। আমি সেই সকল পাখী লইয়া ক্রীডা করি, আর শচীমা তাহাতে বড় সুখ পান। মাগো! বহু ভাগ্যে এমন মা পেয়েছি। মা! তোমার জামাতার পড়াইয়া আসিতে রাত্রিতে কিছু দেরী হইলে তিনি আমাকে কোলে লইয়া বসেন এবং কত কথা আলাপ করিয়া আমাকে সুখ দেন। তাঁহার ভালবাসায় আমি সুখের পাথারে ভাসিতে থাকি। কোন দিন প্রভাতে যদি আমার শয্যা হইতে উঠিতে একটু দেরী হয়, তাহা হইলে তিনি ব্যাকুল হইয়া 'বউ মা' 'বউ মা' বলিয়া কত মধুরস্বরে ডাকিতে থাকেন, আর আমি অমনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি। তিনি তখন আমাকে বুকে করিয়া প্রেমাশ্রুপাত করেন, আর আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। তখন তাঁহার সেই স্নেহমূর্ত্তি দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়া যাই। মাগো! স্নেহের এতই শক্তি যে, তিনি এত কায কর্ম্ম করেন, তথাপি কিঞ্চিন্মাত্র ক্লান্তি বোধ করেন না। দাসদাসীকে তিনি কখনও কোন কাযকর্ম্ম করিতে বলেন না, সকলেই বুঝিয়া শুনিয়া

কায করে এবং কেহ কোন বেশী কায কর্ম্ম করিয়া ক্লান্ত হইতে না হইতেই শচীমা তাহাকে কর্ম্ম হইতে বিরত করেন ও তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলেন, আর তথনই তাহাকে থাবার আনিয়া দেন। সকলেই তাঁহার স্নেহ পাইয়া ধন্য। রাগ কাহাকে বলে তিনি তাহা জানেন না। সর্ব্বদাই তাঁহার হাসিমুখ। এত বুক ভরা স্নেহ আর জগতে হয় না। মাগো! আমি বড় সুখে আছি।" শচীমা'র কথা বলিতে বলিতে শ্রীমতী কাঁদিয়া ফেলিতেন। দেবী মহামায়া শচীমা'র কথা সকলই জানেন বটে, তথাপি কন্যার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া এবং কন্যা যে নিজমুখে বলিতেন যে, তিনি বড় সুখে আছেন, ইহাতে তিনি আরো আনন্দ পাইতেন এবং তাঁহারও প্রেমাশ্রু পড়িতে থাকিত।

এইরূপ শ্বশুরবাড়ী দুই একদিন থাকিয়া শ্রীনিমাইচাঁদ শ্রীমতীকে লইয়া আবার বাড়ী ফিরিয়া আসেন। এদিকে শচীমা'র নিকটও যেন নিমাই ও বধূমাতার বিরহে দুই দিন দুই যুগ বলিয়া বোধ হয়। তাই তিনি যথন আবার তাঁহাদিগকে ফিরিয়া পান, তথন আর তাঁহার আনন্দ ধরে না। নিমাই ও বউমাকে কোলে করিয়া কত সুথ পান।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সুরধুনীতে যথন স্নান করিতে যান, তথন কোনদিন বা নিজেই কাপড়খানি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। কোনদিন বা কাপড় ফেলিয়া গেলে শচীমা ঈশানকে দিয়া কাপড়খানি পশ্চাতে পশ্চাতে পাঠাইয়া দেন। কোনদিন বা শচীমা'র অলক্ষে চলিয়া গেলে শ্রীমতী কাপড়খানা আনিয়া শচীমা'র কাছে আসিয়া ঈশানকে দিয়া উহা পাঠাইতে বলেন। স্নান করিয়া কথনও বা প্রভু নিজেই কাপড়খানি ধুইয়া লইয়া আইসেন, কথনও বা ঈশান ধুইয়া আনেন। প্রভুর কথনও কোন বিষয়ে অভিমান নাই। যিনি পূর্ণ, তাঁহার কোন বিষয়ে কথনও অভিমান থাকিতে পারে না। যাঁহার অভাব আছে, তিনি অভিমান

করেন। তবে যে প্রভুকে মধ্যে মধ্যে মুকুন্দ, মুরারি, গদাধর প্রভৃতির সঙ্গে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ করিয়া শাস্ত্রের তর্ক করিতে দেখা গিয়াছে, তাহাতে বহিরঙ্গভাবে অভিমানের বিকাশ দেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তিনি কখনো অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া, 'তিনি বড় পণ্ডিত'' ইহা মনে করিয়া কখনো কাহারও সঙ্গে আলাপ করেন নাই। পাণ্ডিত্য দেখাইয়া তিনি কাহাকেও পরাজয় করিবেন, এ বাসনা তাঁহার একেবারে ছিল না, যদি তাহাই হইত, তবে মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট আপনা হইতে পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহাতেই সুখ পাইবেন কেন? যেখানে জয়পরাজয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, সেখানে পরাজয়ে জিগীষা প্রবৃত্তি প্রবল হইবে ও তাহাতে একটা জ্বালা আসিবে। আর যিনি জয় করিবেন, তিনিও জয় করিতে করিতে অভিমানে স্ফীত হইয়া অপরকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন এবং তাঁহার জয়ের বাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। শ্রীগৌরচন্দ্রের মধ্যে এতাদৃশ ভাব কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। এমন কি কেশব-কাশ্মিরী নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যখন আসিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের সহিত বিচার করিলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর বিন্দুমাত্র অভিমান প্রকাশ করিলেন না। তিনি অতি বিনীতভাবে, পরম ভক্তিপূতবচনে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। কেশব-কাশ্মিরী তাঁহার বিনীত ব্যবহারে ও স্বাভাবিক পাণ্ডিত্যে আপনা হইতে পরাজয় স্বীকার করিলেন, কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরং তাহার পরিবর্ত্তে শ্রীগৌরাঙ্গের পদানত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। আবার মধ্যে মধ্যে যে তাঁহার ঔদ্ধত্যের ভাব দেখা যাইত, তাহাতে তাঁহার অভিমান প্রকাশ পাইত না। অভিমান দেখিলে লোকে তাহাতে মর্ম্মপীড়িত হয়। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ঔদ্ধত্য দেখিয়া কাহারও তাহাতে বিরক্ত বা দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, ইহাতে সকলেই একটী মাধুর্য্য অবলোকন করিত এবং

ইহাতে বড় আনন্দ পাইত। শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতেন, তিনি কি বস্তু, সুতরাং তিনি অভিমান করিবেন কিসের? স্বাভাবিক গুরুবস্তু স্বয়ং গৌরববর্জ্জিত। শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু নিজেই নহেন, তিনি আদর্শ মানবরূপে বিচরণ করিয়া যাহাদিগকে লইয়া লীলা করিলেন, তাঁহাদের দ্বারাও দেখাইলেন যে, যিনিই তাঁহার সঙ্গ করেন, যিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই স্বভাবতঃ নিরভিমান ও গৌরববর্জ্জিত হইয়া যান। কারণ, পরিপূর্ণ বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে প্রাপ্ত হইলে জীবও স্বীয় পরিমাণানুরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাঁহার কোন অভাব থাকে না। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত নাগরীগণ ইহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, অন্যান্য ভক্তগণ ইহা তাঁহার প্রকাশের পর হইতে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পাণ্ডিত্যে তিনি যেরূপ নিরভিমান ছিলেন, গৃহব্যবহারেও তিনি সেইরূপ সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অভিমানশূন্য ছিলেন। মানুষভাবে তিনি কখনও পাল্কীতে বা চোদোলে চড়িতে ভালবাসিতেন না। অপরের স্কন্ধে চড়িয়া তিনি কোথায়ও গমন করিবেন, তাঁহার সুখের নিমিত্ত অপরে ব্যথা পাইবে, ইহা কখনো তাঁহার প্রীতিকর হইত না। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও শ্রীগৌরচন্দ্রেরই অনুরূপ ছিলেন। তবে যে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে মনুষ্যযানে চড়িতে দেখা যাইত, তাহা কেবল মা ও অন্যান্য সকলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। আর যাঁহারা তাঁহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেন, তাঁহারাও তখন আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। নিজেরা সুখ পাইবেন বলিয়াই এই প্রেমমূর্ত্তিদ্বয়কে তাঁহারা স্কন্ধে ধারণ করিতেন। তখন শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার আর মানুষভাব থাকিত না। তাঁগারা তখন আপনাকে বিস্মৃত হইয়া সেই পরিপূর্ণ আনন্দমূর্ত্তি-নিশ্চেষ্টভাবে বিরাজ করিতেন। শ্রীভগবানকে যে যেরূপ ভাবে রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকে, তাহার সেই ভাবে থাকিয়া তিনি সন্তুষ্ট হন; তিনি তাহাতে দ্বিরুক্তি বা

আপত্তি করেন না; শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াও তখন সেইরূপ করিতেন। তাঁহাদিগকে যিনি যে ভাবে রাখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন, তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, আর কথাটী কহিতেন না। শুধু পাল্কীতে চড়া কেন, সকল কার্য্যই তাঁহারা এইরূপ করিতেন। সখীগণ ও নাগরীবৃন্দ আসিয়া যখন তাঁহাদিগকে সাজাইতেন, পরাইতেন এবং এই যুগলমূর্ত্তিকে সাজাইয়া পরাইয়া তাঁহারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতেন, তখনও তাঁহাদিগকে এইরূপ নিষ্ক্রিয় পরমানন্দমূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতে হইত; আবার পরমুহূর্ত্তেই সখীগণসঙ্গে তাঁহাদিগকে আনন্দ-কোন্দল করিতে দেখা যাইত। তাঁহাদের এই ভাব জীববুদ্ধির অগোচর। মানুষে এই ভাব অসম্ভব।

শ্রীগৌরচন্দ্র বাড়ীর দাসদাসীগণকে কোন কর্ম্ম করিতে আদেশ দিতেন না। তাঁহারা আপনা হইতেই সকল কার্য্য করিতেন। সকলেই কি যেন এক স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ গৃহকর্ম্মাদি করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভালবাসায় সকলে মুগ্ধ এবং ভালবাসাই তাঁহাদের প্রবল প্রেরণা। শ্রীভগবান্ যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন জীবের নিকট আসিয়া কিছু বলিয়া কহিয়া কর্ম্ম করান না, অন্তরে প্রেরণা দিয়া কর্ম্মে বিনিযুক্ত করেন, শ্রীগৌরাঙ্গও তাহাই করিতেন। এই প্রেরণা কি, তাহা তিনি আদর্শ মানুষরূপে লীলা করিয়া দেখাইলেন। তিনি আর কিছুই করিতেন না—সকলকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। এই প্রেমই প্রবল শক্তি। এই প্রেমশক্তি দ্বারা সকল শক্তি পরিচালিত। আমরা সাধারণ চক্ষেও দেখিতে পাই যে, আমরা কাহাকেও যদি প্রাণের সহিত ভালবাসি, তবে সেই লোকটি আমাদের কাছে বিক্রীত হইয়া যায়। সেই ভালবাসায় পরিচালিত হইয়া সে কোন কর্ম্ম করিতেই ক্লান্তিবোধ করে না; বরং তাহাতে অপার আনন্দ অনুভব করে। এই ভালবাসা পরিপূর্ণ মাত্রায় শ্রীভগবানে বর্ত্তমান। একমাত্র গৌরাঙ্গই মানুষভাবে সংসার পাতিয়া এই ভালবাসার শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

তিনি শচীমা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া আদর্শ সংসার করিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার প্রেমের সংসারখানিই এইরূপ। সমস্ত জীবনিচয় লইয়াই তাঁহার বিরাট সংসার; এই সমস্ত জগৎখানি সেই সংসারের আদর্শে গঠিত করিতে হইবে। কিন্তু মানুষ সেই পরিপূর্ণ আদর্শ শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে পারে না। তাই প্রত্যেকেরই এই প্রেমমূর্ত্তি—শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াকে আদর্শ করিয়া সংসার করিতে হইবে। তাঁহারা সংসারের কর্ত্তা হইবেন এবং সংসারের সকলে তাঁহাদের দাসদাসী ভাবে তাঁহাদের অলক্ষিত প্রেমদ্বারা পরিচালিত হইয়া সংসারের কাযকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। প্রত্যেক সংসারই এইরূপ প্রেমদ্বারা পরিচালিত হইলে জগৎখানি মধুময় হইয়া যাইবে। দুঃখ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। এইরূপেই শ্রীগৌরাঙ্গ মায়ার রাজ্যে চিদানন্দময় রাজ্য সংস্থাপন করিলেন।

কোন দিন শ্রীগৌরাঙ্গ সুরধুনীতে স্নান করিয়া আর্দ্রবসনেই বাড়ী আসিতেন। আসিয়া মাধবীতলে তাঁহার শয়নমন্দিরের দরজার নিকটে দাঁড়াইতেন। শ্রীমতী তখন কাপড়খানি লইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিতেন। তখন এক অপূর্ব্ব মাধুরী হইত। শ্রীগৌরচন্দ্র গামছাখানি নিঙ্গাড়িয়া তাঁহার সুকোমল অঙ্গ মুছিতেন, তখন তাঁহার অঙ্গ দিয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বিচ্ছুরিত হইত। প্রেমপূর্ণনেত্রে তিনি শ্রীমতীর দিকে চাহিতেন, আর শ্রীমতীও প্রাণনাথের অঙ্গকান্তি ও রূপলাবণ্য দেখিয়া পরমানন্দে আপ্লুত হইতেন। কেহ কোন কথা কহিতেন না, কহিতে পারিতেনও না। উভয়ে উভয়ের ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। সেই সময়ের দৃশ্য, সেই রূপমাধুরী বর্ণনার অতীত।

কোন দিন শ্রীগৌরসুন্দর অধ্যাপনা করিয়া আর বাড়ীতে না আসিয়া মুকুন্দ-সঞ্জয়ের বাড়ী হইতেই শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেন। শিষ্যগণও স্ব স্ব পুস্তক মুকুন্দ-সঞ্জয়ের বাড়ী যত্নে রক্ষা করিয়া

গুরুর সঙ্গে পরমানন্দে স্নান করিতে যাইতেন। শ্রীগৌরচন্দ্র শিষ্যগণকে লইয়া সকলেই আর্দ্রবসনে শচীমা'র কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। শচীমা'র তখন আর আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। তিনি তারাতারি যাইয়া তখনই সকলের জন্য কাপড় লইয়া আসিতেন। শচীমা'র কোন অভাব নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রেমের নিকট অভাব স্থান পায় না। ভাবের পূর্ণতা হইলে সেখানে অভাব থাকিবে কিরূপে? যেখানে অভাব সেখানে ভাব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। নিমাই আসিয়াছে, সঙ্গে বালকগণ আসিয়াছে। সকলের মুখেই মধুর হাসি। নিমাই যদিও মুকুন্দ-সঞ্জয়ের বাড়ী শিষ্যগণের নিকট পরম গম্ভীর পণ্ডিত, কিন্তু শ্রীমায়ের নিকট তিনি সর্ব্বদাই বালক, তখন তিনি পণ্ডিত নহেন। তখন তিনি শচীমা'র দুধের ছেলে—সোণার চাঁদ নিমাই। সকলেই মধুর হাসি হাসিয়া গা মুছিতে থাকেন, আর শচীমা বালকগণের মধুর চাপল্য দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হয়েন। যিনি পরিপূর্ণ ভাবময়, তিনি যখন যে ভাবে থাকেন, তখন সেই ভাবেই তিনি পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণ স্নেহের নিকট তখন তাঁহার সকল গাম্ভীর্য্য, সকল পাণ্ডিত্য লুকায়িত হইয়া যায়। পূর্ব্বে সংবাদ দেন নাই যে, শ্রীগৌরচন্দ্র শিষ্যগণকে লইয়া আসিবেন, কাজেই সকলের আহারের যোগাড় করা হয় নাই। শ্রীমতী তখন ক্ষণবিলম্ব না করিয়া পরমানন্দে আহারের বন্দোবস্ত করিতে যান। মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল যোগাড় হইয়া যায়। শিষ্যগণ আর্দ্রবসন ছাড়িয়া শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া শচীমাকে প্রণাম করেন; শচীমা স্নেহে বিগলিত হইয়া সকলকে 'বাছা' 'সোণা' 'মণি' বলিয়া কত আদর যত্ন করেন। তদনন্তর শিষ্যগণ শ্রীগৌরচন্দ্রকে প্রণাম করেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের সে দিকে লক্ষ্য নাই। তিনি বাড়ী আসিলেই বালকভাবে বিভোর। মায়ের কোলে আসিয়া তিনি আপনাকে একবারে ভুলিয়া যান। শিষ্যগণ ইহার পর যাইয়া গুরুপত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রণাম করেন।

শ্রীমতী তাঁহার প্রাণবল্লভের শিষ্যগণের ভক্তি ও মধুর ভাব দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া যান। তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। তার পর সকলে ভোজন করিতে বসেন। শ্রীমতী পরিবেশন করেন। শচীমা নিকটে বসিয়া বালকগণের ভোজন দর্শন করেন। নিমাইএর বালকভাবের প্রাবল্যে সকলেই সম্পূর্ণ বালকভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তথন তাঁহাদের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ পর্য্যন্ত বড় একটা মনে নাই। সকলেই বালকভাবে পরমানন্দে ভোজন করিতে থাকেন। তথন সে এক অপূর্ব্ব মধুর দৃশ্য হইত। সকলে ভোজনান্তে স্ব স্ব গৃহে গমন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আহার করিয়া বিশ্রাম করিতেন। পরে শ্রীমতী আহারান্তে প্রাণনাথের সন্নিধানে যাইয়া ধীরমধুরবচনে তাঁহার ক্ষোভের কথা জানাইতেন। শ্রীমতী সকলকে বহুবিধ ব্যঞ্জনাদি করিয়া আহার করাইয়াছেন বটে, সকলেই তাহাতে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার ক্ষোভ রহিয়াছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্বে না জানাইয়া সকলকে লইয়া আসিয়াছেন বলিয়া বিবিধ উপচারে তাহাদিগকে থাওয়াইতে পারেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ ইহার উত্তরে বলিতেন যে, ইহাতেই তাহাদের সকলের খুব সন্তোষ হইয়াছে, তাঁহার কোন ক্ষোভের কারণ নাই। তিনি বলিতেন, বিবিধ দ্রব্য দ্বারা কাহারও সন্তোষ সাধন করা যায় না, প্রেমেতেই মানুষের তৃপ্তি হয়। তিনি ও শ্রীমা কত ভালবাসিয়া তাহাদিগকে আহার করাইয়াছেন, তাহাতেই তাহাদের পরমানন্দ হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমতীকে ইহা বলিয়া প্রবোধ দিতেন বটে, কিন্তু দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রীতির প্রাবল্যে ইহাতে একবারে প্রবোধ পাইতেন না। প্রিয়বস্তুর প্রিয় জিনিষ বড়ই প্রিয়। তাঁহার বড় সাধ, প্রাণবল্লভের প্রিয়শিষ্যগণকে তিনি আরও যত্ন করিয়া থাওয়ান। তাই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট আর কিছু না বলিয়া শচীমার নিকট যাইয়া নিবেদন করিতেন। শচীমারও এই বাসনা। বউমার নিকট হইতে

এই কথা শুনিয়া তিনি আরও আনন্দিত হইতেন। তিনি ভাবিতেন, বউমা ত ভালই বলিয়াছে। তাঁহারও ত প্রাণের এই কথা। তিনি নিমাইকে ডাকিয়া বলিতেন, 'বাছা নিমাই, ছেলেদের তুই আর এক দিন নিয়া আসিস্। আজ তাহারা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয় নাই। কালই মন্দ কি? কালই তাদের নিয়ে আসিস্।' নিমাই মায়ের একান্ত বাধ্য ছেলে। আরও তিনি মায়ের ও শ্রীমতীর এত প্রীতি দেখিয়া আনন্দে বিভোর। তিনি মায়ের কথায় স্বীকৃত হইলেন। এইরূপ শচীর আলয়ে নিত্যই নূতন নূতন প্রেমের খেলা পরিলক্ষিত হইত। পাঠকপাঠিকাগণ! আপনারা কৃপা করিয়া একবার মানসনয়নে এই সকল মধুরাতিমধুর মনোমোহন দৃশ্য এক একটী করিয়া দর্শন করুন। দেখিবেন, আপনার নয়ন বাহিয়া প্রেমধারা পড়িতে থাকিবে। আপনার আনন্দের আর অবধি থাকিবে না। শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া আপনার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, পরমপ্রিয় বস্তু। যিনি আপনার প্রিয়, আপনার প্রাণের সামগ্রী, তাঁহার প্রতি কথায়, প্রতি কার্য্যে আপনার আনন্দ হইবে। শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার লীলামাধুরী আপনি আস্বাদন করিয়া দেখুন, দেখিবেন, স্বভাবতঃই আপনার আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে। তখন প্রাণে প্রাণে বুঝিবেন, এই দুইটী বস্তু কিরূপ রসমূর্ত্তি, ইঁহাদের সঙ্গে, ইঁহাদের রসাস্বাদনে আপনার প্রাণে কিরূপ পরমানন্দ হয়!

এখানে একটী কথা লইয়া আমরা বিচার করিব। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রিয় শিষ্যগণকে খাওয়াইয়া সুখ পাইতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে এই সুযোগ দিয়াছিলেন, এবং অপরপক্ষে তাঁহার প্রিয়জনকেও শ্রীমতীর স্নেহ, আদর, যত্ন পাইতে অবসর দিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শিষ্যগণকে লইয়া যে পড়াইতেন, এটীও তাঁহার একটি খেলা বা লীলা; শিষ্যগণ তাঁহার এক প্রকার খেলার সাথী, শ্রীভগবানের এই খেলাকেই

লীলা বলে। ভাগ্যবান্ ভক্ত এই লীলা সন্দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ গোপ নরনারী সকলেরই পরম প্রিয়বস্তু। শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণগতপ্রাণা, কিন্তু তিনি পরনারী, তথাপি তিনি প্রেমের প্রাবল্যে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গতা হন। শাশুড়ী ননদী তাঁহাকে জ্বালা দেন, তথাপি তিনি গোপনে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গমন করেন। গোপনে তাঁহাদের মিলন হয়। এইথানেই বৈষ্ণব গোস্বামিগণ পরকীয়া রতির অবতারণা করেন। বাস্তবিক প্রেমের নিকট স্বকীয় বা পরকীয় ভাব নাই। প্রেম সর্ব্বদাই স্বকীয়। আপনার প্রাণের সামগ্রীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিবে, ইহাই স্বকীয় ভাব। প্রেমের নিকট পরকীয় ভাব স্থান পাইবে কিরূপে? তবে হৈতুকী রতি ও অহৈতুকী রতি মায়াবদ্ধ জীবকে বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা করিলেন। শ্রীরাধা তত্ত্বতঃ শ্রীভগবানেরই হ্লাদিনী শক্তি, কাজেই শ্রীমতীও শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় বস্তু, আর শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমতীর স্বকীয় বস্তু। শ্রীরাধা আদর্শ ভক্ত। প্রত্যেক জীবের নিকটই শ্রীভগবান স্বকীয় বস্তু এবং তত্ত্বতঃ বড় প্রাণের সামগ্রী, কারণ তিনি জীবের আত্মার আত্মা—পরমাত্মা। জীবের মায়ার সংসার আছে বলিয়াই তিনি তাহার নিকট পর বলিয়া প্রতীয়মান হন। শ্রীভগবানে জীবের স্বাভাবিকী রতি সঞ্জাত হইলে বহিরঙ্গ লোকের নিকট এই স্বকীয়া রতিই পরকীয়া রতি বলিয়া প্রতিভাত হয়। জীবও শ্রীরাধার মত ভগবদ্ভক্তি ও প্রেমের প্রাবল্যে সংসারের বাধা অতিক্রম করিয়া মিলনের জন্য ধাবমান হয়। যাহার যে পরিমাণ ভগবানে রতি হইয়াছে, সে সেই পরিমাণে সংসারকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। শ্রীমতী রাধার প্রেম সম্পূর্ণ শক্তিশালী, কারণ তিনি পরিপূর্ণ প্রেমস্বরূপিনী। তাই তিনি সকল বাধা উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যাইয়া মিলিতা হইতেন। তত্ত্বতঃ তাঁহারা নিত্য মিলিত থাকিলেও নরলীলায় শ্রীমতী অতি সাবধানে, অতিশয়

গোপনে গিয়া মিলিত হইতেন। রজনী অধিক হইলেই তাঁহাদের নিকুঞ্জ-বিহার হইত। আর শ্রীভগবানের নবদ্বীপ লীলায়ও আমরা তাহাই দেখিতে পাই; দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পরিপূর্ণ হ্লাদিনী শক্তি; তাঁহারা তত্ত্বতঃ নিত্য মিলিত, তথাপি লীলামাধুর্য্যের নিমিত্ত মানুষভাবে সংসারের অন্তরায় থাকাতে সর্ব্বদা তাঁহারা মিলিত থাকিতে পারিতেন না। জীব-শিক্ষার্থ প্রভু অধ্যাপনা কার্য্য করিতেন, রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পড়াইতেন। তার পর গৃহে আসিয়া শ্রীমতীর সহিত বিলাস করিতেন। এখানেও সংসার উভয়ের মিলনে প্রবল অন্তরায়। তবে নবদ্বীপধামে শ্রীমতী বিষ্ণু-প্রিয়ার প্রেম আরো পরম প্রেমোজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতেন। সুতরাং স্বভাবতঃই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জনকেও ভালবাসিতেন। স্বতঃই তাঁহার সাধ হইত যে, তিনি যাইয়া নন্দমহারাজ ও ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোমতীর সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজ-বালকগণকে লইয়া ক্রীড়া করিতেন, তাঁহাদিগকেও তিনি খাওয়াইতে ও বহুবিধ যত্ন করিতে স্বভাবতঃই আকাঙ্ক্ষা করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা সর্ব্বদা পারিতেন না। কোন কোন সময় মা যশোমতীর গৃহে যাইয়া এই সব করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদা এ সুযোগ ঘটিত না। সকল সময় তিনি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেন না। এখানে শ্রীল রামানন্দ ও শ্রীপ্রভুর সহিত কথোপকথনের মধ্য হইতে একটী কথা বলি। শ্রীপ্রভু রামরায়কে বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি রাসস্থলীতে শ্রীরাধার অনুরাগে গোপীগণকে সাক্ষাৎ ত্যাগ করেন, তবেই শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ আছে এইরূপ বুঝা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধাকে গোপীগণের অগোচরে লইয়া গেলেন। কিন্তু শ্রীপ্রভু রামরায়কে বলিলেন যে, অন্যাপেক্ষা হইলে সেখানে প্রেমের গাঢ়তা স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। শ্রীপ্রভু কেবলমাত্র

রসাস্বাদনের নিমিত্ত রামরায়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীল জয়দেব শ্রীমদ্ভাগবতের পরিশিষ্ট শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে পূর্ব্বেই ইহার সমাধান করিয়া গিয়াছেন। সকলেই জানেন এই গীতগোবিন্দ অপ্রাকৃত গ্রন্থ। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণলীলা সন্দর্শন করিয়া রসাবেশে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ইহাও সকলে জানেন যে, ইহার মধ্যে 'দেহি পদপল্লবমুদারং' যে শ্লোক আছে, সেই শ্লোকটী জয়দেব গোস্বামী স্নান করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া পূর্ণ করেন। এই গ্রন্থ অবলম্বনেই রামরায় প্রভুকে প্রবোধ দিলেন ও রসের বিস্তার করিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সুবিখ্যাত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীপ্রভুর প্রশ্নে রামরায় বলিলেন যে, শতকোটী গোপী সঙ্গে যখন রাসবিলাস হইল, তখন এক মূর্ত্তি শ্রীরাধার পার্শ্বে বর্ত্তমান রহিলেন। শ্রীরাধা সাধারণ প্রেমে সর্ব্বত্র সমতা দেখিয়া বাম্যভাব অবলম্বন করিলেন তখন তিনি ক্রোধ করিয়া মানভরে রাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার আর রাসলীলা বাসনা পূর্ণ হইল না। তিনি গোপীগণকে সাক্ষাতে ত্যাগ করিলেন। রামরায় বলিলেন, শতকোটী গোপিকার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহার পরিপূর্ণ প্রেমমূর্ত্তি শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে যখন তিনি মিলিত হইলেন, তখন তাঁহার প্রেমের মিলন পূর্ণ হইল। রামরায়ের কথা শুনিয়া শ্রীপ্রভু বড় সন্তুষ্ট হইলেন। যাহা হউক, আমরা এখানে দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীমতীর পরিপূর্ণভাবে মিলনে গোপিকাগণের আত্মসুখ-বাঞ্ছামিশ্রিত যে প্রেম অন্তরায় ছিল, শ্রীরাধা তাহা অবাধে অতিক্রম করিলেন। এখানে গোপীগণেরও প্রেম ছিল, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকেই চাহিয়াছিলেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে একটু আত্মসুখবাঞ্ছাও ছিল, একটু অভিমান ছিল। তাই তিনি সহজে এ বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতা হইয়া গোপীগণকে অনুগতা করিয়া তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ প্রেম প্রদান করিলেন। কিন্তু সংসাররূপ যে প্রবল বাধা ছিল, তাহাতে শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা মিলিত হইতে দিত না। তিনি সহজে সে সকল বাধা অতিক্রম করিতে পারিতেন না। ব্রজেশ্বরী মা যশোমতীর গৃহে যাইয়া তিনি নিত্য বিরাজ করিতে পারিতেন না। এমন কি তিনি যখন গোপনে রজনাযোগে কুঞ্জে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতা হইতেন, তখনও কোন কোন দিন আয়ান যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইতেন। কাজেই শ্রীমতী লাঞ্ছিত হইবেন এই ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে পারিতেন না, তিনি কালীমূর্ত্তি ধারণ করিতে বাধ্য হইতেন, আর শ্রীরাধার সেখানে শ্রীকালিকাদেবীর সেবিকারূপে বিরাজ করিতে হইত। শ্রীরাধার আর তখন প্রেমের খেলা দেখা যাইত না। তাঁহার প্রেমের প্রাবল্যে শ্রীকৃষ্ণকে কালীরূপে পরিণত করিতেন এবং তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম কালীভক্তিরূপে পরিণত হইয়া যাইত বটে, কিন্তু তাঁহার প্রেমে আয়ানকে কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারিত না। আয়ান যে কালীভক্ত, সেই কালীভক্তই থাকিয়া যাইতেন। তিনি যে ঐশ্বর্য্যের সেবা করিতেন, আয়ান শ্রীভগবানের যে ঈশ্বরভাবের পূজা করিতেন, সেই ঈশ্বরভাবই রহিয়া যাইত, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যে পরিণত হইয়া যাইত না। আয়ান আর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাইতেন না। এখানে অন্যাপেক্ষায় প্রেমের গাঢ়তা স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইল না। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতি সম্বন্ধে এইরূপ সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, সর্ব্বদাই তাঁহার লুকোচুরি করিতে হইয়াছে। অন্যাপেক্ষায় প্রেমের গাঢ়তা স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু আমরা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে দেখিতে পাই যে, এখানে প্রেমের গাঢ়তা পরিপূর্ণরূপে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি না জানিয়া না শুনিয়া প্রথম হইতেই স্বতঃই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন পরপতি—শ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্বামী। লক্ষ্মীদেবী

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণরূপে বিহার করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাধুর্য্যের মূর্ত্তি রসময় বিগ্রহ যাহা ঐশ্বর্য্যের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, তাহা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। হিন্দুর ঘরের মেয়ে। স্বয়ম্বরপ্রথা প্রচলিত নাই। নিজের অভিমতানুরূপ পতিগ্রহণ করিবার ভার তাঁহার উপর কখনই পড়িবে না, তিনি তাহা জানেন। তথাপি তিনি নির্ব্বিচারে স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরেরই পরিপূর্ণ হ্লাদিনী শক্তি, সুতরাং তাঁহার এই স্বাভাবিকী রতি বাস্তবিক পক্ষে স্বকীয়া; কিন্তু বহিশ্চক্ষুর নিকট শ্রীগৌরচন্দ্র তখনো পরপতি বলিয়া শ্রীমতীর এই স্বকীয়া রতিই পরকীয়া রতি বলিয়া অভিহিত করা যায় এবং শ্রীগৌরচন্দ্র লীলা করিয়া দেখাইলেন যে, শ্রীমতীর এই প্রেমের প্রাবল্যে ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি লক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিত হইলেন—তিনি শ্রীগৌরচন্দ্রের দেহে মিশিয়া গেলেন, অথবা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরালে যাইয়া লুক্কায়িত রহিলেন এবং শ্রীমতীর পিতামাতা পরিজন লইয়া যে সংসার, সেই সংসারে উভয়ের মিলন ব্যাপারে বাধা জন্মাইবার যে আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া গেল এবং নিমাই পণ্ডিত যে অত বড় পণ্ডিত, তিনি সর্ব্বত্রই অতিশয় সমাদৃত, তাঁহার মাতা তাঁহাকে অন্যত্র বিবাহ করাইলেও করাইতে পারিতেন, এই যে আশঙ্কা ও প্রবল অন্তরায় ছিল, তাহাও অচিরে বিদূরিত হইল। শ্রীমতীর প্রেমের প্রাবল্যেই সেই শচীমাতা স্বয়ংই শ্রীমতীকে গৃহে নেওয়ার জন্য অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীরাধার প্রেমে তাঁহার নিজেরই যোগাড়যন্ত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে যাইতে হইত; কিন্তু দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রগাঢ় প্রেমের এতই প্রবল শক্তি যে, ইহা অলক্ষ্যে ক্রিয়া করিল। তিনি শুধু প্রাণে প্রাণে ভালই বাসিতেন, আর কোন চেষ্টা করিতেন না। যখন তাঁহার প্রেমের গাঢ়তা পরিপূর্ণতা

প্রাপ্ত হইল, তখন সকলই তাঁহার প্রেমের অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। পিতা মাতা পরিজন এবং ওদিকে শচীমাতা সকলেই তাঁহার শ্রীগৌরচন্দ্রের সহিত মিলনে সহায়তা করিলেন। এই মিলন আবার গোপনে হইল না, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে বাজনা বাজাইয়া এই মিলন ব্যাপার ঘোষণা করা হইল। আবার শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীরাধা তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনকে সেবা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন নাই; যদিও বা কখনো তিনি তাঁহাদের সেবা করিতেন, তাহাও অতি ভয়ে ভয়ে ও অতিশয় সঙ্কোচের সহিত। আর এখানে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমে দেখিতে পাই, তিনি নিঃসঙ্কোচে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার প্রাণনাথ ও তাঁহার নিজজনকে সেবা করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, ব্রজপ্রেম নদীয়াতে আরো উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, শ্রীমতী রাধার প্রেমকে খর্ব্ব করা আমাদের উদ্দেশ্য। এরূপ কেহ মনে করিলে আমরা বড় দুঃখিত হইব। শ্রীরাধা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া একই বস্তু। যিনি যশোদানন্দন তিনিই শচীসুত। সময়োপযোগী মাধুর্য্য বিস্তারের নিমিত্ত এক এক সময় তিনি এক এক লীলা করিলেন, ইহাই পার্থক্য। দ্বাপরযুগে শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীরাধা দ্বারা যাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক, তাহাই তিনি করিয়াছেন। আবার ক্রমোৎকর্ষই স্বভাবের রীতি, শ্রীভগবানেরই ইহা নিয়ম। তাই তিনি সেই একই বস্তু শ্রীমতী রাধাকে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে প্রকাশ করিয়া ব্রজরস আরো উজ্জ্বল করিয়া জীবের নিকট উপস্থিত করিলেন, এবং ইহা সর্ব্বতোভাবে জীবের গ্রহণযোগ্য করিয়া দিলেন।

আর এক কথা। শ্রীমতী রাধা আদর্শ ভক্ত। তিনি ভক্ত মুকুটমণি। তিনি ব্রজধামে সর্ব্বদা দুঃখ করিতেন যে, তিনি পরনারী। তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণ-গৃহিণী হইতেন তাহা হইলে তাঁহার সকল সাধ পূর্ণ হইত।

তিনি তাঁহার ক্রীড়ার সহচর বালকবৃন্দকেও খাওয়াইতে পারিতেন এবং মা যশোমতীরও সেবা শুশ্রূষা করিয়া ধন্য হইতে পারিতেন। শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল। তিনি সকল ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেন। আর এই আদর্শ ভক্ত শ্রীরাধার বাসনাই বা পূর্ণ করিবেন না কেন? তাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই ভাবে শ্রীমতী রাধিকার বাসনা পূর্ণ করিলেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমাতিশয্যের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তিনি যখন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ভুবনমোহন রূপে মুগ্ধ হইলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের মাধুর্য্যের ভাব পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইল এবং তাঁহার প্রেমের এতই প্রবল শক্তি যে, তিনি অপরকে গৌরপ্রেম প্রদান করিলেন। তিনি কেবল মাত্র একাকী গৌররূপে ও তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইলেন না, অন্যান্য সকলকেই মুগ্ধ করিলেন, তাহার প্রেমের প্রগাঢ়তায় সকলেই গৌরপ্রেম প্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণলীলা ও গৌর-লীলা ধীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার প্রভাবে গোপীবল্লভ হইহেন, সংসার-বল্লভ হইলেন না; সংসার দূরে পড়িয়া রহিল,—সংসার শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারিল না। গোপী বস্তুটী কি? না, যিনি সংসার ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণান্তিকে গেলেন, তিনিই গোপী। শ্রীরাধা-প্রেম জীবকে কি শিখাইল? না, শ্রীভগবানের প্রতি জীবের প্রেম কিরূপ প্রগাঢ় হইলে সে সংসারকে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হয়, সংসারের সকল ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবমান হয়। আর নবদ্বীপে সেই বৃন্দাবন লীলাই উন্নতোজ্জলরূপে যখন প্রকাশিত হইল, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমাধিক্যে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সর্ব্বজনবল্লভ হইলেন। তিনি নিজে যেরূপ শ্রীগৌরাঙ্গকে বল্লভ করিলেন, তাঁহার প্রাণনাথকে সেইরূপ সংসারেরও বল্লভ করিলেন, সংসার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত হইল, অর্থাৎ, যে মায়া ভগবৎ

প্রেমের প্রধান অন্তরায়, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমের নিকট সেই মায়া পরাজয় স্বীকার করিয়া দূরে পলায়ন না করিয়া প্রেমের অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। অথবা সহজ কথায় আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, শ্রীমতী মায়াকে কৃপা করিয়া স্বীয় চরণতলে স্থান দিলেন—মায়িক জীবের নিকট ভগবৎ প্রেমের পন্থা খুলিয়া দিলেন; জীব মায়ার মধ্যে থাকিয়াও প্রেম পাওয়ার মহাসুযোগ প্রাপ্ত হইল। ক্রমেই আমরা শ্রীমতীর প্রেমের ঔজ্জ্বল্য ও বিশাল জগতে ইহার বিস্তৃতি লক্ষ্য করিব।

(১৩)

নদীয়ানাগর নবীনকিশোর মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নবদ্বীপময়ী নবীনকিশোরী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব রূপের হাট খুলিয়া দিয়াছেন অবধি নদীয়ানাগরীগণের আনন্দের আর অবধি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রূপমাধুরী কিরূপ হৃদয়োন্মাদক দেখুন। কোন নাগরী সুরধুনী তীরে জল আনিতে যাইয়া গৌররূপ দর্শন করিয়া একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন—

গৌরাঙ্গরূপে আমার প্রাণ নিলগো নিল।
গৌররূপে আমার নয়ন ভুলিয়া রইল।
(সই গো) চল যাই সুরধুনী কুলে যেখানে গৌরাঙ্গ মিলে
আমার একুল সেকুল দুকুল গেল
কি হ'ল কি হ'ল
আমার প্রাণ নিল গো নিল।

আমাদের এতদঞ্চলে অনেকে এইরূপ গান গাহিয়া থাকেন। এইরূপ আরো কত পদ আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যকাল হইতেই তাঁহার রূপমাধুরীতে নদীয়াবাসী মুগ্ধ; তথাপি মায়ার প্রচ্ছন্নতায় অনেকে তাঁহাকে ধরিতে পারেন

নাই। কিন্তু কিশোর গৌরাঙ্গের রূপমাধুরীতে নাগরীগণ যখন বিশেষ-রূপে আকৃষ্ট হইলেন, তখন শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহাদের কাছে আর লুকাইতে পারেন নাই। রূপেতে সকলেই আকৃষ্ট। তবে কঠিনহৃদয় পুরুষের মন কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত বলিয়া তাঁহারা অনেকেই তাঁহাকে ধরিয়াও ধরিতে পারেন নাই। তাঁহারাই আবার মহাপ্রকাশের পর ঐশ্বর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীপ্রভুকে চিনিলেন এবং পরে তাঁহার নিত্যরূপমাধুরী দেখিয়া ভুলিলেন। কিন্তু সরলহৃদয় নাগরীগণের অবস্থা ইহার বিপরীত। নবীনকিশোর গৌরাঙ্গচাঁদের রূপ দর্শনে তাঁহারা ভুলিয়া গিয়া এক-বারে বিকাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়খানি শ্রীগৌরাঙ্গ একবারে দখল করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের আর বিচার করার অবসর রহিল না। পাঠক পাঠিকাগণ! আপনারাও একবার ভাবিয়া দেখুন, সারা বিশ্বে যে অনন্ত রূপের বিলাস দেখিতে পাইতেছেন, সকল জগত ব্যাপিয়া যে রূপের ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে, যে রূপের কণিকা পাইয়া জগত মুগ্ধ হইতেছে, সেই অনন্ত রূপের কেন্দ্র শ্রীভগবান্ সকল রূপরাশি লইয়া যখন নদীয়াপুরে অবতীর্ণ হইলেন, তখন নাগরীগণের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল। আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন, আপনা-দেরও ইহাতে লোভ হইবে, এবং এখন যে সেই রূপবান্ পরম পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অপ্রকট হইয়াছেন, অর্থাৎ নয়নের অন্তরালে যাইয়া লুকাইয়া রহিয়াছেন, তথাপি সেই রূপময় শ্রীভগবানের রূপ-লাবণ্য দর্শন করিবার জন্য আপনাদের হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। আপনাদেরই যখন এই অবস্থা, তখন সেই ভাগ্যবতী নদীয়াবাসী কুল-ললনাগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিয়া কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। নাগরীগণ সুরধুনীতে স্নান করিতে যাইতেন, আবার বিকালবেলা জল আনিতে যাইতেন,

শ্রীগৌরচন্দ্রও সুরধুনীতে স্নান করিতেন এবং বিকালবেলা নগর ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, কখন বা তিনি বিকালে সুরধুনীতীরে দাঁড়াইয়া গঙ্গার মাধুরী অবলোকন করিতেন ; তাই নাগরীগণ এই সুযোগে নদীয়ানাগরের ভুবনমোহান রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিতেন। আবার বাড়ীতে আসিয়া সাত পাঁচ সখী মিলিত হইয়া এই গৌররূপ বর্ণনা করিতে করিতে সেই সঙ্গে মানস নয়নে আবার রূপখানি দর্শন করিয়া লইতেন। গৃহকর্ম্মাদি তাঁহারা করিতেন বটে, কিন্তু মন থাকিত শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে। গৃহকর্ম্মের মধ্যেও মাঝে মাঝে তাঁহাদের নয়ন দিয়া প্রেমধারা বহিতে থাকিত ও এই রূপখানি দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহারা মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেন। আবার গৃহকর্ম্মাদি সমাপনান্তে প্রতিবেশী নাগরীগণ পরস্পর মিলিত হইয়া অন্যোন্যে আলাপ করিতেন। কোন নাগরী বলিতেন, "সখি, গোরাচাঁদের শ্রীঅঙ্গের কি মধুর লাবণ্য, যেন শতধারে অবনী বহিয়া যায়। আহা কি মধুর হাস! হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মূর্চ্ছা পায়। সখিরে, কি ক্ষণে সেই নাগরবর দেখিতে পাইলাম, দেখিয়াছি অবধি যে ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িলাম। আমার চিত্ত যে সদাই ব্যাকুল হইতেছে। সখিরে! বুঝিতে পারি না, কেন যে সে রূপদর্শন অবধি আমার নয়ন বাহিয়া অবিরলধারে অশ্রু পড়িতেছে। প্রাণ-সজনি রে! নাগরবর যে গমন করেন, সে ত গমন নয়! সে যে নৃত্য! শ্রীঅঙ্গ দোলাইয়া দোলাইয়া যখন নাগররাজ নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া যায়, আর বঙ্কিম নয়নে চায়, তখন যেন প্রাণ সহিত কাড়িয়া লইতে চায়। তাহার গলে মালতীর মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা। সকলই যে মধুর! সখি রে! মধুরের সকলই মধুর! সজনি লো! লোকলাজে যে কিছু কহিতেও পারি না, আর ঘরেও যে মন টিকে না। এখন উপায় কি করি!" যথা পদ—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়া যায়,
ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গ হিল্লোলে, মদন মূরছা পায়।
কিবা সে নাগর কিথণে দেখিনু, ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়কুল, কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষে বিষম বিশিখে, পরাণ বিঁধিতে চায়॥
মালতী ফুলের মালাটী গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে।
উঠিয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোটার ছটা, লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে পশল, না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে, দাস গোবিন্দ কয়॥

শ্রীগোবিন্দদাস বলিতেছেন, 'এই কুলমজান রূপ দেখিয়া না জানি কুলবালাগণের আরো কি হয়।'

শ্রীগৌরাঙ্গ সাধারণ নায়ক নহেন; তিনি পরমপুরুষ, অনন্ত রসবিগ্রহ; তাহা না হইলে কুলবালাগণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া ভুলেন কেন? আবার দেখুন, নাগরীগণ যে কেবলমাত্র সুরধুনী কুলে তাঁহার দর্শন পাইতেন এবং বাড়ীতে আসিয়া গৌররূপ বর্ণনা করিতে করিতে মানস-নয়নে আবার সেই রূপ দর্শন করিতেন তাহা নহে; শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহাদের নিকট আসিয়া আরো অদ্ভুতরূপে উদিত হইতেন, ইহা মানববুদ্ধির অগোচর; ইহা একমাত্র পরিপূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরেই সম্ভবপর, অন্যত্র নহে। কোন নাগরী শ্রীগৌরচন্দ্রের রূপসুধা পান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন, আসিয়া যখন বেশভূষা করিবার জন্য দর্পণ লইয়া বসিয়াছেন, তখন দেখিতেছেন দর্পণের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের

মুখচন্দ্রমা প্রতিফলিত হইয়াছে, দেখিতে পাইলেন তাঁহার মুখপার্শ্বে গোরা-মুখচাঁদ বিরাজ করিতেছে ; দেখিতে দেখিতে নাগরীর প্রেমতরঙ্গ বাড়িয়া উঠিল, অশ্রুপুলকাদি সব সাত্ত্বিকভাব উপস্থিত হইল, তাঁহার অঙ্গ অবশ হইয়া গেল, দর্পণখানি নাগরীর হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। এইরূপে শ্রীনাগরীগণ অসাক্ষাতেও শ্রীগৌরাঙ্গের বাহুস্পর্শরস আস্বাদন করিয়াছেন এখন ভাবুন শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু ! পদটী দেখুন—

যতিখনে গোরারূপ আইনু হেরি।
সাজন মুকুর আনলু ততবেরি।
সখি হে সব সোই আনলু অনুপ।
ইথে লাগি মুকুরে হেরল নিজ মুখ॥
তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ।
উয়ল দরপণে গোরামুখ চন্দ॥
মঝুমুখ সো মুখ যব ভেল সঙ্গ।
কিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেমতরঙ্গ॥
উপজল কম্প নয়নে বহে লোর।
পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর॥
করইতে আলিঙ্গন বাহু পশারি।
অবশে আরশি করে খসল হামারি॥
বহুত পরশরস অদরশ কেলি।
গোবিন্দ দাস শুনি মুরছিত ভেলি॥

এই যে উপরে শ্রীগোবিন্দদাসের পদের কথা বলা হইল, ইনি শ্রীপ্রভুর সমসাময়িক লোক। ইঁহার নাম শ্রীগোবিন্দ ঘোষ। ইহারা তিন ভাই —গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্টে। ইঁহারা যাইয়া প্রথমে কুমারহট্টে বাস করেন, পরে শ্রীগৌরাঙ্গের সংবাদ পাইয়া

নবদ্বীপে আগমন করেন এবং সেই খানেই বসতি করিতে থাকেন। ইঁহারা পরম ভাগবত—প্রভুর অতি নিজজন। ইঁহাদের মধ্যে বাসুঘোষ ব্রজের গুণতুঙ্গা সখী ছিলেন। প্রভুর মহাপ্রকাশের পূর্ব্বেই ইঁহারা শ্রীপ্রভুকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহারা উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন, ইঁহাদের সঙ্গীতে শ্রীপ্রভু বড় আনন্দ পাইতেন। শ্রীপ্রভুর সন্ন্যাসের পর ইঁহারাও নীলাচলে গমন করেন; পরে মাধব ঘোষ দাইহাটা ও বাসুঘোষ তমলুকে যাইয়া বসতি করেন; আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে যাইয়া গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। গোবিন্দ ঘোষের পাট অগ্রদ্বীপে যাইয়া অদ্যাপি বহুভক্ত গোপীনাথ দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছেন। এই গোপীনাথের সেবা কিরূপে প্রকাশ হইল বলিতেছি। সন্ন্যাসের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিয়া বৃন্দাবন গমন করিবেন, এই মনস্থ করিয়া নীলাচল হইতে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে বহু ভক্ত ছিলেন। গোবিন্দও সেই সঙ্গে ছিলেন, পথে একগ্রামে ভিক্ষা-গ্রহণের পর শ্রীগৌরাঙ্গ মুখশুদ্ধি চাহিলেন। গোবিন্দ দৌড়িয়া যাইয়া ভিক্ষা করিয়া হরিতকী আনিয়া শ্রীপ্রভুকে দিলেন। পরদিন অগ্রদ্বীপে আসিয়া ভোজনান্তে আবার শ্রীগৌরাঙ্গ যখন মুখশুদ্ধি চাহিলেন, তখন আবার শ্রীগোবিন্দ প্রভুকে হরিতকী দিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব দিনের মত আর দেরী হইল না। প্রভু ইহা দেখিয়া গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ, কাল মুখশুদ্ধি চাহিলাম, আর দিতে দেরী হইল; কিন্তু আজ চাহিবামাত্র মুখশুদ্ধি কোথা হইতে দিলে?" গোবিন্দ বলিলেন, "প্রভু, কাল গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিতে দেরী হইয়াছিল; এইরূপ দেরী হইলে আপনার কষ্ট হইবে মনে করিয়া কয়েকটী হরিতকী বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই আজ আপনাকে দিয়াছি।" প্রভু বলিলেন, "গোবিন্দ, এখনো তোমার সঞ্চয়বাসনা রহিয়াছে! তুমি

এইখানেই থাক। আমার সঙ্গে আর আসিও না।" গোবিন্দ ইহাতে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, তাঁহার দুঃখের আর অবধি রহিল না। প্রভুর কি অপূর্ব্ব লীলা! আত্মসুখের নিমিত্ত নহে—প্রভুরই সেবার জন্য তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি শ্রীপ্রভুর সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলেন! কিন্তু এই লীলাভঙ্গীর কি উদ্দেশ্য, প্রভু স্বয়ং তাহা প্রকাশ করিলেন। গোবিন্দের বিষাদ দেখিয়া শ্রীপ্রভু বলিলেন, "গোবিন্দ, তুমি দুঃখ করিও না। আমারই ইচ্ছায় তোমার সঞ্চয়বাসনা হইয়াছে। তোমার ইহাতে বিন্দুমাত্র দোষ নাই। তোমাদ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, তাই তোমার হৃদয়ে আমি এই বাসনার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছি। জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তোমার এই বাসনা একটী ছল মাত্র। তুমি বিবাহ করিয়া এইখানেই বসতি কর।" শ্রীপ্রভুর ইচ্ছায় গোবিন্দ ঘোষ এইখানেই রহিয়া গেলেন। পরে একদিন তিনি স্নানের সময় দেখিতে পাইলেন, একটী জিনিষ আসিয়া তাঁহার গায়ে লাগিতেছে। গোবিন্দ ইহাকে শবদাহের কাষ্ঠবোধে যতই ঠেলিয়া দিতে লাগিলেন, ততই উহা পুনঃ পুনঃ তাঁহার গায়ে ঠেকিতে লাগিল। তখন তিনি দেখিলেন যে, উহা কাষ্ঠ নহে, একখানি ভারী প্রস্তরখণ্ড। গোবিন্দ যত্নে উহা তীরে উঠাইয়া রাখিলেন। তারপর তিনি আদিষ্ট হইলেন যে, একজন ভাস্কর আসিয়া উহা হইতে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিবে, তিনি যেন পুত্রবোধে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন। সত্য সত্যই তারপর দিন ভাস্কর আসিয়া শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিয়া গেল। গোবিন্দ সেবা করিতে লাগিলেন। সময়ে তাঁহার একটী পুত্রসন্তান হইল, ইহাতে গোবিন্দের স্নেহ দুইভাগ হইয়া গেল। দ্বিধাবিভক্ত মন লইয়া তিনি গোপীনাথের সেবা আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগের সহিত করিতে পারিলেন না। গোপীনাথের সেবা

করিতে যাইয়া পুত্রের কথা ভাবিতেন, আবার পুত্রের সেবা করিতে যাইয়া গোপীনাথের কথা ভাবিতেন। এমন কি পুত্রের দ্রব্য গোপীনাথকে দিতেন, আবার গোপীনাথের দ্রব্য পুত্রকে প্রদান করিতেন। গোপীনাথ তখন একটী রঙ্গ করিলেন। তিনি পুত্রটীকে হরণ করিয়া লইলেন। গোবিন্দ গোপীনাথের উপর রাগ করিলেন। মানভরে তিনি আর গোপীনাথের সেবা করিলেন না। নিজেও না খাইয়া পড়িয়া রহিলেন। তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, 'উঠ, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে খাবার দাও।' গোবিন্দ বলিলেন 'তোমাকে সেবা করার ফল বুঝি এই হইল ?— তুমি পুত্রটিকে হরণ করিয়া লইলে ?' গোপীনাথ বলিলেন, 'যাহার একপুত্র মরে, সে বুঝি অন্য পুত্রকে না খাওয়াইয়াই মারিয়া ফেলে। আমার যে ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে।' গোবিন্দ বলিলেন, 'ইহা তোমার কথার কথা। তুমি যে পুত্র তাহা বুঝি কিসে ? তুমি কি পুত্রের কার্য্য করিবে ? পুত্র পিতার শ্রাদ্ধ করে। তুমি কি আমার শ্রাদ্ধ করিবে ?' গোবিন্দ গোপীনাথকে নিরস্ত করিবার জন্যই এই কথা বলিলেন। শ্রীভগবান্ ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শন কবিবেন, তাই গোবিন্দের মুখ দিয়া এই কথা বাহির করিলেন, আর গোপীনাথও তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকার করিলেন যে, তিনি গোবিন্দের দেহত্যাগে পুত্রের ন্যায় পিণ্ডদান করিবেন। তখন গোপীনাথ মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, আমি যখন তোমার পুত্র, তখন পুত্রের কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিব, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? তুমি উঠ, আমাকে শীঘ্র খাবার দাও। ক্ষুধায় যে আমার প্রাণ যায় !" গোপীনাথের কথায় ও মধুর 'বাবা' শব্দে গোবিন্দের স্নেহ শতধারে উছলিয়া উঠিল। গোবিন্দ উঠিলেন, উঠিয়া আবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনুরাগের সহিত গোপীনাথের সেবা করিতে লাগিলেন। তার পর বাস্তবিকই শ্রীগোবিন্দ ঘোষের দেহত্যাগে যথাসময়ে শ্রীগোপীনাথ পীতবসন ছাড়িয়া কাচা পরিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে

শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি প্রতি বৎসর ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে অগ্রদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ কর্ত্তৃক এই শ্রাদ্ধলীলা সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং যখন গোপীনাথের শ্রীহস্ত হইতে পিণ্ডটী পড়িতে থাকে, তখন ভক্তগণ শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য দর্শন করিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন না। বৈষ্ণবের এই সব লৌকিক কর্ম্মাদি নাই বটে, তবে শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শন করাই এই লীলার উদ্দেশ্য।

যাহা হউক, আমরা ঘোষ ঠাকুরের জীবনী হইতে দেখিতে পাই, তিনি কিরূপ উচ্চস্তরের ভক্ত ছিলেন এবং শ্রীভগবান্ তাঁহাদ্বারা কি লীলা প্রকাশ করিলেন। আমরা ইহা হইতে দেখিতে পাই যে, গোবিন্দ ঘোষ বাৎসল্যরসে অভিভূত ছিলেন। তবে যে তিনি নবদ্বীপ থাকার সময় নাগরীগণের ভাব বর্ণনা করিয়া পদ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার তটস্থ অবস্থায় লেখা হইয়াছে। তটস্থ অবস্থায় থাকিয়া তিনি গৌররূপদর্শনে নাগরীগণের যে অবস্থা দেখিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঐতিহাসিকভাবে তাঁহার কথা সর্ব্বথা প্রামাণ্য। তিনি ঘোষবংশজ ছিলেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত দীনতাবশতঃ আপনাকে দাস বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাই তাঁহার পদের ভণিতায় 'গোবিন্দদাস' দেখিতে পাই। ইনি যে প্রধান পদকর্ত্তা ও প্রধান গায়ক ছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

মাধব ও বাসুঘোষ দুই ভাই চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন। বাসুঘোষের পদেও অমৃতবর্ষণ করে। আর একজন প্রধান পদকর্ত্তা আছেন, তাঁহার নাম শ্রীনরহরি দৈব সরকার। ইনি সাধারণতঃ সরকার ঠাকুর বলিয়া পরিচিত। ইঁহার বাড়ী শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ড বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে অদ্যাপি মহোৎসব ও বৈষ্ণব-সম্মিলন হইয়া থাকে। এই নরহরি সরকার ঠাকুর ব্রজের মধুমতী সখী ছিলেন। ইনি

শ্রীপ্রভুর অবতীর্ণ হওয়ার সাত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও প্রভুর সমসাময়িক লোক। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অতিশয় প্রামাণ্য। ব্রজধামের সখীবৃন্দ বৃন্দাবন-লীলায় উজ্জ্বলরস আস্বাদন করিয়া পরে শ্রীগৌরচন্দ্রের সঙ্গে নবদ্বীপে আসিয়া উন্নতোজ্জ্বলরস আস্বাদন করেন ও আপনারা আস্বাদন করিয়া অপরকেও এই রস আস্বাদন করাইলেন। ইঁহার পদাবলী পাঠেও ভক্তের প্রাণে অপূর্ব্ব প্রেমরস সিঞ্চিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায় আমরা আর একটী রঙ্গ দেখিতে পাই। এই যে ব্রজসখীগণের কথা বলা হইল, ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে অপার ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ও অনন্তভুবনের অধিপতি বলিয়া বুঝিবার নিমিত্ত মহাপ্রকাশের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন না। ইঁহারা পূর্ব্বেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্বীয় প্রাণপতি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন ও চিনিতে পারিয়া প্রাণ, মন সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরচন্দ্রের ভুবনমোহন রূপমাধুরীদর্শনে শ্রীনদীয়ানাগরীগণের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, ইঁহারা তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করিয়াছেন, দর্শন করিয়া তখন তখন তাহা পদে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাই ঐতিহাসিকভাবেও ইঁহাদের পদনিচয় অতি বহুমূল্য সামগ্রী। আর সরকার ঠাকুর যে পদ লিখিয়াছেন, তাহা অমৃত হইতেও অমৃত—পরমামৃত। আর এই পদসমূহে স্তরে স্তরে ভাবময়ী শ্রীনবদ্বীপদেবীগণের ভাবাবলী তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। রসলিপ্সু পাঠকপাঠিকাগণ! এখন আসুন, আমরা শ্রীল বাসুঘোষ, শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া শ্রীনবদ্বীপ দেবীগণের অনুগত হইয়া নদীয়ার মধুর রস আস্বাদন করি।

যিনি সুন্দর, তাঁহার সকলই সুন্দর—সুন্দরের সকলই সুন্দর। শ্রীগৌরসুন্দর সুরধুনীর ঘাটে যখন যাইতেন, তখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গ দিয়া অপূর্ব্ব রূপমাধুরী বিচ্ছুরিত হইত—সুরধুনী জলে যেন বিদ্যুৎ খেলিতে

থাকিত। আবার যখন তিনি তীরে উঠিয়া গামছা লইয়া শ্রীঅঙ্গ মুছিতেন, তখন তাঁহার আর এক নূতন মাধুরী খেলিত। নদীয়ানাগরীগণ ইহা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। বাসুঘোষ কি বলিতেছেন শুনুন—

আর একদিন, গৌরাঙ্গসুন্দর,
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে।
কোটীচাঁদ জিনি, বদনসুন্দর,
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
অঙ্গ ঢল ঢল, কনক কষিল,
অমল কমল আঁখি।
নয়নের শর, ভাঙ ধনুবর,
বিধয়ে কামধানুকী॥
কুটিল কুন্তল, তাহে বিন্দুজল,
মেঘে মুকুতার দাম।
জলবিন্দু তল, হেমমোতি জনু,
হেরিয়া মূরছে কাম॥
মোহে সব অঙ্গ, নিঙ্গাড়ি কুন্তল,
অরুণ বসন পরে।
বাসুঘোষ কয়, হেন মনে লয়,
রহিতে নারিবে ঘরে॥

ইহা দেখিয়া নাগরীগণের কি অবস্থা হইল দেখুন।

আহা মরি মরি, সই, আহা মরি মরি।
কি ক্ষণে দেখিলুঁ গোরা, পাশরিতে নারি॥

গৃহকাজ করিতে তাহে থির নহে মন।
চল দেখি গিয়া গোরার ও চাঁদবদন॥
কুলে দিলুঁ তিলাঞ্জলি ছাড়ি সব আশ।
তেজিলুঁ সকল সুখ-ভোজন-বিলাস॥
রজনী দিবস মোর মন ছন ছন।
বাসু কহে গোরা বিনু না রহে জীবন॥

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রেমফাঁদে পড়িয়া নাগরীগণের গৃহকর্ম্মাদি আর ভাল লাগে না। কুলশীলে তিলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য বাহির হইতে চাহিতেছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গই প্রাণধন। কুলশীল আদি সকলই দৈহিক বন্ধন, সুতরাং এদিকে আর তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িবে কেন? তাই কোন নাগরী বলিতেছেন,—

যখন দেখিনু গোরাচাঁদে। তখনি পড়িলুঁ প্রেমফাঁদে॥
তনুমন তাঁহারে সঁপিলুঁ। কুলভয়ে তিলাঞ্জলি দিলু॥
গোরা বিনু না রহে জীবন। গৌরাঙ্গ হইল প্রাণধন॥
ধৈরজ না বাঁধে মোর মনে। বাসুদেব ঘোষ রস জানে॥

প্রাকৃত রূপ দর্শনেই যখন মানবমন অস্থির হয়, তখন শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নবীন রূপমাধুরী দর্শনে যে কুলবালাগণ অথির-হৃদয় হইবেন ও তাহা নিত্যই দর্শন করিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ আই ঢাই করিবে, ইহা ত নিতান্তই স্বাভাবিক। শ্রীগৌরাঙ্গের এই রূপ-মোহে আবিলতা নাই, ইহাতে হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রেম জাগাইয়া দেয়। আর, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মায়িকরূপের কামময় মোহ ভুলাইয়া প্রেমময় রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্যই তাঁহার বিশ্ব-বিমোহন রূপ খুলিয়া দিলেন। তাই নাগরীগণ গৌররূপে ভুলিবেনই বা না কেন? আর, "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—যাঁহাকে

পাইলে আর অন্য কোন বস্তুতে রতি থাকে না, সেই নিরুপম রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া তাঁহারা কুলশীল ছাড়িতেই বা চাহিবেন না কেন? আপনি আমি পাইলেও এই মুহূর্ত্তেই সব ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাই। শ্রীজগদানন্দ মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছেন যে, এমন ভুবনভুলান রূপ দেখিলে আর কি নারীর কুল, মান, লাজ থাকে! একেত নবীনমদন, মধুরকিশোর রূপ, তাহাতে আবার ক্ষীণ কটিতটে চীনদেশজাত নীলনীরদবর্ণ অতিসূক্ষ্ম ক্ষৌম-বস্ত্র, তদুপরি আবার তিন থরে দামিনী-পংক্তির ন্যায় হার দুলিতেছে। তাঁহার ললিতমধুর মৃদুমন্দ তরুণগমনে যখন রূপলাবণ্যের লহরী খেলিতে থাকে এবং ঢলকে ঢলকে যখন এই রূপমাধুরী চতুর্দ্দিক উদ্বেলিত করিতে থাকে, তখন কি আর ইহা দর্শন করিয়া কুলবালাগণ স্থির থাকিতে পারেন! তাঁহারা তখন কি করিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না। জগদানন্দ বলিতেছেন—

নদীয়ানগরে নিজনয়নে নিরখিনু নবীন দ্বিজ যুবরাজ।
যতনে কত শত যুবতীরূপ সেবই তেজি কুলমান লাজ॥
অব তোহে কি কহব আন।
মাইরি তছু বদন সমরিতে কি জানি কি কর পরাণ॥ ধ্রু॥
ক্ষীণ কটিতটে চীনভবপট নীলনীরদ কাঁতি।
তিথরি হেমজঞ্জির তছুপর যৈছে দামিনী পাঁতি॥
চলত মদ মাতয়াল তরুণ গতি অতি মন্দ।
সতত মানসসরসী বিলসই, কি করু জগত আনন্দ॥*

* জগদানন্দ দুই জন। একজন জগদানন্দ পাণ্ডিত, ইনি শ্রীপ্রভুর সমসাময়িক। আর একজন জগদানন্দ ঠাকুর, ইনি বৈদ্যবংশসম্ভূত। শ্রীপ্রভুর পরে ইনি আবির্ভূত হন। এই পদকর্ত্তা কোন্ জগদানন্দ তাহা বলিতে পারি না। ইনি যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী জগদানন্দও হয়েন তথাপি তাঁহার এই রসময় কবিতাগুলি প্রমাণ চূড়ামণি, কারণ তাঁহার

অপরূপ গোরারূপমাধুরী কুলললনাগণের মনঃপ্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছে। এখন শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাদের প্রবল লালসা জন্মিয়াছে। এ লালসা কামজনিত নহে। দৈহিক সুখবাসনার নাম কাম; আর আত্মার আনন্দোপভোগের বাসনার নাম প্রেম। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাপ্তিতে তাঁহাদের দেহ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেহ লইয়াই কুলশীল। ইহাই এখন শ্রীগৌরমিলনে প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যৌবন নারীগণের একটি প্রধান গর্ব্বের বিষয়। তাঁহারা দেখিতেছেন, এই যৌবন তাঁহাদের এখন প্রধান বৈরী। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাপ্তির জন্য তাঁহারা এখন এই যৌবন পর্য্যন্ত হারাইতে প্রস্তুত। তাঁহারা ভাবিতেছেন, তাঁহারা যদি কুলযুবতী না হইয়া বালিকা হইতেন, তাহা হইলেও সহজে শ্রীগৌরচন্দ্রের সহিত মিলিত হইতে পারিতেন। শ্রীগৌররূপ দর্শন করিয়া তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা একটু তটস্থ হইলেন, হইয়া ভাবিলেন—তাঁহারা না কুলনারী! তবে কি তাঁহাদের এই রূপমোহ কামমিশ্রিত, ইহা কি লোকবিগর্হিত! ক্ষণপরেই আবার তাঁহারা দেখিলেন যে, তাহা নহে; শুধু তাঁহারা কেন, এই রূপ দেখিয়া মুনিগণ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায় এবং ইঁহার শ্রীচন্দ্রবদন দর্শন করিয়া অনন্তমদন মূর্চ্ছিত হইয়া যায়। শ্রীনাগরীগণের এখন আর অন্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ভাল লাগিল না। শ্রীগৌররূপসায়রে নাহিয়া উঠিয়া তাঁহাদের এখন এই মায়ামিশ্রিত পঞ্চবিষয় খুয়াইতে ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু কিরূপে ইহা খুয়াইয়া সেই অপ্রাকৃত পঞ্চবিষয় গৌর-রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ আস্বাদন করিবেন, তাহার উপায় খুঁজিয়া

জীবনীতে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি স্বপ্নে মহাপ্রভুর নাগরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধন ভজন দ্বারা নাগরীভাবে পরম সিদ্ধিলাভ করেন। পঞ্চকোটরাজ্যের অন্তর্গত আমলালা গ্রামে তাঁহার স্থাপিত শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি অদ্যাপি সেবিত হইতেছেন। চীনভবপট—চীনদেশ জাত পট্টবস্ত্র। তিথরি—তিন থরে, তিন লহরে। জঞ্জির—হার।

পাইতেছেন না। যতই তাঁহারা চিন্তা করিতেছেন, ততই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমমূর্ত্তি, তাঁহার প্রতি অঙ্গ, তাঁহাদের মানসনয়নে জাগিয়া উঠিতেছে, আবার মধ্যে মধ্যে কথনো বা শ্রীগৌরাঙ্গের নগরভ্রমণ কালে, কথনও বা সুরধুনীর তীরে তাঁহাকে দর্শন করিতে পাওয়ায় তাঁহাদের লালসা আরো শতগুণে বাড়িয়া উঠিতেছে। তাই কোন নাগরী বলিতেছেন—

মোর মন ভজিতে ভজিতে গৌরাঙ্গচরণ চায় গো।
কি করি উপায়, কুলবধূ হৈলাম তায়,
জঞ্জাল যৌবন-বৈরী তায় গো॥ ধ্রু॥
কাঁচা কাঞ্চন ঘটা, জিনিয়া রূপের ছটা,
চাহিলে চেতন চমকায় গো।
স্থল কমলদল, চরণ কোমল ভাল,
ভ্রামতে ভ্রমরা ভুলি ধায় গো॥
দীপ্তবাস পরিধান, দীর্ঘ কোচা লম্বমান,
দেখি হৃদয় দ্বিগুণ সুখ পায় গো।
আজানুলম্বিত ভুজ, যুবতী না ধরে ধৈর্য্য,
উরু হেরি মুনির মন ফিরায় গো॥
লম্বিত তুলসীমালা, গলে মন্দ মন্দ দোলা,
বদন দেখি মদন মূরছায় গো।
শীতল চরণদ্বয়, বুঝি সুধা সুধাময়,
শ্রবণে শ্রবণ জুড়ায় গো॥
লোচনাঞ্চল চঞ্চল, দেখি মন আকুল,
সকলি সে বিষয় খোয়ায় গো।
ভুরুর ভঙ্গিমা ভাল, ভুজঙ্গিনী ভুলল,
হেরি ধৈর্য্য দূরে যায় গো॥

নাসাশ্রুতিযুগ দ্বিজ, জিতে দ্বিজ দাড়িম বীজ,
নিরখি অখিল সুখ পায় গো।
তিলক ঝলমল ভাল, ভুবন ভরিল ভাল,
লাজে দিনমণি দূরে যায় গো॥
চাঁচর চিকুর চারু, চামরা চিকুর হারু,
যাম যাম জাগয়ে হিয়ায় গো।
ভণে মন্দ সর্ব্বানন্দ, কি জানি জানে গৌরচন্দ,
মূরছি তার মনমথ চিতায় গো॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ দর্শন করিয়া আসিয়া নাগরীগণ ঘরের কোণে বসিয়া অঝোরনয়নে কাঁদিতেন। তাঁহার সঙ্গে মিলিবার আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেন না। তাঁহারা জল আনিবার ছল করিয়া কিংবা স্নানের ব্যপদেশে গৌরদর্শন-মানসে সুরধুনীতীরে গমন করিতেন বটে, কিন্তু সব দিন তাঁহাদের দর্শন-সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠিত না। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে যখন আলাপাদি নাই, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ত আর বলিয়া দিতেন না যে, তিনি কখন সুরধুনী যাইবেন, আর সেই সময় বুঝিয়া নাগরীগণ তাঁহার দর্শন-মানসে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইবেন! নাগরীগণ তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হউন আর না-ই হউন, তাঁহার রূপমাধুরী দর্শন করিয়াই তাঁহারা চরিতার্থ। অবশ্য যাঁহার রূপ এত নয়নতৃপ্তিকর ও হৃদয়োন্মাদক, তাঁহার কথা যে অমৃতবর্ষী ও প্রাণারাম, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; এবং কোন কোন নাগরীর যে তাহাতেও লোভ না হইয়াছিল তাহা নহে; তবে প্রধানতঃ তাঁহারা রূপদর্শনের জন্যই ব্যাকুল। তাই তাঁহারা সুরধুনী-তীরে যাওয়া-আসাকালীন আশায় আশান্বিত হইয়া থাকিতেন, কিন্তু সকল দিন শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর আপনমনে যখন ইচ্ছা নাহিতে যাইতেন, কিংবা নগরপথে কখনো

বা সুরধুনীতীরে ভ্রমণ করিতেন। নাগরীগণের কথা তিনি ভাবিতে যাইবেন কেন কিংবা তাঁহাদের দিকে বঙ্কিমনয়নে চাহিতেই বা যাইবেন কেন? তিনি পরমসুজন নদীয়া-পণ্ডিত। তাঁহার গুণের কথা সমস্ত নদীয়ানগরে বিখ্যাত। তবে তাঁহার স্বাভাবিক রূপমাধুরীতে শ্রীনদীয়া-নাগরীগণ আকৃষ্ট হইতেন। মানুষভাবে ধরিতে গেলে ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের দোষ কি? আর নাগরীগণেরই বা দোষ কি? রূপ দেখিয়া না ভুলে কে? আরো এই রূপ যদি ভুবনভুলান হয়, তবে ত আর কথাই নাই। আর নাগরীগণ ত রূপ দর্শন করিয়াই সুখী, তাঁহারা ত আর কিছু চাহিতেন না। কখনো হয়ত কোন নাগরী অন্য কোন নাগরীর নিকট বলিতেন, 'সখি, শ্রীগৌরপ্রাপ্তির আশা ছাড়িয়া দাও, তিনি অতিশয় সুজন; আর আমরা কুলনারী; পুরুষের কাছে আমরা যাইবই বা কিরূপে আর গুরুজনেই বা কি বলিবে? আরো শুনিয়াছি, তিনি নাকি নারী দেখিলেই মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চলিয়া যান।' তখন অন্যান্য নাগরীরা বলিতেন, 'সজনি লো! তিনি সুজন বলিয়াই আমরা তাঁহাকে চাই। কুজন হইলে তাঁহার কাছে যাইতে কে সাহস করে! আর নারী দেখিয়া যে তিনি ঘৃণা করেন, তাহা নহে। নারী বলিয়া আমরা অপরাধী কিসে? যিনি সুজন, তিনি পুরুষ-নারী সকলকেই ভালবাসেন। আর ভালবাসার কাছে পুরুষনারী ভেদ থাকিবে কেন? ভালবাসায় কি দেহভেদ থাকে? সখিরে! আমরা তাঁহাকে দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু আমরা কেন, সকলেই ত তাঁর রূপে মুগ্ধ! প্রাণ সজনি! তিনি যে রমণ আর আমরা রমণী, এ কথা ত আমাদের মনেই স্থান পায় না। তবে, সখি, তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতে গুরুজনেই বা বাধা দিবে কেন? সখিরে! যতই কেন বলনা, প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি, তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ। শুধু আমাদের কেন, সকল জগতেরই প্রাণ। আরো দেখ সখি! এই নদীয়ানগরে কতই ত

দেখিলাম; কিন্তু গৌররূপ নয়নপথে পড়িয়াছে অবধি আর কিছুই ত মনে স্থান পায় না। আপনা হইতেই তাঁহাকে চায়, ইহার যুক্তিতর্ক দিয়া আর তুমি কত বুঝাইবে! গুরুজনেরই ভয় দেখাও, আর কুলশীলেরই দোহাই দাও, প্রাণ আমাদের গৌরাঙ্গ ছাড়া কিছু জানে না। আমাদের এমন কুলশীলে কাজ কি, যে কুলশীল গৌরপ্রাপ্তির অন্তরায়! আমরা অবলা, সমাজে অতিশয় লঘু, আরো যদি লঘু হই—আর কতই বা লঘু হইব! অমনিই ত লঘু হইয়া আছি, ইহা অপেক্ষা যদি আরও লঘু হইতে হয়, তাহাও স্বীকার্য্য, তথাপি আমরা শ্রীগৌরচন্দ্রকেই চাই; আমাদের গুরুজনে প্রয়োজন নাই, তাঁহারা তাঁহাদের গুরুত্ব লইয়া থাকুন। অবলা বলিয়া আমাদের কে গণে! আমরা ত কাহারো আদর সম্মান চাই না। আর গৃহকর্ম্মাদির কথা লইয়াও গুরুজনে কিছু বলিতে পারেন না। তাঁহাদের গৃহকর্ম্মাদি ত সকলই হইতেছে। তবে অবসর মত আমরা একটু গৌররূপ দর্শন করিব, ইহাও পারিব না! ইহাতে যদি বাধা দেয়, তবে আর আমাদের সেই গৃহকর্ম্মাদিতেই বা প্রয়োজন কি! মোটকথা, শ্রীগৌরচন্দ্রের রূপমাধুরী যখন আমাদের মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে, তখন আর আমাদের অন্য কিছু ভাল লাগে না। সখিরে! আর কথা বলার প্রয়োজন নাই, চল আমরা সুরধুনীকূলে যাই, দেখি, তাঁহার দর্শন পাই কি না?'

এই বলিয়া দশে পাঁচে মিলিয়া নাগরীগণ সুরধুনী যাইতেন। কোন দিন দর্শন হইত কোন দিন হইত না। শ্রীভগবানের কার্য্যই এই—তিনি কেবল প্রেম বাড়াইতে থাকেন। ব্রজধামে শ্রীগোপিকাবৃন্দ যখন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ যাইয়া একবার দর্শন দিয়া আসিতেন; আবার যখন তাঁহারা অবসর পাইতেন, তখন শত বাঞ্ছা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইতেন না। এইজন্য একদিন গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বিরলে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে চতুররাজ! আমরা যখন গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকি,

তখন তুমি উঁকি মারিয়া দেখা দিয়া কোথায় লুকাও; আর যখন অবসর পাইয়া বসিয়া থাকি, তখন আর তোমাকে শত চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পাই না। হে নিঠুর! এহেন চতুরালী করিয়া তুমি আমাদিগকে কেন কষ্ট দাও!' শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন 'প্রেম বাড়ানই আমার ধর্ম্ম।' শ্রীভগবানের কার্য্যই লুকোচুরি খেলা। তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। তিনি মধ্যে মধ্যে দর্শন দিয়া ভক্তের প্রেম বৃদ্ধি করিয়া দেন। প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ। প্রেমের উদয় না হইলে শ্রীভগবান্কে সর্ব্বদা দর্শন করিলেও তাহাতে আনন্দ হইবে না। সুতরাং প্রেমব্যতিরেকে দর্শন করা না করা সমান কথা। এইজন্যই প্রেম প্রয়োজন। শ্রীভগবান্ সেইজন্যই ভক্তের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাই নাগরাগণকে কোন দিন দর্শন দিতেন, আর কোন দিন দিতেন না। ইহাতে নাগরীগণের দর্শনলালসা আরো বৃদ্ধি পাইত। তাঁহারা নিরাশমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আবো কাঁদিতেন। ইহাতে তাঁহাদের লাভ হইত। তাঁহারা গৃহে থাকিয়াই সর্ব্বদা গৌররূপ দর্শন করিতেন। এক নাগরী আর এক নাগরীর কাছে বলিতেছেন—

সজনি লো, গোরারূপ জনু কাঁচা সোণা।
দেখিতে নারীর মন ঘরেতে টিকে না॥
বাঁকা ভুরু বাঁকা নয়ন চাহনিতে যায় চেনা।
এরূপে মন দিলে সই কুলমান থাকে না॥
নয়নে লেগেছে রূপ না যায় পাশরা।
যে দিকে চাই, দেখিতে পাই শুধুই সেই গোরা॥
চিন চিন লাগে, কিন্তু চিন্তে না যায় পারা।
বাসু কহে নাগরি! ঐ গোপীর মনচোরা॥

নাগরীগণ তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁহারা তন্ময় হইয়া

গিয়াছেন। যে দিকে নেহারেন, সেই দিকেই গৌররূপ দর্শন করেন। অনিলে, সলিলে, গগনে, ভূতলে সর্ব্বত্রই গৌরদর্শন করেন। নাগরী বলিতেছেন—

জলের ভিতর যদি ডুবি, জলে দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হৈল পারা॥
তেঁই বলি গোরারূপ অ মরা পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন, না জানে সাঁতার॥
নরহরি দাস কয় নব অনুরাগে।
সোণার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে॥

কোন নাগরী বলিতেছেন—

মরম কহিব সজনি মরম কহিব কায়।
উঠিতে বসিতে দিক্ নিরখিতে হেরি যে গৌরাঙ্গ রায়॥ ধ্রু॥
হৃদি সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল সকলি গৌরাঙ্গময়।
এ দুটী নয়নে কত বা হেরিব, লাখ আঁখি যদি হয়॥
জাগিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ, সদাই গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ, কি হৈল আমার সখি॥
গগনে চাহিতে সেখানে গৌরাঙ্গ. গৌরাঙ্গ হেরিয়ে সদা।
নরহরি কহে, গৌরাঙ্গচরণ হিয়ায় রহল বাঁধা॥

শুধু তাহাই নহে। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া প্রতি পত্রপুষ্পে তাঁহাদের গৌরাঙ্গের রূপ জাগাইয়া দিত, এমন কি গৌরভ্রম হইত। তাঁহারা দেখিতেন, অনুপম গৌররূপ জগতে মিশিয়া রহিয়াছে; অতসীকুসুম বা চাঁপাফুল কিংবা শোণপুষ্প হেরিয়া তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া যাইতেন, কমল দেখিলে শ্রীগৌরচন্দ্রের নয়নকমল মনে পড়িত, পলাশপুষ্প দর্শনে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রবণযুগল ভ্রম হইত, তিলফুল দেখিলে গোরাচাঁদের

সুমধুর নাসা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিত, অপরাজিতার কলিদর্শনে মনে করিতেন, ইহারা বুঝি শ্রীগৌরাঙ্গের সুচারু ভ্রূযুগের মাধুরী হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে; কুন্দকলি দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ্র জোছনা-বিচ্ছুরণকারী দশনপংক্তি মনে করিতেন। এইরূপে সকল জগত ভরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের রূপমাধুরী দর্শন করিতেন। যথা—

মজিলুঁ গৌর-পিরীতে সজনি, মজিলুঁ গৌর-পিরীতে।
হেরি গৌররূপ, জগতে অনুপ,
মিশিয়া রৈয়াছে জগতে॥
অতসীকুসুম, কিবা চাঁপা শোণ,
হরিল গৌরাঙ্গরূপ।
কমলে নয়ন, পলাশে শ্রবণ,
তিলফুলে নাসাকূপ॥
অপরাজিতার কলিতে আমার
হরিল গৌরাঙ্গ ভুরু।
হরে কুন্দকলি, দশন আবলী,
কদলী তরুতে উরু॥
সনাল অম্বুজ, হরিল সে ভুজ,
বক্ষঃস্থল পদ্মিনী।
কহে নরহরি, মোর গৌরহরি,
সকল ভুবনে জানি॥

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীগোপীগণের যে অবস্থা হইয়াছিল, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নদীয়ানগরে শ্রীগৌরপ্রেমে মজিয়া শ্রীনবদ্বীপদেবীগণের নবানুরাগেই সেইরূপ অবস্থা হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনিতে গোপিকাকুলকে আকর্ষণ করিয়া

তাঁহাদের সকলের সংসারধর্ম্ম, নারীধর্ম্ম এবং এমন কি দেহধর্ম্ম পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া কাননে লইয়া গেলেন। শ্রীগোপীবৃন্দ সেখানে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণা-ন্তিকে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ চতুরতা করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রজধামে ফিরিয়া যাইতে কহিলেন। গোপিকাগণ যখন যাইতে চাহিলেন না, শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদিগকে গৃহধর্ম্মাদির উপদেশ দিলেন, তাহা যখন তাঁহাদিগের প্রেমের নিকট উড়িয়া গেল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে লইয়া রাসনৃত্য-গীতাদি করিলেন। আবার ক্ষণপরে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণকে পরিহার করিয়া রাসস্থলী হইতে কোথায় যাইয়া লুকাইলেন। তখন গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে বৃক্ষলতা-সমূহকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ তাহারা জানে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই যে গোপিকাগণের কথা বলা হইল, ইঁহারা রাসরজনীর পূর্ব্বেই অনেকবার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন এবং এমন কি, তাঁহার সহিত আলাপাদি করার সৌভাগ্যও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তার পর বিপিনে আসিয়া কৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের এইরূপ অবস্থা হইল। আর, নদীয়ানগরে দেখিতে পাই, সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌররূপে জীবের নিকট প্রকাশিত হইয়া নদীয়ানাগরীগণের মধ্য দিয়া আরো উজ্জ্বল করিয়া প্রেম প্রকাশ করিলেন। নাগরীগণ গৌররূপ দর্শন করিয়াছেন, এখনো মিলন হয় নাই। প্রথমতঃ নবানুরাগ হয়। অনুরাগ গাঢ় হইলে মিলন হয়। এই মিলনে অনুরাগ আরো ঘনীভূত হয়। মিলনে যখন প্রেম ঘনীভূত হয়, তখন বিরহ হইলে প্রেম আরো ঘনীভূত হইয়া যায়, তখন বিরহী প্রেমের প্রাবল্যে তাঁহার প্রেমের বস্তুটী সর্ব্বত্রই দর্শন করেন। কিন্তু নাগরীগণের শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি নবানুরাগেই এহেন দশা হইল—তাঁহারা সর্ব্বত্র গৌরময় দেখিতে লাগিলেন।

এখানে একটী বহিরঙ্গ কথা বলিতে হইল, রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণ!

কিছুকালের জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া বলিতে পারেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া নাগরীগণের যে এইরূপ ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইল, এই কথার বিশ্বাস কি? যাঁহারা তর্ক করিতে চাহেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোনও কথা নাই। তবে যাঁহারা আগ্রহের সহিত জানিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট বলিতে পারি যে, যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক লোক, তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই আমরা এই সব লিখিতেছি। ঐতিহাসিকভাবে এই কথা আমাদের সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করিলেন, ইহা যদি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়, বেদবাক্য শ্রুতিগোচর হওয়ায় যাঁহারা উহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি অপৌরুষেয় অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা আরো অধিক-তর প্রামাণ্য ও বিশ্বাসযোগ্য। বিশেষতঃ যে সকল গ্রন্থাদি বহু বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহা বরং বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কথা, এই লীলা যাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তলিখিত পুঁথি অদ্যাপি স্থানে স্থানে পাওয়া যায়; সুতরাং তাঁহাদের বর্ণনা অবিকৃত রহিয়াছে। আরো এক কথা এই, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি প্রামাণ্যগ্রন্থে শ্রীভগবদ্‌বিষয়ে যে কথা বর্ণিত হইয়াছে ও তাহাতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, সেই সকল কথা ও ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা শ্রীগৌরলীলায় দেখিতে পাওয়া যায়। মহাজনগণ যে শ্রীগৌরলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রসমূহে বর্ণিত শ্রীভগবদ্‌বিষয়ের সম্পূর্ণ ভাব-সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আবার দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গ কখনো কাহাকেও তাঁহার লীলা বর্ণনা করিতে বলেন

নাই। যিনি যে ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী নারায়ণরূপে দর্শন করিলেন, কাহারো নিকট তিনি শ্রীরামচন্দ্র-রূপে, কাহারো নিকট তিনি নৃসিংহরূপে, কোন সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে, কখনো আবার বিরাট বিশ্বরূপমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইলেন। অবশ্য কোন প্রকাশ তাঁহার মহাপ্রকাশের পূর্ব্বেই হইয়াছিল, আবার কোন কোন প্রকাশ তাহার পর হইয়াছিল। যখন যে ভাবে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তখন তিনি সেই ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছেন। আবার, মধুর রসের রসিক ভক্তগণের নিকট তিনি সর্ব্বদাই ভুবনমোহন নদীয়ানাগর অখিলরসামৃতমূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। তখন তিনি নাগরীবল্লভ, নবীনকিশোর, রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। এই-রূপে যে তিনি প্রকাশ পাইয়াছেন, তাহা একজন দুইজন লোকের নিকট নহে, বহু ভক্তের নিকট তিনি এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এই নটবর নাগর বেশের বর্ণনা দুই একজনে করেন নাই, বহু মহাজন ইহার সাক্ষ্য দিতেছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য-পার্ষদ। কেহ কেহ বা সমসাময়িক, আর কেহ কেহ বা তাঁহার পরবর্ত্তি-লোক; বাসুঘোষ, নরহরি, নয়নানন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, জগ-দানন্দ, যদুনাথ দাস, ইঁহারা সকলেই প্রভুর সমসাময়িক লোক। ইঁহারা স্বচক্ষে শ্রীগৌরলীলা যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহাই পদে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া লেখেন নাই, অথচ সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের রসামৃতমূর্ত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাঁহারা অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ইহা বলা আপনার সঙ্গত নয়, কারণ যাহা আপনার ও আমার অধিগম্য নহে, যাহা আপনি ও আমি ধারণা করিতে পারিনা, তাহা মিথ্যা ও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করা

সমীচীন নহে। যদি আপনি কর্ম্মের তাড়নায়, ঐশ্বর্য্যের মোহে শ্রীভগবানের এই মাধুর্য্যের ভাব ধারণা করিতে না পারেন, তাহা হইলে প্রথম শ্রীগৌরচন্দ্রের ঐশ্বর্য্যের ভাব অবলোকন করুন, ঐশ্বর্য্যের দিক দিয়াই তাঁহাকে ধরুন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন্ চিরসুন্দর, নবীননাগর, মদনমোহন তখন তাঁহার ঐশ্বর্য্য বহিরঙ্গ ভাব হইলেও উঁহা ধরিলে ক্রমে আপনার চিত্ত নির্ম্মল হইবে ও পরে আপনিও এই নাগরীগণের পরমোজ্জ্বল ভাব প্রাপ্ত হইয়া রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন। নদীয়ানগরে আমরা ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। বাসু, নরহরি প্রভৃতি কয়েকজন রসিকভক্ত এবং নাগরীগণের মধ্যেও অনেকেই শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশের পূর্ব্বে রসরাজ শ্রীগৌরনাগর মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন; আবার বহু ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহাকে চিনিতেই পারেন নাই এবং প্রকাশের পর তাঁহার ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া অবশেষে মাধুর্য্যের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই যে নবীনকিশোর শ্রীগৌরাঙ্গের নাগররূপের কথা বলা হইল, ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের যখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স প্রায় একুশ বৎসর, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের এই সময় কিশোর বয়স নহে। যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে মানুষের মাপকাঠী দিয়া মাপ করিতে যায়েন, তাঁহারাই এই ভ্রান্ত ধারণায় পড়িবেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর চিদানন্দবিগ্রহ—পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দময়। তিনি বহিশ্চক্ষুর নিকট মায়ামানুষ ভাবে লীলা করিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার দেহ দেহীতে ভেদ নাই—তাঁহার দেহ দেহী একই বস্তু। তাঁহার দেহ রক্তমাংসের নহে—পরিপূর্ণ চিদ্‌বিগ্রহ। তাই আমরা দেখিতে পাই, তিনি অপ্রকট হওয়ার সময় নীলাচলে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের সহিত মিশিয়া গেলেন—দেহ আর দেহীতে কোন ভেদ রহিল না। ইহা একমাত্র

শ্রীভগবানেই সম্ভবে। ইহা সম্ভবপর হওয়া দূরের কথা, জড়বুদ্ধির জীব ইহা ধারণা করিতেই পারে না। যিনি পরিপূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ এবং পরিপূর্ণ ভাবময় তিনি জীবের নিকট ভাবভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাময় আমরা দেখিতে পাই, তিনি যে ভক্তকে যেরূপ অধিকার দিয়াছেন, সেইরূপ অধিকারানুযায়ী ভক্তের নিকট তিনি সেইভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। আবার ইহাও দেখিতে পাই যে, একই ভক্তের নিকট তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্তরভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা দ্বারা আমাদের মনে হয় যে, ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া তিনি প্রথমতঃ ভক্তের হৃদয় শোধন করেন ও বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল করেন, তদনন্তর মাধুর্য্য বিকাশ করিয়া ভক্তের মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়েন। ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে স্তুতি করেন, আর মাধুর্য্যের বিকাশে ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে অতি নিজজন বোধে সেবা করেন। কিন্তু মাধুর্য্যের ভাব ঐশ্বর্য্যের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে রস স্থায়ী ও পরিপুষ্ট হয় না, কারণ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য না দেখিলে জীবের মায়ামোহ বিদূরিত হয় না। আবার যখন মাধুর্য্যের ভাব স্থায়ী হইয়া যায়, তখন ঐশ্বর্য্য আড়ালে থাকিয়া মাধুর্য্যের পোষণ করে, বাহিরে ইহা প্রকাশিত হইয়া মধুরভাব শিথিল করিয়া দেয় না। শ্রীগৌরলীলা হইতে আমরা ইহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

তৈর্থিক ব্রাহ্মণ শ্রীশচীমা'র বাড়ী অতিথি হইয়া রন্ধনাদির পর যখন স্বীয় অভীষ্ট বস্তু শ্রীগোপালকে ভোগরাগ দিলেন, তখন শ্রীগৌরগোপাল আসিয়া নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ বস্তুটী চিনিতে না পারিয়া মনে করিলেন যে, বালকটী আসিয়া তাঁহার গোপালের ভোগ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তিনি দ্বিতীয়বার রন্ধন করিয়া আবার ভোগ লাগাইলেন, এবারও পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীগৌরগোপাল আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ এবারও চিনিতে পারিলেন না। শ্রীজগন্নাথ 'মশ্রের অনুরোধে ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার রন্ধন

করিলেন। নিমাইচাঁদকে একগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। ব্রাহ্মণ আবার যখন ধ্যানে অন্নাদি নিবেদন করিতেছেন, তখন শ্রীগৌরগোপাল আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ তখনো হায় হায় করিতে লাগিলেন। এবারেও তিনি গৌরগোপালকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ তাঁহার বাৎসল্যরূপে মাধুর্য্যের ভাব পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। শ্রীভগবান্ আর কি করেন। দ্বিভুজ গৌরগোপাল অষ্টভুজরূপে প্রকাশিত হইলেন। এই ঐশ্বর্য্যের বিকাশে ব্রাহ্মণের হৃদয়ে শুদ্ধ বাৎসল্য স্থায়ী হইল। এখন দেখুন, যিনি দ্বিভুজ, তিনি অষ্টভুজ হইলেন কিরূপে! শ্রীভগবানের লীলা আস্বাদন করিবার বিষয়, তর্ক করিয়া বুঝিবার বিষয় নহে। অবশ্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত নিজের বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হয়, তজ্জন্য প্রাণে যুক্তি-প্রমাণ চাহিতে পারে। বেশ ভাল কথা। সেজন্য দেখুন, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং অন্যান্য অনেক ভক্ত কি করিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর মধ্যে বিরাট্ বিশ্বরূপ দেখিলেন, তিনি তাঁহাকে অনন্তব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিরূপে দেখিতে পাইলেন, পরে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণরূপেও দেখিলেন, এবং শেষে তাঁহাকে শ্রীগৌররূপেই ভজন করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু জীবের প্রতিনিধি হইয়া কিভাবে আচরণ করিলেন দেখুন। তিনি গৌরগোপালকে দেখিয়া তাঁহার রূপে ভুলিয়া গেলেন, স্বভাবতঃই তাঁহার চিত্তবৃত্তি শ্রীগৌরগোপাল-বিগ্রহ আকর্ষণ করিয়া লইল। প্রাণে প্রাণে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বুঝিলেন যে, ইঁনিই সেই শাস্ত্রাতীত পরম বস্তু। তথাপি তিনি জীবের লাগিয়া সন্দেহ করিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশের সময় পর্য্যন্ত এমন কি, তাহার পরেও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ যে ভাবে দর্শন করিতে চাহিয়াছেন, সেই ভাবেই শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন। অবশেষে শ্রীগৌররূপই তাঁহার নয়নে লাগিয়া রহিল। আমরা এ বিষয়ে আর দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টী সমাপ্ত করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ যেরূপ একটী ঐশ্বর্য্যলীলা, তাঁহার সন্ন্যাসও তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যের বিস্তার ব্যতীত আর কিছুই নহে। মহাপ্রকাশ বলিতে সাধারণতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের সাত প্রহরিয়া ভাবকে বুঝায় বটে, কিন্তু তিনি যে সময় ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন, তৎসমস্তই এই মহাপ্রকাশের অন্তর্গত। তাঁহার সন্ন্যাসও এই মহাপ্রকাশের একটী আংশিক লীলা। এই সময়ও তিনি নানাবিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন—এই সন্ন্যাসমূর্ত্তিও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের রূপ। এই সময়ও তাঁহার একটী অপূর্ব্বলীলা দেখিতে পাই; শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া প্রথমতঃ জীবের হৃদয় শোধন করিলেন, তারপর এই ঐশ্বর্য্যের অন্তরালে যে তাঁহার নিত্যমধুররূপ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা জীবের নিকট প্রকাশ করিয়া জীবকে সেবার অধিকার দিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কঠিন হৃদয় প্রথমতঃ প্রভুর সন্ন্যাসরূপ দর্শনে দ্রব হইল, কিন্তু তাঁহার আত্মাভিমান গেল না। এই অভিমান দূর করিবার জন্য প্রভু পণ্ডিতরূপে তাঁহার নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা করিলেন। তারপর তিনি ষড়্‌ভুজরূপে প্রকাশিত হইলেন। সেই পণ্ডিত-প্রবর বাসুদেব সার্ব্বভৌম বুঝিলেন, ইনিই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। ইহার পরই তিনি প্রভুকে নাগররূপে দর্শন করিয়া স্বীয় ভজনীয় বস্তু শ্রীগৌর-সুন্দরকে স্তব করিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে কিরূপ দেখিলেন, দেখুন—

নিন্দিত অরুণকমলদলনয়নং,
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজযুগলং।
কলেবর-কৈশোর-নর্ত্তকবেশং,
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥

শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গকে কিশোররূপে দর্শন করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কুলকামিনীগণের চিত্তচোর এবং পরম সুবেশ ভুবনমোহন নাগর, যথা—

বাসুদেব বলিতেছেন—

নিজভক্তি-করং, প্রিয়চারুতরং,
নট-নর্ত্তন-নাগরী-রাজকুলং।
কুলকামিনী-মানসোল্লাসকরং,
প্রণমামি শচীসুত-গৌরবরং॥

বহিশ্চক্ষুর নিকট প্রভু কিন্তু তখন সন্ন্যাসী; তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর। কিন্তু সার্ব্বভৌম দেখিলেন, তিনি নবীন কিশোর, ভুবনমোহন নদীয়ানাগর।

আর একটী চিত্র দেখুন। শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী মায়াবাদী সন্ন্যাসী। তিনি ভারতবিখ্যাত অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পণ্ডিত। তিনি দশসহস্র সন্ন্যাসীর গুরু। প্রথমতঃ তিনি শ্রীপ্রভুকে উপেক্ষা করিয়া কত নিন্দা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি যখন সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী-সম্মিলিত সভায় শ্রীপ্রভুকে দেখিতে পাইলেন, তখন প্রথমতঃ তিনি দেখিলেন, শ্রীপ্রভু একজন নবীন সন্ন্যাসী। তদনন্তর শাস্ত্রালাপের সময় সরস্বতী মহোদয় দেখিলেন, শ্রীগৌরচন্দ্র জগতে অতুলনীয় পণ্ডিত; ইনি শাস্ত্রমূর্ত্তি জ্ঞানময় পরম পুরুষ; পর মুহূর্ত্তেই তিনি দেখিলেন, ইনি সন্ন্যাসী নহেন, ইনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বয়ং নারায়ণ। এই ঐশ্বর্য্য দর্শনে প্রকাশানন্দের মায়ামোহ বিদূরিত হইল। ইহার পর তিনি শ্রীপ্রভুর নিত্যমধুর নাগরস্বরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের পরম প্রিয়স্থান কাশীধাম পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রেমনিকেতন শ্রীবৃন্দাবনভূমে গমন করিয়া গৌরনাগরের ভজনে পরমানন্দে কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রকাশানন্দ শ্রীগৌরচন্দ্রকে কিরূপ দেখিলেন, তাহা তাঁহার কথায়ই বর্ণনা করিতেছি। প্রকাশানন্দ বলিতেছেন—

কোঽয়ং পট্টধটী বিরাজিতকটীদেশঃ করে কঙ্কণং,
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিভ্রৎ পদে নূপুরং।

উর্দ্ধীকৃত্য নিবদ্ধকুণ্ডলভর-প্রোৎফুল্লমল্লী-স্রগাপীড়ঃ
ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ ॥

লৌকিক চক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ তখন সন্ন্যাসী। তাঁহার বয়স প্রায় ২৯ বৎসর। কিন্তু প্রকাশানন্দ দেখিতেছেন, তিনি ২৯ বৎসর বয়স্ক যুবক নহেন, তিনি কিশোর গৌরনাগরবর। সন্ন্যাসোচিত অরুণবসন তাঁহার পরিধানে নাই কিংবা তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে। তাঁহার পরিধানে পট্টধটী, করে কঙ্কণ, বক্ষে হার, শ্রবণে কুণ্ডল, পদে নূপুর, তাঁহার কেশ-কলাপ উর্দ্ধীকৃত নিবন্ধ ও তাহা প্রফুল্লমল্লিকামালায় পরিশোভিত।

এখন দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু। তিনি পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান্। তাঁহার লীলা ও ভক্তের ভজনপ্রণালী তর্কদ্বারা স্থির করিতে পারিবেন না। শাস্ত্রেরও নিদেশ আছে যে, যে সকল ভাব অচিন্ত্য, তাহা লইয়া তর্ক করিবে না। তর্ক না করিয়া তাঁহার লীলামাধুরী দেখুন, আপনি ইহাতে মুগ্ধ হইয়া যাইবেন এবং এই লীলারস আস্বাদন করিতে আপনার লোভ জন্মিবে। আর, নদীয়ানাগরীগণের নিকট শ্রীগৌরসুন্দর যে নবীননাগরবেশে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার নাগরীভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া তিনি আপনার নিকটও সেই মধুর নাগরবেশে সমুদিত হইবেন।

যাহা হউক, এখন দেখুন নদীয়ানাগর শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের রূপমাধুরী দর্শন করিয়া নাগরীগণের কি অবস্থা হইল। সেই সময়ে নবদ্বীপ অতি প্রকাণ্ড সহর। তখন সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি। বিভিন্ন জাতির লোক সেখানে বাস করেন। জাতিভেদের কঠিন শৃঙ্খলে তখন হিন্দুগণ বদ্ধ। ব্রাহ্মণগণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের সহিত একাসনে উপবেশন করা দূরের কথা, তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে পর্য্যন্ত তাঁহারা স্নান করিতেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে পড়িয়া নদীয়ারমণীগণের ভেদবুদ্ধি

চলিয়া গেল। প্রেমে তাঁহাদের হৃদয় গড়গড়, ভেদবুদ্ধি থাকিবার আর স্থান কোথায়? সকলেই যখন শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য ব্যাকুল, তখন গৌড়-গতপ্রাণা নাগরীগণ সকলেই সমধর্ম্মাবলম্বী হইলেন, সকলেই একজাতি হইয়া গেলেন—শ্রীগৌরাঙ্গই সকলের জাতি হইল। গৌরপ্রেমে বিহ্বলা রমণী যে কোন জাতিরই হউন না কেন, তিনি তাঁহারই মত ব্যাকুলচিত্তা কোন রমণী দেখিলে তখনই তাঁহার গলা ধরিয়া স্বীয় প্রাণের কথা জানাইতেন, আর পরস্পর গৌরকথা আলাপ করিতেন। এইরূপে নদীয়ারমণীগণের মধ্যে জাতিভেদ শিথিল হইয়া পড়িল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর পরস্পরের যে ঘৃণা বিদ্বেষ ছিল, তাহা বিদূরিত হইল। নাগরীগণ তখন আর জাতিভেদের চিন্তা করিবেন কি? শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য তাঁহাদের প্রাণ যে বাহিরিয়া যাইতে চায়! নাগরীগণের পরস্পর দর্শন হইলে এক নাগরী অন্য নাগরীর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন, 'সখিরে, এখন ত প্রাণে বাঁচা দায় হইল! নাগরবরের বঙ্কিম চাহনিতে আমার হৃদয়ে কুসুমশর বিদ্ধ হইয়াছে। এখন ত আর জীবন রাখা যায় না! প্রাণ-সজনি! তুই যদি ইহার কোন মন্ত্র বা মহৌষধি জানিস্, তবে আমার জন্য উপায় কর।" যথা পদ—

নিরমল গৌরতনু, কাষল কাঞ্চন জনু,
হেরইতে পড়ি গেলুঁ ভোর।
ভাত ভুজঙ্গমে, দংশন মঝু মন,
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥

সজনি, যব হাম পেখলুঁ গোরা,
আকুল দিগ্ বিদিগ্ নাহি পাইয়ে,
মদনলালসে মন ভোরা॥ ধ্রু॥

অরুণিত লোচনে, তেরছ অবলোকনে,
বরিষে কুসুমশর সাধে।
জীবইতে জীবনে, থেহ নাহি পাওব,
জনু পড় গঙ্গা অগাধে॥

মন্ত্র মহৌষধি, তুহুঁ যদি জানসি,
মঝু লাগি করহ উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কহে, শুন শুন হে সখি,
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥

নাগরীগণ তখন গার্হস্থ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন, স্ব স্ব কুলমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছেন, কারণ শ্রীগৌরাঙ্গই তখন তাঁহাদের কুল হইয়াছেন। পতি বা অন্যান্য গুরুজনের আর ভয় নাই। পাঁচ সাত নাগরী বসিয়া গৌর-কথা আলাপন করেন। তখনও তাঁহারা সকল ছাড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ী যাইয়া উপনীত হয়েন নাই। সখীরা মিলিত হইয়া গৌরকথা আলাপনে আর গুরুজনের ভয় করেন না। গুরুজনের আর ভয় কি? পতিকেই বা ভয় করিবেন কেন? সেই পতির পতি পরমপতি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে যখন প্রস্তুত, তখন আর লৌকিক বন্ধনে তাঁহাদিগের কি করিবে? গোরা ছাড়া তাঁহারা আর কিছু জানেন না। দেখুন নাগরীগণের কি অবস্থা হইল। কোন নাগরী বলিতেছেন—

নিরবধি মোর মনে, গোরারূপ লাগিয়াছে,
বল সখি, কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ, বিদরিয়া যায় বুক,
পরাণ বাহির হৈতে চায়॥

কহ সখি কি বুদ্ধি করিব।
গৃহপতি গুরুজন, ভয় নাহি মোর মন,
গোরা লাগি পরাণ তেজিব ॥ ধ্রু ॥
সব সুখ তেয়াগিনু, কুলে জলাঞ্জলি দিনু,
গোরা বিনু আর নাহি ভায়।
অঝোরে ঝরয়ে আঁখি, শুনগো মরম সখি,
বাসুঘোষ কি কহিব তায় ॥

নাগরীগণ সকলে তখনও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পূর্ণ অনুগত হন নাই। তাঁহারা গৌররূপ দেখিয়া ভুলিয়াছেন, এমন কি তন্ময়তাবশতঃ তাঁহারা সর্ব্বত্র শ্রীগৌররূপ দর্শনও করিতেছেন এবং তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহাদের মধ্যে একটু আত্মসুখবাঞ্ছা রহিয়াছে। প্রেমের ধর্ম্ম এই যে, যাহাকে ভালবাসা যায়, তাঁহার সুখেই সুখোদয় হয়। নাগরীগণ তখন রূপ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল, পরিপূর্ণরূপে প্রেম তখনো প্রাপ্ত হয় নাই। চিদানন্দরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের মায়িক রূপের মোহ চলিয়া গিয়াছে, হৃদয় কর্ষিত হইয়াছে, প্রেমের বীজও পড়িয়াছে, অঙ্কুরিতও হইয়াছে, কিন্তু কিঞ্চিৎ আত্মসুখবাঞ্ছা রহিয়াছে বলিয়া ইহা বৃদ্ধি পাইতে পারিতেছে না। নাগরী-গণ পরস্পর দেখিলেন, সকলেই গৌরপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল। বিবাহের সময় দেখিয়াছেন যে, নদীয়াবাসী সকলেই গৌররূপে মুগ্ধ, এখনো দেখিতে-ছেন, সকল নাগরীই শ্রীগৌরাঙ্গকে চাহিতেছেন। আবার প্রেমের প্রাবল্যেও দেখিতে পাইতেছেন যে, জগতের সকল জীবই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য পাগল। ইহাতে কোন কোন নাগরীর ঈর্ষা হইতেছে। তখন এক নাগরী আর এক নাগরীর নিকট বলিতেছেন, 'সজনি লো! তোরে মনের মরম কহি-তেছি, বহুবল্লভ গোরাচাঁদ জগতেরই মন চুরি করিতেছেন, সকলেই

শ্রীগৌরচাঁদকে চাহিতেছে, তবে আমি কেন তাঁহাকে আমার একা করিতে চাই! এমন অমূল্যনিধি অন্য কাহাকেও দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। সাধ হয়, আমি একলা তাঁহাকে লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া আস্বাদন করি। এমন বস্তুর ভাগাভাগি প্রাণে সহ্য হয় না। প্রাণ সজনি! গৌরাঙ্গমুখ না দেখিয়া আমার বুক যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! আমার ভয় হয়, আমার সেই মনচোর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে কে যেন চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে এবং গোপনে বসিয়া তাঁহাকে উপভোগ করিতেছে। সখিরে! আমার এই ছার কুলশীলে আর প্রয়োজন কি? আমার জীবন যৌবন সকলই নিয়ে যাও, আর আমায় গোরাগুণনিধি দাও, গোরা আমার সর্ব্বস্ব-ধন। গোরা আমার প্রাণের প্রাণ। তাঁকে যদি না পাই, তবে সুরধুনী-জলে প্রবেশ করিয়া এ ছার দেহ বিসর্জ্জন দিব।' যথা পদ—

বিভাস।

সো বহু বল্লভ গোরা, জগতের মনচোরা,
তবে কেন আমার করিতে চাই একা।
হেন ধন অন্যে দিতে, পারে বল কার চিতে,
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা॥

সজনি লো! মনের মরম কই তোরে।
না হেরি গৌরাঙ্গমুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
কে চুরি করিল মনচোরে॥ ধ্রু॥
লও কুল, লও মান, লও শীল, লও প্রাণ,
লও মোর জীবন যৌবন।
দেও মোরে গোরানিধি, যাহে চাহি নিরবধি,
সেই মোর সরবস ধন॥

ন তু সুরধুনী নীরে, পশিয়া তেজিব প্রাণ,
পরাণের পরাণ মোর গোরা।
বাসুদেব ঘোষে কয়, সে ধন দিবার নয়,
দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হারা॥

নাগরী মনে করিতেছেন, তাঁহার গোরানিধি কে যেন চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন। আমরা বলি, এহেন অমূল্যনিধি লুকাইয়া রাখার বস্তুই বটে, কিন্তু ইহা আবার বেশীদিন লুকাইয়া রাখা যাইবে না। তিনি এখন শ্রীশচীমার আলয়ে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট লুক্কায়িত রহিয়াছেন। কোন কোন ভাগ্যবতী রমণী সেখানে যাইয়া শ্রীমতীর অনুগত হইয়া গৌররূপসুধা আস্বাদন করিতেছেন এবং শ্রীমতীকে দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসঙ্গ-জনিত স্বসুখবাসনা পূর্ণ করিতেছেন, কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, একমাত্র শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াই শ্রীশ্রীগৌবাঙ্গসুন্দরের সম্পূর্ণ যোগ্য এবং তাঁহারা সকলে শ্রীমতীর অংশভূতা। শ্রীমতী বৃক্ষ, তাঁহারা পত্রপল্লব, শাখা, প্রশাখা; মূল বৃক্ষের তৃপ্তি হইলে পত্রপল্লব আপনা হইতেই তৃপ্ত হয়, তাই তাঁহারা শ্রীমতীর সুখে সুখী, তাই তাঁহারা শ্রীমতীকে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গসঙ্গজনিত পরিপূর্ণ রস আস্বাদন করিতে পারিতেছেন। আমরা বলি, হে নাগরি! আপনি গৌররূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, আপনি ধন্য; আপনার গৌরপ্রেম হইয়াছে, আপনি বড় ভাগ্যবতী। তবে এ বস্তু একলা আস্বাদন করিবার বিষয় নহে। এখন আপনার একাকিনী আস্বাদন করিতে ইচ্ছা হইতেছে বটে, কিন্তু শ্রীমতীর আশ্রয় লউন, দেখিবেন আপনি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবেন। এখন যে আপনি এই বস্তুটী অন্যকে দিতে চাহিতেছেন না, এবং মনে মনে কল্পনা করিতেছেন যে, একাকিনী গোপনে বসিয়া তাঁহার সঙ্গ করিলে বেশী সুখ পাইবেন, শ্রীগৌরপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই এইরূপ ভাবিতেছেন, অথচ তাঁহাকে পাইতেছেন না; কিন্তু শ্রীমতীর আশ্রয় লই:

দেখিবেন, আপনি পরিপূর্ণ প্রেমামৃতরসে সিঞ্চিত হইয়াছেন ; তখন দেখিতে পাইবেন, একাকিনী আস্বাদন করিয়া যত সুখ না হয়, সখিগণসঙ্গে তদপেক্ষা কোটীগুণে রসাস্বাদন হয়। আপনি তখন স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া এই রস বিলাইতে সচেষ্ট হইবেন এবং আপনি যতই অন্যকে এই রসের ভাগ দিতে যাইবেন, ততই আপনার ভাগ বাড়িয়া যাইবে ; দেখিবেন, ইনি এক অফুরন্ত রসের প্রস্রবণ। বিবাহের দিন শ্রীমতী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এই রসের সন্ধান জানাইয়া দিলেন। আজ হউক, কাল হউক সকলেই সময়ে এই রস পাইবেন।

অবশ্য নাগরীগণের এই যে ঈর্ষা, ইহাও জগতের আকাঙ্ক্ষণীয়। নিত্য শুদ্ধ বস্তুর জন্য প্রাণে যে কোন ভাব উপস্থিত হয়, তাহাই বরণীয়। শ্রীভগবানের দান কোনটীই বৃথা নহে। তিনি আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন; সকলই আমাদের কল্যাণের জন্য। শ্রীভগবান্ মঙ্গলময় অমঙ্গল করা তাঁহার বিধান নহে। জ্ঞানচক্ষুঃ খুলিয়া গেলে জীব দেখিতে পায় যে, শ্রীভগবান্ সকলেরই প্রভু। তিনি সৃজন পালনাদির অনন্তবিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্বয়ং পরমানন্দমূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং জীবগণকে এই আনন্দরস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই মধুর ভাবে আহ্বান করিতেছেন। ইনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, নিষ্ক্রিয়—কর্ম্মের অতীত পরম পুরুষ। যাঁহারা শুভাশুভ কর্ম্মের মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহারা এই নিত্যানন্দ হইতে বঞ্চিত। এই শুভাশুভ কর্ম্মের মধ্যে তিনি এমন বিধান করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন যে, শুভাশুভের মধ্যে পড়িয়া অবশেষে জীব সময়ে বুঝিতে পারে যে, যাহা অশুভ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাও একটী শুভের নিদান। তখন জীব শুভাশুভের অতীত নিত্যমঙ্গলময় পরমানন্দপুরুষ শ্রীভগবানের সন্ধান প্রাপ্ত হয়। জীব অত্যন্ত বহির্ম্মুখ হইলে এই আনন্দমূর্ত্তির সন্ধান পায় না, সুতরাং নিরবধি দুঃখে কালাতিপাত করে,

সে ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। জীবকে এই ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধার করিয়া পরমানন্দ প্রদান করিবার জন্য আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ নদীয়ানগরে অবতীর্ণ হইলেন। প্রভু কিরূপে জীবের জ্বালা দূর করিলেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রভুর কাছে যিনি আসিতেন, তাঁহার আর দুঃখ কষ্ট থাকিত না। ব্যাধিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিলে তাঁহার ব্যাধি সারিয়া যাইত। ইহাতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল যে, প্রভু রোগ আরোগ্য করিতে পারেন। তাই অন্যান্য বহুলোক যেমন তাহার নিকট আসিতেন, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণও অনেকে রোগমুক্তির নিমিত্ত শ্রীপ্রভুর নিকট আগমন করিতেন। প্রভু কিন্তু কাহাকেও কোন ঔষধ দিতেন না, কিংবা কোন মন্ত্রতন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িয়া দিতেন না, অথবা ব্যাধি আরোগ্য হইবে বলিয়া রোগীকে কখনো আশ্বাসও প্রদান করিতেন না। তিনি তাহার প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিতেন, আর মধুর হাসিতেন এবং ব্যাধির কথা, ত্রিতাপের কথা না বলিয়া আনন্দের কথা কহিতেন; লোকটীর আর তখন কোন দুঃখ থাকিত না। ইহার কারণ এই, আনন্দ হইতে জীবের উৎপত্তি, আনন্দেই জীবের অবস্থিতি। কোন কারণবশতঃ স্বভাবজাত এই আনন্দের হ্রস্বতা হইলে, অর্থাৎ ইহার উপর মায়ার প্রভাব বেশী পড়িলেই আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তাপত্রয় আসিয়া জীবকে জ্বালা দেয়। আবার এই আনন্দশক্তির উদ্বোধনে এই সব বিদূরিত হইয়া যায়। সাধুসঙ্গ হইতেও জ্বালা দূরে যায় বটে, কিন্তু এই জ্বালা যখন বহুবিস্তার লাভ করে, আনন্দ বস্তুটী যখন সমাজ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন পরমানন্দমূর্ত্তি শ্রীভগবানের স্বয়ং আগমন প্রয়োজন। প্রভু যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও জীবের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল, কর্ম্মের নিগড়ে তাহারা একান্ত বদ্ধ অথবা অভিমানের উচ্চশিখরে আরূঢ় ছিল। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য

দিতেছে। ইতিহাসের কথা এখানে পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীগৌরচন্দ্রের আগমনে কর্ম্মের শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া গেল, অভিমানের পর্ব্বত চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তাই আমরা অদ্যাপি দেখিতে পাই, শ্রীগৌরাঙ্গের গণ সকলেই অমানী এবং তৃণাদপি সুনীচ ও তরু হইতেও সহিষ্ণু এবং কর্ম্মের শৃঙ্খল হইতে তাঁহারা মুক্ত বলিয়া আনন্দে নৃত্য কীর্ত্তন করেন। প্রভু আর কোন কৌশল করিলেন না শ্রীভগবান্ যে, পরমানন্দমূর্ত্তি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ইহা জীবকে জানাইলেন এবং দর্শন দিয়া, কাহাকেও স্পর্শ করিয়া ও তাঁহার নামের সঙ্গে অপর শক্তি সঞ্চারিত করিয়া সেই নাম জীবের মুখ দিয়া উচ্চারণ করাইয়া জীবকে আনন্দময় করিয়া দিলেন। এই সম্বন্ধে একটী কবিতা আছে, উহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

নদীয়ায় রাষ্ট্র হ'ল গোরা বড় গুণী।
কত লোক আসে যায় এই কথা শুনি॥
এক রোগী মনে ভাবে সেই থানে গেলে।
সব রোগ সেরে যাবে অতি অবহেলে॥
অতিশয় বুড়ো সেই দন্ত পড়ে গেছে।
যাটের অধিক তার বয়স হয়েছে॥
নীরোগ হবার তরে নিমায়ের বাড়ী।
প্রাতঃকালে সেই বুড়ো এল তারাতারি॥
হেনকালে শ্রীকাঞ্চনা ফটকে আছিল।
তাঁরে দেখি সেই বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল॥
"বল মাগো, দয়া করে কি করি উপায়।
জ্বলিতেছি ভয়ঙ্কর রোগের জ্বালায়।"
কাঞ্চনা কহিল তবে বৃদ্ধে সম্বোধিয়া।
"দাসী আমি, মোরে পুছ কিসের লাগিয়া॥

অইখানে বসে আছে প্রভু গুণমণি।
তাঁর কাছে সব কথা বলহ আপনি॥"
এত শুনি তিঁহো যায় প্রভুর নিয়ড়ে।
অতিশয় ভক্তিভরে দণ্ডবৎ করে।
ধূলি মাথে সর্ব্ব অঙ্গে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
'ভয়ঙ্কর' 'ভয়ঙ্কর' বলে ফুকারিয়া॥
বৃদ্ধ বলে—"সবি দেখি ভয়ঙ্কর আমি।
এর প্রতীকার প্রভু ক'রে দাও তুমি॥"
কথা নাহি কহে প্রভু হাসিতে লাগিল।
হাসি দেখি সেই বৃদ্ধ মনেতে ভাবিল॥
মোরে দেখে গোরাচাঁদ হেসেছে যখন।
রোগ শোক সব মোর যাইবে তখন॥
প্রবোধ পাইয়া বৃদ্ধ বাড়ীতে চলিল।
রহস্য জানিতে তবে কাঞ্চনা পুছিল॥
"বল দেখি, গুণমণি, কি ভেল্কী করিলে।
ব্যাধি সারিবারে কোন দ্রব্য নাহি দিলে॥
মন্ত্রতন্ত্র কিছু নাহি করিলে উচ্চার।
যাহে ব্যাধি ভয়ঙ্কর যাইবে তাহার॥
কিংবা কোন কথা বলে দিলে না আশ্বাস।
তার দিকে চেয়ে শুধু দিলে মৃদুহাস॥
ওঝা নও বৈদ্য নও তবে কেন লোক।
তোমার নিকটে আসে সারিবারে রোগ॥
প্রক্রিয়া কর না কিছু রোগ সারিবার।
তবু কেন খুসী হয় অন্তর সবার॥"

*　　　*　　　*　　　*

অমিতা সেখানে ছিল, এ সব শুনিয়া।
মধুর কহিল ধীরে প্রভুর হইয়া॥
আমাদের প্রাণনাথ আনন্দ মূরতি।
জগতের সবাকার পরাণের পতি।
আনন্দ হইতে সব জীবের উদয়।
আনন্দেই জীবগণ অবস্থিত রয়॥
কোন হেতু এ আনন্দ যদি কমে যায়।
জ্ব'লে পু'ড়ে মরে জীব ত্রিতাপজ্বালায়॥
পরিপূর্ণ প্রেমমূর্ত্তি মোদের প্রভুর।
হাসি মুখ দেখে সব জালা হয় দূর॥

এইরূপে জীব সংসারের মধ্যে থাকিয়াই সংসারের জ্বালা হইতে মুক্ত হইল। ভবরোগ আরোগ্য হইলে দেহাদির রোগ আপনা হইতে চলিয়া যায়। প্রভু আসিয়া জীবের এই ভববন্ধন ছুটাইয়া দিলেন এবং প্রভু অপ্রকট হইলেও জীব যাহাতে এই বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আনন্দরস আস্বাদন করিতে অধিকারী হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ভক্তগণের মধ্যে শক্তি রাখিয়া দিলেন। অদ্যাপি শ্রীভক্তগণের কৃপায় শ্রীভগবানের আনন্দমূর্ত্তি দর্শনে জীবের অধিকার হয়। নিত্যবস্তুর লীলা নিত্যই হইতেছে—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

শ্রীভগবানের আগমনে জীব বন্ধনবিমুক্ত হইয়া দেখিতে পাইল যে, শ্রীভগবানের সমস্ত দানই মঙ্গলের নিমিত্ত। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে কাম, ক্রোধাদি, রিপু, ঈর্ষা, ঘৃণা প্রভৃতি নানাবিধ প্রবৃত্তি দিয়াছেন ; মায়িক

জীবের নিকট ইহা দুষ্প্রবৃত্তি ও পরম শত্রু বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের নিকট ইহা পরম বান্ধব,—যিনি শ্রীভগবানের অনুগত, তাঁহার নিকট সকলেই মিত্র। তিনি যখন চিত্তবিত্ত, দেহ, মনঃপ্রাণ সকলই শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন কামক্রোধাদি তাঁহার শত্রুতাচরণ করিবে কিরূপে ? ইহারা ভক্তগণকে ছাড়িয়া যায় না বটে, পরন্তু তাহারা ভক্তের মধ্যে থাকিয়া ভক্তির পোষণ করে। অন্যান্য ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করার উপদেশ দেওয়া হয়। বৈষ্ণবগণ তাহা বলেন না। তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে পদানত করিয়া ভগবদ্ভজনের সহায়তার নিমিত্ত যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করেন। কাম শ্রীভগবদ্ভজনে অর্পিত হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবানের জন্য প্রবল বাসনা হয়। ভক্তির বিরোধী বিষয়ে ক্রোধ প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তির উদ্রেক না হইলে আত্মধিকার উপস্থিত হয় ; এবং ভক্তি পরিপক্ক হইলে শ্রীভগবান যখন নিরঞ্জন বলিয়া উপলব্ধি হন, তখন এই ক্রোধ মানরূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। শ্রীভগবানের উপরই তখন ক্রোধ হয়। ইহাতে জ্বালা দেয় না, পরন্তু আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। লোভ শ্রীভগবানের লীলারসাস্বাদনে প্রসক্ত হয়। মোহ শ্রীভগবানের রূপলাবণ্য উপভোগের জন্য প্রযুক্ত হয়। মদ শ্রীভগবানের নাম গুণানুকীর্ত্তনেব মত্ততায় পরিণত হইয়া যায়। অর্থাৎ, মানুষের যত কিছু বৃত্তি আছে, সকলই ভক্তের ভক্তির পোষণ করে। তাই শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিতেছেন, যে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাকটাক্ষ প্রাপ্ত হইলে জীবের

দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়-কাল-সর্পপটলী প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে।

দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়রূপ ভীষণ সর্প মরিয়া যায় না। ইহাদের বিষদন্ত উঠিয়া যায়। ইহা তখন ভক্তের নিকট ক্রীড়ার সামগ্রী হয়। ইন্দ্রিয়নিচয় ভক্তের অনুকূল হইয়া তাঁহার সন্তোষবিধানার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। তাই, শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম কাহাকেও ইন্দ্রিয়নিচয় দমন করিয়া শ্রীভগবান্‌কে পাওয়ার

জন্য উপদেশ দেন না। এই ধর্ম্ম প্রথমতঃই পরমানন্দমূর্ত্তি শ্রীগৌরচন্দ্রকে দেখাইয়া দেন, যেন ইঁহার আশ্রয়ে জীবের আনন্দ স্বভাবতঃই উদ্বুদ্ধ হয় ও ইন্দ্রিয়সমূহ আপনা হইতে মস্তক অবনত করিয়া ভক্তের দাসত্ব করিতে সর্ব্বদা তৎপর থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকটসময় ইহাই করিয়াছেন এবং এখনও তাঁহার ভক্তগণ জীবের নিকট এই সহজ মধুর পন্থা প্রদর্শন করিতেছেন। এখন দেখুন, নাগরীগণের ঈর্ষ্যার ভাব জাগ্রত হওয়ায় তাঁহাদের কি অবস্থা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে ঈর্ষ্যা, সুতরাং ইহাও পরমানন্দময় এবং ইহাতে শ্রীগৌরপ্রাপ্তির সহায়তা করিয়া দেয়। নাগরীগণেরও তাহাই হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজের একলার ধন করিতে বাসনা করিয়া নাগরী বলিতেছেন

হেন ধন অন্যে দিতে পারে বল কার চিতে
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা।

কিন্তু ইহাতে তিনি শ্রীগৌরচন্দ্রকে পাইতেছেন না, তাই তিনি বলিতেছেন

না হেরি শ্রীগৌরাঙ্গমুখ বিদরিয়া যায় বুক
কে চুরি করিল মনচোরে।

তারপর নাগরীর কি অবস্থা হইল! না, তিনি বলিতেছেন, সখিরে!

লও কুল লও মান লও শীল লও প্রাণ
লও মোর জীবন যৌবন।

দেও মোরে গোরানিধি যাহে চাহি নিরবধি
সেই মোর সরবস ধন।

তাঁহাকে না পাইলে নাগরী কি করিবেন! না,

নতু সুরধুনী নীরে পশিয়া তেজিব প্রাণ
পরাণের পরাণ মোর গোরা।

কিন্তু শ্রীভগবানের জন্য যাঁহারা প্রাণ দিতে চাহেন, শ্রীভগবান্ কি তাঁহাকে প্রাণে মারেন! আপনার জন্য যদি কেহ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হন, তবে আপনার সাধ্য থাকিতে আপনি তাঁহাকে মারিতে দিবেন না। আর শ্রীভগবান্ ত সর্ব্বশক্তিমান্ পরম প্রেমময়, তিনি জীবকে অতিশয় ভাল বাসেন, তিনি ভক্তকে প্রাণে মারিবেন কেন? রামায়ণে দেখিতে পাই— শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসের পর অযোধ্যা-প্রত্যাগমনের নির্দ্ধারিত দিবসে শ্রীভরতচন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের দেরি দেখিয়া বিরহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন স্থির করিয়াছেন। ভরত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শ্রীহনুমান্ আসিয়া সংবাদ জানাইলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র আসিতেছেন। ভরত প্রাণে বাঁচিলেন, ভাইয়ের সহিত তাঁহার মধুর মিলন হইল। এইরূপ ভক্ত যখন শ্রীভগবান্ বিরহে প্রাণ দিতে চাহেন, তখন হয় শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে দর্শন দেন, নতুবা দর্শনের সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত পন্থা জানাইয়া দেন। এই যে শ্রীনদীয়ার কুলবালা শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের জন্য প্রাণ দিতে চাহিলেন, তখন শ্রীগৌরচন্দ্র কি করিলেন! না, তখন তিনি নাগরীর নিকট খবর পাঠাইলেন যে, তিনি যদি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার শরণাগত হন, অর্থাৎ, তাঁহার সঙ্গ করেন, তাহা হইলেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবেন। এই খবর তিনি কি ভাবে দিলেন! না প্রাণে একটী ভাব জাগাইয়া। সে ভাবটী এই নদীয়া-নাগরী বলিতেছেন—

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত হরিয়া লইল অরুণ নয়ান-বাণে॥
সই মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে নদীয়ানগরে নাগরী না রবে ঘরে॥ ধ্রু॥

রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মন দঢ়াইনু পরাণ রহিবার নয়॥
কোন্ পুণবন্তী যুবতী ইহার বুঝয়ে রসবিলাস।
তাঁহার চরণে হৃদয় ধরিয়া, কহয়ে গোবিন্দদাস॥

নাগরী মনে ভাবিতেছেন—তিনি মনে মনে দৃঢ় বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যখন রসরাজ তখন যে যুবতী ইঁহার অঙ্কশোভিনী, তিনি নিশ্চয়ই ইঁহার রসবিলাস অবগত আছেন; তাহার শ্রীচরণে আশ্রয় লইলে তিনিও এই রসবিলাস উপভোগ করিতে অধিকারিণী হইবেন।

নাগরীগণ এইরূপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া প্রেমের পরিপূর্ণ বিষয় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তথাপি অনেক নাগরী রহিয়া গেলেন; তাঁহারা গৃহের বিষম বাঁধ ছিড়িতে পারিলেন না, তাঁহারা শাশুড়ী ননদীর জ্বালা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না, গৃহে থাকিয়াই মধ্যে মধ্যে দূরে আড়াল হইতে শ্রীগৌরদর্শন পাইতেন। গৃহে বসিয়া তাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন, আর সমবেদনায় ব্যথিত নাগরীগণ মিলিয়া পরস্পর দুঃখের কথা কহিতেন। কোন নাগরী বলিতেছেন—

শুন শুন ওগো পরাণ সই,
বেথিত জানিয়া তোমারে কই;
দেশের বাহির ঘরের রীত,
সে কথা কহিতে কাঁদয়ে চিত।
গোরা বলি যদি নিশ্বাস ছাড়ি,
শুনিয়া কোরধে জ্বলয়ে বুড়ী।
ননদী বিষম বিষের প্রায়,
তার গুণে প্রাণ দহিয়া যায়।

পড়সী কেবল কুলের কাঁটা,
দিবস রজনী দেয় যে খোঁটা
কারে দিব ওগো ইহার সাথী!
ঘরে থাকি যেন পিঞ্জরে পাখী।
সে সব কাহিনী কি কব আর,
কহিতে দুঃখের নাহিক পার।
গত দিন বিধি সদয় মোরে,
আকাশের চাঁদ দিলেক করে।
দিবা অবসানে গৌরাঙ্গ রায়,
আমাদের পথে চলিয়া যায়।
তারাতারি গিয়া গবাক্ষদ্বারে,
অলখিত হৈয়া দেখিনু তারে।
কিবা সে মধুর বদন চাঁদ,
তরুণীগণের হৃদয় ফাঁদে;
ভুরুযুগবর ভঙ্গিম ছাঁদে,
কে আছে এমন ধৈরজ বাঁধে!
খঞ্জন জিনিয়া নয়ান নাচে;
বুঝিনু তাহাতে কেহ না বাঁচে।
গলায় দোলয়ে কুসুমদাম,
তা'হেরি মূরছে কতেক কাম।
শোভা অপরূপ কি কব আর,
ভুবনমোহন গমন তার।
তিলেক দেখিতে পাইনু সেথা,
বাড়িল দ্বিগুণ হিয়ার ব্যথা।

নরহরি কহে— দুঃখ না রবে,
মনের মতন সকলি হবে।

গৃহবদ্ধা কুলনারীগণ এইরূপে দৈবযোগে কোনদিন গৌরনাগরের দর্শন পাইতেন, আবার কোনদিন পাইতেন না। একদিন নাগরী প্রভুর দর্শন পাইয়া বলিতেছেন—

গত দিন বিধি সদয় মোরে,
আকাশের চাঁদ দিলেক করে।

ব্রজপুরে শ্রীমতী রাধার শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে ভাব হইয়াছিল, এখানে নদীয়ানগরে ঘরে ঘরে নাগরীগণের সেই ভাব হইল। শ্রীমতী রাধা শাশুড়ী ননদীর জ্বালা সকল সময় অতিক্রম করিতে পারিতেন না। দৈবক্রমে কখনো শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইত, কখনো হইত না। নদীয়ার অন্তর্গৃহগতা নাগরীগণেরও এই অবস্থা হইল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া এই নাগরীগণের কেন্দ্রস্থল। সমস্ত নাগরীবৃন্দকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তিনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়া বসিয়া আছেন। কাহাকেও আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, কাহাকেও কিছুদিন পরে আকর্ষণ করিবেন। সময়ে সকলেই সেখানে যাইয়া মিলিত হইবেন। নদীয়ানগরে গৃহে গৃহে শ্রীরাধা, অর্থাৎ নাগরীগণ শ্রীরাধার মহাভাবে বিভাবিত, আর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহাদের সকলের কেন্দ্রভূমি। গৃহে গৃহে নাগরীগণ পরকীয় রতি আস্বাদন করিতেছেন, আর স্বকীয় ও পরকীয় উভয় রতিরই পরম মধুর সম্মিলনস্থল শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। এখন দেখুন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে যে শত শত রাধা বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহাই বর্ণে বর্ণে সত্য।

এই কথার যথার্থতা বুঝাইবার জন্য, আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতেন, তাঁহার ননদী বা শাশুড়ীর ইহা

সহ্য হইত না। তাঁহার শাশুড়ী ননদী কাহারা? না, জটিলা ও কুটিলা অর্থাৎ জটিল ও কুটিল ভাব। যে সকল ভাব জগন্ময় বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই সকল ভাবেরই এক একটী মূর্ত্তি লীলায় প্রকাশমান। শ্রীরাধা এই কুটিল ভাবকে অনেক সময় অতিক্রম করিতে পারিতেন না, আর যখন পারিতেন, তখন তিনি তাহাকে পরিহাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণান্তিকে চলিয়া যাইতেন, এই ভাবকে স্বীয় ভাবের অনুকূল করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন না, অর্থাৎ, ননদী শ্রীরাধার সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিতে পারিতেন না। আমরা উত্তম ভক্তির লক্ষণে দেখিতে পাই যে, সকল ইন্দ্রিয়ের ও ভাবনিচয়ের অনুকূলতা সহকারে শ্রীভগবানের সেবাই উত্তম ভক্তি বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু ব্রজধামে ইহা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান দেখিতে পাই না। সেখানে জটিলা কুটিলা সরলা মধুরা হইল না, তাহারা জটিলা কুটিলাই রহিয়া গেল। তাহাদের অগোচরে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইত। কিন্তু শ্রীনবদ্বীপধামে জটিলতা-কুটিলতারূপ প্রতিকূলতার মুর্ত্তি শাশুড়ী ননদী গৌরপ্রেমের অনুকূল হইয়া গেল। এই জটিল কুটিল ভাবই চিন্ময়রাজ্যে শ্রীভগবদ্ভজনে চতুরতা সম্পাদন করে! এই চতুরতা কিরূপ, তাহা ভক্তমাত্রেই বুঝিতে পারেন। যাহা হউক, লীলার কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া কেবল তত্ত্বকথা বলিলে রসাস্বাদনে বিঘ্ন জন্মায়। এখন দেখুন, নদীয়ার ননদীগণ নাগরীগণের সঙ্গপ্রভাবে কিরূপে শ্রীগৌর-প্রেমে ধন্য হইয়া গেলেন। এক ননদী সর্ব্বদাই নাগরীর দিকে লক্ষ্য রাখিতেন, কখন তিনি গোপনে গৌরদর্শনে গমন করেন। তাই নাগরী যখন সুরধুনীতে জল আনিতে যাইতেন, ননদীও সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন, কিন্তু তিনি গৌরপ্রেমে ঠেকিলেন। যথা—

ওরূপ মাধুরী হেরিয়া ননদী ধৈরজ ধরিতে নারে।
হইল বিষম থরহরি তনু কাঁপয়ে মদন ভরে॥

কাঁখের কলস ভূমেতে পড়ল আউলাইল মাথার কেশ।
অঙ্গের বসন খসে অনায়াসে স্মৃতির নাহিক লেশ॥

তখন ননদী ধৈর্য্যধারণ করিয়া অধিক লজ্জিত হইয়া নাগরীর অনুগত হইলেন। নাগরীর করে ধরিয়া তিনি বলিলেন—

নিশ্চয় জানিহ, গুণবতী বধূ, পরাণ অধিক তুমি।
কহিয়াছি কত, দোষ না লইবে, তোমার অধীন আমি॥

ননদী তখন শপথ খাইয়া বলিলেন যে, তিনি অতঃপর নাগরীর গৌর-দর্শনে বাধা দেওয়া দূরের কথা, তাহাতে সম্পূর্ণ সহায়তা করিবেন এবং নাগরী তাঁহাকে যখন যে কাজ করিতে বলিবেন, তখন তাহা নিঃসঙ্কোচে করিবেন। নাগরীর কাছে তিনি আবার প্রার্থনাও জানাইলেন যে তিনি যেন গৌরদর্শনের তাঁহাকে সহায়তা করেন; কারণ, শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে পাগল করিয়াছেন, তাঁহাকে না দেখিলে তিনি আর প্রাণে বাঁচিবেন না। ননদী বলিতেছেন—

যখন যে কাজ কর তাহা মোরে কবে নিঃসঙ্কোচ হঞা।
এ পরাণ দিয়া সহায় করিব বলিএ শপথ খাঞা॥

আনে না কহিও সে সব কাহিনী রাখিহ গোপন করি।
ঠেকিনু এ রসে কি কব পাগলী করিবে গৌরহরি॥

ননদীর এই কথা শুনিয়া নাগরীর বড় সুখ হইল এবং পূর্ব্বে যে তাঁহাকে জ্বালা দিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার আবার দুঃখও হইল। তখন তিনি ভাবিলেন যে, ননদীর একথা ব্যক্ত করিলে তাঁহার বিশেষ উপকার হইবে; শুধু তাঁহার কেন, সকল নাগরীর উপকার হইবে, কারণ তখন সকলে বুঝিতে পারিবে যে, নাগরী যে গৌররূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, ইহা তাঁহার অন্যায় নহে, কারণ প্রাণের স্বাভাবিক প্রেরণায়ই

তিনি গৌররূপ দেখিয়া ভুলিয়াছেন; যে পর্য্যন্ত জীব শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন না পায় কিংবা তাঁহার বিশুদ্ধ মাধুরীর আস্বাদন না পায়, সেই পর্য্যন্তই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি বিদ্বেষ বা বহির্ম্মুখতা থাকে, কিন্তু একবার তাঁহার দর্শন পাইলে জীব আর বহির্জ্জগতের মায়ায় মুগ্ধ হইবে না, সে চিন্ময় জগতে প্রবেশ করিয়া অনন্ত সুখময় রাজ্যে বিচরণ করিবে। কিন্তু শ্রীল নরহরি বলিতেছেন, হঠাৎ সকলের কাছে একথা ব্যক্ত করার প্রয়োজন কি, আপন মনে আস্বাদন করিয়া যাওয়া ভাল। নিজের ভাব গাঢ় হইলে জগত সংসার এই ভাবের অনুকূল হইয়া যাইবে। বলিয়া কহিয়া প্রয়োজন কি? স্বভাবে থাকিলে স্বভাবতঃ সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত হইবে ও তাঁহার রূপরস আস্বাদন করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে। বলিতে গেলে বলাও হইবে না, নিজের ভাবের দৃঢ়তাও কমিয়া যাইবে। কার্য্যদ্বারা স্বয়ং আচরণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের অপার মাধুর্য্য প্রদর্শন করাই ভাল। নরহরি বলিতেছেন, ননদীর কথা

শুনিয়া বাড়িল অশেষ সুখ।
পূরবের কথা বিচার করিতে উঠিল অনেক দুখ॥
মনেতে হইল এ সকল কথা বেকত করিলে কাজ।

কিন্তু—

নরহরি কহে—সাধুরীতি যার, সে রাখে পরের লাজ।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর সত্যই বলিয়াছেন যে, ভাব গাঢ় না হইলে, ষোলআনা প্রাণখানি তাঁহাকে না দিলে শ্রীগৌরাঙ্গসঙ্গ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। দুই একবার তাঁহার দর্শন পাইলেই কিংবা ননদীরূপ প্রতিকূল ভাব দুই একবার অনুকূল হইলেই যে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত নিত্য মিলিত হওয়া যাইবে, তাহা নহে। এই ননদীকে চিরানুকূল করিতে হইবে। এই ননদী যে আমাদের প্রতিকূলাচরণ করেন, ইহাতে তাঁহার দোষ

কি? আমরাই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে অবসর দেই এবং, এমন কি, পরোক্ষে সহায়তাও করি। যে সকল ভাব শ্রীভগবদ্ভজনের প্রতিকূল, ভগবৎকৃপায় উহা সময় সময় অনুকূল হয় বটে, কিন্তু অনেক সময় উহা সাধনের অঙ্গীভূত না করিয়া উহাতে আমরা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া যাই; লোকের কাছে উহা বলিয়া বেড়াই এবং তাহাতে পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত হই। তাই নরহরি বলিতেছেন যে, যাঁহার সাধুরীতি, তাঁহার ইহা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য নয়। যিনি সাধন করেন, তিনিই সাধু। নরহরি সরকার ঠাকুরের কথার তাৎপর্য্য এই যে, ননদীর এই সাময়িক অনুকূল ভাব লোকের কাছে না বলিয়া, স্বীয় সাধনের অঙ্গীভূত করিয়া ভাবকে এরূপ প্রগাঢ় করিতে হইবে, যেন এই প্রতিকূল ভাব স্থায়িরূপে অনুকূল হইয়া যায়, তাহা হইলেই আনন্দবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নিত্যসম-সুখ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যাহারা নিত্যসিদ্ধ কিংবা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধন সংস্কারের বলে শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা ত শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত ইতঃপূর্ব্বেই মিলিত হইয়া ভজনানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্ব্বধামোত্তম এবং সকল ধামের পরিপূর্ণ আদর্শ শ্রীনবদ্বীপ-ধামে বিভিন্নস্তরের ভক্তগণই বিরাজমান রহিয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর স্তরে স্তরে বিভিন্নভাবে ভক্তগণকে আকর্ষণ করিয়া সকলের হৃদয়ই শোধন করিয়াছেন এবং দুদিন পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক অধিকারিভেদে সকলকেই আনন্দরসে সিঞ্চিত করিয়াছেন। এইরূপে নদীয়াধামে লীলা করিয়া সমগ্র জগতের জন্য স্তরভেদ ও সাধনকৌশল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই যে সুরধুনী গমনকালে ননদী নাগরীর অনুকূল হইলেন এবং এমনকি, তিনি সর্ব্বস্ব দিয়া শ্রীগৌরভজনে তাঁহার সহায়তা করিবেন বলিয়া শপথ করিলেন, ইহার মধ্যেই ইঙ্গিতে ভজন-কৌশল বলিয়া দেওয়া হইল। সুরধুনী যাইতে পথেই যখন ননদীর ভাব

পরিবর্ত্তিত হইল, তখন সুরধুনীতে স্নান করিলে ত আর কথাই নাই। ভক্তির কর্ষণ করিলে ইন্দ্রিয়গ্রাম আপনা হইতে ভজনের অনুকূল হইয়া যাইবে, ইন্দ্রিয়-দমনের জন্য বৃথা প্রয়াস পাইতে হইবে না।

কোন ননদী কৃপাপ্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে নাগরীর গৌরদর্শনে সুযোগ হইল। আবার কোন ননদী রাগ করিয়া নাগরীকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন, ইহাতেও গৌর-দর্শনের সুবিধা করিয়া দিল। শ্রীবৃন্দাবনে গোপীকুলশিরোমণি শ্রীরাধা ননদীকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণান্তিকে চলিয়া গেলেন, আর, শ্রীনবদ্বীপধামে ননদীই আপনা হইতে নাগরীকে ছাড়িয়া গেলেন। ইহাতে নবদ্বীপ-দেবীগণের সাময়িক গৌরদর্শনে সুযোগ ঘটিল বটে, কিন্তু তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত নিত্যমিলিত হইলেন না। কোন কোন সময় ভাবের প্রাবল্যে বিরুদ্ধভাবনিচয় দূরে সরিয়া যায় বটে এবং শ্রীভগবান্‌কে সাময়িক দর্শন করিতে সুযোগও প্রদান করে বটে, কিন্তু তাহাতে নিত্যসুখ হয় না। সকল ভাবকে প্রেমের অনুকূল করিতে হইবে, সকল ভাবকেই মহাভাবে নিয়া পর্য্যবসিত করিতে হইবে—ননদীকে ছাড়িতে বা ছাড়াইতে হইবে না, চিরসঙ্গী করিতে হইবে, তাহা হইলেই শ্রীভগবৎসঙ্গজনিত নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ভাবের প্রাবল্যে যখন বিরুদ্ধ-ভাবসমূহ দূরে সরিয়া যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের নিকট উদিত হয়েন বটে, কিন্তু স্থায়িরূপে তাঁহার নিকট বিরাজ করেন না। তিনি জীবের হৃদয়ে উদিত হইয়া পন্থা বলিয়া দিয়া যান, যেন সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া জীব যাবতীয় ভাবকে মহাভাবের অনুকূল করিতে পারে, এবং সেই অবস্থায় পৌছিয়া শাশুড়ী ননদী সকলকে লইয়া সে স্থায়ীভাবে পরিপূর্ণ রসাস্বাদন করিতে পারে। নদীয়ানগরে শ্রীগৌরলীলায় এই ভাবের আদর্শ একটী নাগরীর চিত্র দর্শন করুন। এক নাগরী তাঁহারই মত ব্যথিত আর এক নাগরীর নিকট মনের দুঃখ বলিতেছেন—

কি বলিব ওগো ঘরের কথা।
সে সব শুনিলে পাইবে ব্যথা॥
কালি সুপ্রভাত হইল নিশি।
বিরলে দেখিনু গৌরশশী॥
মরুক এখন লাজে কি করে।
সে কাহিনী কিছু কহিএ তোরে॥
আমারে রাখিয়া ননদী স্থানে।
শাশুড়ী গেলেন সে পাড়া পানে॥
এথা ননদিনী করিল দ্বন্দ্ব।
কহিল আমারে অনেক মন্দ॥
নিজ জিত লাগি সকল ছাড়ি।
রুষিয়া গেলেন পরের বাড়ী॥

ঝগড়া বিবাদ একজনে হয় না। ননদী যে দ্বন্দ্ব করিলেন, ইহাতে নাগরী যে একবারে নির্দ্দোষ তাহা বলা যায় না। এরূপ ঝগড়া বিবাদ করিয়া ননদীকে তাড়াইয়া দিলে সাময়িক সুবিধা হইতে পারে, নাগরীরও তাহাই হইয়াছিল, কিন্তু ননদীকে পথে আনিতে না পারিলে নাগরীর স্থায়িভাবে সুযোগের আশা কোথায়? নাগরী ননদীকে তাড়াইয়াই দিউন, অথবা ননদী আপনা হইতেই রাগ করিয়া চলিয়া যাউন, ননদী নাগরীকে ক্ষণকালের তরে ছাড়িয়া গেলেন। ইহাতে নাগরীর গৌরদর্শনে সাময়িক সুযোগ সংঘটিত হইল। নাগরী বলিতেছেন—

একাকিনী মুই রহিনু ঘরে।
বসিনু যাইয়া গবাক্ষ দ্বারে॥
গৌররূপগুণ ভাবিয়া মনে।
চাহিয়া রহিনু পথের পানে॥

হেনই সময় গৌরাঙ্গ সখা।
আমাদের পথে দিলেন দেখা॥

নাগরী শ্রীগৌরাঙ্গের রূপগুণ ভাবিবার অবসর পাইলেন, কারণ তিনি এখন একাকিনী। ভাবিতে ভাবিতে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনও পাইলেন, তাঁহার শ্রীচন্দ্রবদন দর্শন করিয়া হৃদয়ের দুঃখও কিছু কালের জন্য ভুলিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত একবারে নিত্য মিলিত হইলেন না। শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহাকে সময় দিলেন এবং ইঙ্গিতে তাঁহাকে সেই সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার হৃদয়খানি ষোলআনা শ্রীগৌরাঙ্গকে দিবার জন্য বিশুদ্ধ করিয়া লইতে বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নাগরীকে দর্শন দিয়া কি বলিয়া গেলেন, নাগরীর কথায়ই তাহা বলিতেছি—

অলখিতে লখি ও চাঁদমুখ।
বিসরিনু কিছু হিয়ার দুখ॥
তুরিতে মলিন কুমুদ কলি।
গবাক্ষের পথে দিলাম ফেলি॥
তা দেখিয়া গোরা চতুর অতি।
করে লৈয়া কহে কুমুদ প্রতি॥
চিন্তা নাহি শশী উদয় হবে।
দিনকর-তাপ দূরেতে যাবে॥

বিরহবিধুরা নদীয়ানাগরী তাহার মলিন হৃদয়খানি শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যাখান করিলেন না, একবারে গ্রহণও করিলেন না। তিনি আশ্বাস দিয়া ইঙ্গিতে কহিলেন যে, সংসাররূপ দিনকর-তাপে বর্ত্তমানে তাঁহার হৃদয়পদ্ম মলিন হইয়াছে বটে, কিন্তু যখন হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার আরম্ভ হইবে, তখন প্রেমচন্দ্রিকার সমুদয়ে

তাঁহার তপনতাপক্লেশ দূরে যাইবে এবং তখন তিনি তাঁহার পরিপূর্ণ সঙ্গ পাইতে অধিকারিণী হইবেন।

সুচতুর শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্কেতে এই উত্তর দিয়া মৃদুমধুর হাসিয়া নাগরীর প্রতি নয়নকোণে একবার চাহিলেন,

এত কহি হাসি নয়ানকোণে।
বারেক চাহিল আমার পানে॥

নাগরীর তখন কি অবস্থা হইল! না,

অমনি অবশ হইল তনু।
বিষম সাপেতে দংশিল জনু॥

নাগরীর তখন বড় সাধ হইল, এহেন গৌরাঙ্গচাঁদে একবার যাইয়া স্পর্শ করেন। বাড়ীতে আর কেহ নাই; তিনি একাকিনী। মন্দ কহিবার কেহ নাই, প্রধান অন্তরায় ননদী ত রাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন, শাশুড়ী ত আগেই গিয়াছেন, এখন তিনি গেলেই পারেন। কিন্তু তাহা পারিলেন না। নাগরীর তখন কি দশা হইল, তাহা তিনি নিজেই বলিতেছেন—

যতনে ধৈরয ধরিতে নারি।
মনে হয় গিয়া পরশ করি॥
ঘন ঘন কাঁপি ঘামিল গা।
উঠিয়া চলিতে না চলে পা॥
কি কহিব চিতে প্রবোধ দিয়া।
রহিলাম অতি আতুর হৈয়া॥

শ্রীগৌরাঙ্গ ইঁহাকে সময় দিয়া এবং হরিনাম সংকীর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। যাঁহাদের হৃদয় শুদ্ধ হয় নাই, তাঁহাদের জন্য এই হরিনাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞই একমাত্র ব্যবস্থা—

ইহাই অতি সহজ পন্থা। কলিহত দুর্ব্বল জীবের ইহাই একমাত্র আশ্রয়। ভবরোগের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবার নিমিত্ত এই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞই একমাত্র মহৌষধ। ননদীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে না বা তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে না। ইহাকে সঙ্গে লইয়াই শ্রীগৌর-চরণান্তিকে পৌছিতে হইবে। তাই আমরা দেখিতে পাই, শ্রীগৌর-ভক্ত একাকী তাঁহার নিকট যান না; তিনি সপরিবারে—সকল আত্মীয় স্বজন লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে যাইয়া উপনীত হন। তাই আমরা দেখিতে পাই, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া যখন সংকীর্ত্তন যজ্ঞ প্রচার করিলেন, তখন কত শাশুড়ী ননদী প্রেম পাইয়া ধন্য হইলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, প্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে, শ্রীবাসের বাড়ীর দাসদাসী, এমন কি তাঁহার বাড়ীর কুক্কুর পর্য্যন্ত তাঁহার বড় প্রিয়, কারণ, শ্রীবাসের অঙ্গন তাঁহার সংকীর্ত্তন-যজ্ঞস্থলী। তাই আমরা দেখি, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মুখ দিয়া শ্রীপ্রভু বলাইলেন যে, উচ্চ সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া, মানবের আর কথা কি, কীট পতঙ্গ তরুলতাদি পর্য্যন্ত মুক্ত হইয়া যায়। প্রভু তাই শ্রীমুখে বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়, সংসাররূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সর্ব্বসুমঙ্গলরূপ চন্দ্রমার জ্যোৎস্না জগতে বিতরিত হয়, বিদ্যারূপ বধূর জীবন দান করা হয়, আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হয়, পূর্ণ অমৃত আস্বাদন হয় ও ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বোপরি যাবতীয় জীব অমৃতরসে অভিসিঞ্চিত হয়, যেন সকলে সেই রসে স্নান করিয়া উঠে। প্রভুর স্বরচিত শ্লোকটী এই,

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

এই অপূর্ব্ব শ্লোকটীর প্রতিপদের ভাবগাম্ভীর্য্য হৃদয়ঙ্গম করুন এবং রসমাধুর্য্য আস্বাদন করুন।

এই শ্লোক প্রভু শেষে রচনা করেন এবং ইহার মর্ম্মার্থ সমগ্র জগতে শেষে প্রকাশ করেন; কিন্তু নদীয়ানাগরীকে ইহার পূর্ব্বাভাস দিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, সেই নাগরীকুমুদ সম্প্রতি মলিন বটে, কিন্তু শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের সঙ্গে তিনি প্রফুল্ল হইবেন এবং তখনই তিনি পরিপূর্ণরূপে শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাপ্ত হইবেন।

এই যে নাগরীর কথা বলা হইল, ইনি ননদীরূপ প্রতিকূলতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিতেন। দ্বন্দ্ব করা পুরুষের স্বভাব, ইহা অভিমানের পরিচায়ক। যে পর্য্যন্ত জীব মনে করে যে, সে সাধন ভজন করিয়া সমস্ত প্রতিকূল ঘটনা অতিক্রম করিবে ও তদনন্তর শ্রীভগবৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইবে, সে পর্য্যন্ত সে কেবল অভিমানেরই পোষণ করিয়া থাকে। এই সাধনের অবস্থায় সে সকলের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু সাধনের অতীত পরমপুরুষকে সে প্রাপ্ত হয় না। তাঁহাকে পাওয়ার একমাত্র উপায় তাঁহার কৃপা। প্রভু নিজমুখেও এই কথা শেষে রায় রামানন্দের নিকট বলিয়াছেন। প্রভু ভক্তভাব আচরণ করিয়া শ্রীভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া রাম রায়কে বলিলেন, "বল, রামরায়, তাঁহাকে কিরূপে পাই! যে বস্তু সাধনের বিষয়ীভূত, তাহা সাধন করিয়া পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ ত সাধনের বিষয়ীভূত নহেন, যদি তাহাই হইতেন, তবে যত প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন হইতে পারে, তাহা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম; কিন্তু তিনি ত তাহা নহেন। অতএব রামরায়, বল দেখি এহেন সাধনাতীত বস্তুকে কিরূপে

প্রাপ্ত হই?" এই বলিয়া প্রভু রামরায়ের নিকট ব্যাকুলান্তঃকরণে কৃপাভিক্ষা চাহিলেন; যথা—

সাধ্য বস্তু সাধন বিনা পাওয়া নাহি যায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়॥

ভক্ত ও শ্রীভগবানের কৃপাব্যতিরেকে এহেন দুর্লভ বস্তু পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকার অন্যত্র আবার বলিয়াছেন—

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

এই জন্যই শ্রীভক্তগণ সকল জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া উচ্চ-সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যেন ইহা শ্রবণে সকলে শুদ্ধচিত্ত হইলে তাহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়। তাই, শ্রীভক্তগণের নিকট কৃপাভিক্ষা করা এবং বিরলে বসিয়া অবলার মত ক্রন্দন করা ব্যতিরেকে আমাদের শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির আর কোন উপায়ান্তর নাই! এই কৃপা আসিয়া কিরূপে জীবকে ধন্য করিয়া দেয়, তাহা জীববুদ্ধির অগম্য; ইহা কেবল আস্বাদনের বস্তু। যিনি এই কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন।

নীরবে বসিয়া অশ্রুপাত করা ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করাই অবলার ধর্ম্ম। এই শ্রেণীর জীবগণ কোন মন্ত্র উচ্চারণও করেন না, কিংবা কোনও বিধিরও অনুসরণ করেন না; ইঁহারা সম্পূর্ণ অভিমান বিবর্জ্জিত। ইঁহারা জোর করিয়া স্বীয় ক্ষমতায় শ্রীভগবৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া অহঙ্কার করেন না; কাজেই শ্রীভগবান্ ইঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যান এবং পরিপূর্ণ প্রেমরস প্রদান করেন। লীলার নিমিত্তই স্তরভেদ। কোন্ স্তর অপেক্ষা কোন্ স্তর শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট তাহা বিচার করিয়া বলা যায় না; কারণ, শ্রীভগবান্ আনন্দময়,

তাঁহার লীলাও আনন্দময়, প্রত্যেক স্তরই আনন্দময়, প্রত্যেক স্তরই উৎকৃষ্ট। "যার যেই ভাব, সেই সর্ব্বোত্তম।" যাহা হউক, যাঁহারা অবলার স্বভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং আসিয়া হাতে ধরিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাদের নিকট তিনি পরিপূর্ণ প্রেমমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত হন, সর্ব্বধামোত্তম নবদ্বীপধামে তাহার আদর্শ একটী নদীয়ানাগরীর চিত্র দর্শন করুন।

নবযুবতীগণ নদীয়ানাগরবরের দর্শন পাইয়া ভুলিয়াছেন, কিন্তু শাশুড়ী ননদীর জ্বালায় ঘরের বাহির হইতে পারিতেছেন না। পতি বড় একটা কিছু বলেন না, কিন্তু ননদীর ধমক খাইয়া মাঝে মাঝে কিছু না বলিয়াও পারেন না। যুবতীগণ ঘরে বসিয়া আর কি করিবেন! তাঁহারা বসিয়া বসিয়া কাঁদেন আর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন। ননদীর সঙ্গে তাঁহারা কলহ করেন না, কিংবা ননদীকে গৌরাঙ্গের কথা বুঝাইতেও চেষ্টা করেন না। কেবল বসিয়া কাঁদেন। অশ্রুজলই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। এহেন অবলার কাছে গৌরাঙ্গসুন্দর পরাজত। তিনি গোপনে আসিয়া যুবতীগণকে দর্শন দিতে লাগিলেন। শুধু দর্শন নহে, তাঁহাদিগের সহিত রসবিলাসাদি করিতে লাগিলেন। গোপনে কিরূপ? না, স্বপ্নে। চিন্ময় অবস্থায় স্বপ্নে ও জাগ্রতে কোন প্রভেদ থাকে না। দেহের বন্ধন কিঞ্চিন্মাত্র থাকিলেও আর এই দেহ লইয়া শ্রীভগবৎরস পূর্ণরূপে আস্বাদন করা যায় না। তখন ভগবদ্-বাসনার প্রাবল্যে স্বপ্নে অর্থাৎ আত্মার সূক্ষ্মাবস্থায় রসাস্বাদান হয়। এই রসাস্বাদন করিতে করিতে ভাব সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হইলে স্থূল সূক্ষ্ম, জাগ্রৎ স্বপ্ন এক হইয়া যায়। তখন, যে দেহ জড় বলিয়া প্রতীত হয়, উহাই চিন্ময় হইয়া যায়, অর্থাৎ, এই দেহ লইয়াই চিদানন্দরস আস্বাদনে অধিকার

হয়। এতাদৃশ নদীয়া-নাগরীগণেরও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহারা শাশুড়ী ননদীর জ্বালায় স্বীয় দেহ লইয়া শ্রীগৌরান্তিকে যাইতে পারিতেন না। তাই বলিয়া তাঁহারা শাশুড়ী ননদীর সহিত কলহ করিয়া জড়দেহের জড়তা আরো বাড়াইতেন না। নীরবে বসিয়া কেবল কাঁদিতেন, আর, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন। ইহাতে তাঁহাদের ভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল, তাই তাঁহারা স্বপ্নে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গসুখ আস্বাদন করিতেন। এ স্বপ্ন মিথ্যা নহে। সত্য বস্তুর সকলই সত্য। প্রভাত সময়ে উঠিয়া যুবতীগণ মিলিত হইয়া নিশির স্বপনকথা পরস্পর আলাপ করিয়া বড় সুখ পাইতেন। এক নাগরী বলিতেন, আর, সকলে আগ্রহসহকারে মন দিয়া শুনিতেন এবং আবার তাঁহার বলা শেষ হইলে অন্যান্য নাগরীগণ স্বস্ব স্বপনবারতা বর্ণনা করিতেন, আর সকলে আঁখির জলে ভাসিতেন, এবং তাঁহারা যে জাগ্রতাবস্থায়ও তাঁহার সঙ্গে নিত্য মিলিত হইবেন, স্বপ্নে তাহার পূর্ব্বাভাস মনে করিয়া বড় আশ্বস্ত হইতেন ও আনন্দসাগরে ভাসিতেন। এখন দেখুন, নাগরীগণ কি দর্শন করিতেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত কিরূপ রস-বিলাসাদি করিতেন। শ্রীনবদ্বীপদেবীর অনুগত হইয়া অবহিতচিত্তে শুনুন, আপনিও আনন্দরসে সিঞ্চিত হইবেন, এবং নাগরীর মত আপনিও শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গসুখাস্বাদনে অধিকারী হইবেন।

কোন নাগরী বলিতেছেন—"সজনি গো! রজনীর স্বপন কথা নিলাজী হইয়া তোরে বলি—গোরা গুণমণি চকিতে চৌদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে আমার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল। আসিয়া সে হাসিয়া হাসিয়া আমার শিয়রে বসিয়া আমার অধরখানি স্পর্শ করিয়া সুখের সাগরে ভাসিতে লাগিল; আর নানাবিধ সুমধুর বাণীতে আমার আনন্দবর্দ্ধন করিল। প্রাণ-সজনি! তারপরে প্রাণবল্লভ আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া প্রেমনীরে ভাসিতে লাগিল। আমাকে সখি প্রাণনাথ এতই ভালবাসে!

আমার মনে হইল, প্রাণের নিধি পাইলাম, এখন যে, সখি, একতিলও তাহাকে ছাড়া থাকা দায় হইল!

রজনী-স্বপন শুনগো সজনি, বলি যে নিলাজী হৈয়া।
ধীরে ধীরে গোরা মন্দিরে প্রবেশে চকিতে চৌদিকে চাঞা॥
হাসিয়া হাসিয়া বসিয়া বসিয়া আসিয়া শিথান পাশে।
নিজ করে মোর অধর পরশি সুখের সায়রে ভাসে॥
সুমধুর বাণী ভণে নানাজাতি মাতিয়া কৌতুকছলে।
ভুজে ভুজ দিয়া হিয়া মাঝে রাখি ভিজয়ে আঁখির জলে॥
আপনার মনে মান পাইনু নিধি তিলেক ছাড়াতে ভার।
নরহরি-প্রাণ-পিয়া পিরীতি মূরতি কি কব আর॥

ইহা শুনিয়া আর এক নাগরী বলিলেন, "সখিরে! পরাণ-বঁধু এত রস জানে! লাজ সরম ছাড়িয়া প্রাণের কথা তোমারে কহিতেছি। নিশিশেষে গোরাচাঁদ আসিলেন। আমি মান করিয়া তাঁহাকে কত কি কহিলাম। তিনি যেন কত অপরাধীর মত আমার নিকটে আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিবার জন্য কত সাধিলেন। এমন সময় আমার সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল।" যথা পদ—

শুন শুন নিশি- স্বপন সই।
লাজ তেয়াগিয়া তোমারে কই॥
প্রভাত সময়ে সুচারুবেশে।
আইলেন গৌর আমার পাশে॥
সে চন্দ্রবদন- পানেতে চাঞা।
বলিনু—"কি কাজে আইলা ধাঞা॥
সুখে গোঞাইলে রজনী যথা।
তুরিতে যাইয়া মিলহ তথা॥

গুপত না রহে বেকত পীরিতি।
তা সহি জাগিয়া পোহালে রাতি॥"
শুনি কত শত শপথ করে।
পরশের আশে সাধয়ে মোরে॥
হেন কালে নিঁদ ভাঙ্গিয়া গেল।
নরহরি জানে যে দশা হৈল॥

ভক্তগণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভের নিকট এই রূপই মান করিয়া থাকেন; আর শ্রীভগবান্ তখন ভক্তকে সাধিতে থাকেন। বাস্তবিকই শ্রীভগবান্ জীবের জন্য চিন্তিত। জীব তাঁহাকে চায় না, চাহিতে জানেও না। তাই তিনি গোলোক ছাড়িয়া ভূলোকে অবতীর্ণ হন এবং ভূলোককে গোলোকে পরিণত করিয়া দেন। জীব ভূলোক ছাড়িয়া যায় না—যাইতে পারেও না। তিনি স্বয়ং প্রেম যাচিয়া জীবের প্রেম বাড়াইয়া দেন। ভক্তের সঙ্গে শ্রীভগবানের এই লীলা-মাধুরী আস্বাদনের বিষয়, কহিবার কথা নহে।

এই কথা শুনিয়া আর এক নাগরী অতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে তাঁহার স্বপ্নের কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "ওগো সজনি! শুন, শুন, আমার স্বপ্নের কথা বলি। কাল অনেক কষ্টের পর নদীয়ার শশী আসিয়া আমার ঘরে উদিত হইলেন। এমন সময় দারুণ ননদী দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, 'পর-পুরুষের সঙ্গে বিলাস কর, ইহাতে তোমার ভয় নাই! আচ্ছা, কাল প্রভাতে ভাই বাড়ী আসিলে তার কাছে এসব কথা জানাইয়া আমি মানে মানে আপনার লাজ লইয়া চলিয়া যাইব। এ ঘরে আর রহিব না।' সজনি গো! ইহা শুনিয়া ভয় পাইলাম। ভয়ে ভয়ে মনে ভাবিলাম, নিশি পোহাইলে না জানি পতি গৃহে আসিয়া কি এক বিপরীত কার্য্য করিয়া ফেলে। আমাকে গঞ্জনা করিবে, তাহাতে

আমি ব্যথা পাইব না। আমার ভয় হইল, পাছে বা লোকে আমার প্রাণনাথের কলঙ্ক করে। লোকে ত আর বুঝে না আমাদের প্রাণবল্লভ কি বস্তু! সখিরে! বিধি যদি ইহা ব্যক্ত করিয়া ফেলে, তবে ত বিষম হইবে। জনমের মত আর নদীয়ারচাঁদকে দেখিতে পাইব না। এ পাড়া পানে তিনি আর কখন আসিবেন না, আমাকেও আর মনে করিবেন না। সখি! লোকেরই বা দোষ কি! আমি অভাগিনী, আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, আমার প্রেম নাই। আমি তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিলাম না। তিনি ত আমায় ভালবাসেন। আমি যদি তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিতাম তবে আর এ দশা হইবে কেন? ননদীই বা বলিবে কেন? আর লোকেই বা বলিবার অবসর পাইবে কেন? সখি! আমি বড় অভাগিনী। এই বলিয়া, সখি! আমি ঘন ঘন সেই নাম লইয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সখিরে! এ আকুলতায় আমি হয় ত মরিয়া যাইতাম। হঠাৎ চেতন পাইয়া প্রাণ বাঁচাইলাম।” নাগরীর এতাদৃশ ভাব দর্শন করিয়া শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ইহা পদে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নরহরি ইহা বহিশ্চক্ষুতে দর্শন করিলেন, না মানস-নেত্রে কল্পনা করিয়া লইলেন, এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি; আবার বলিতেছি, নিত্য চিন্ময় বস্তুর সঙ্গ করিলে অন্তশ্চক্ষুঃ ও বহিশ্চক্ষুঃ এক হইয়া যায়। সত্য বস্তুর সঙ্গগুণে অসত্য বা মিথ্যাভাস আসিতে পারে না। সকল জীবই এক সূত্রে গ্রথিত। সূত্রের কোন স্থানে কম্পন হইলে উহা সমস্ত সূত্রে পরিব্যাপ্ত হয়। জীবগণের আত্মায় আত্মায় বন্ধন রহিয়াছে, সুতরাং কোন জীবের হৃদয়ে কোন এক ভাবের তরঙ্গ সমুত্থিত হইলে ঐ তরঙ্গে অন্যের হৃদয়ও আলোড়িত হয়। এই তরঙ্গের বেগ যতই প্রবল হয়, ততই উহা বহুদূরে পরিব্যাপ্ত হয়। জল যদি শান্ত থাকে, তাহা হইলে এই তরঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইতে কোন বাধা প্রাপ্ত হয় না; আর যদি এই তরঙ্গপথে আর একটী অনুকূল তরঙ্গ

পায়, তাহা হইলে উহার বেগ আরো বর্দ্ধিত হইয়া যায় এবং ক্রমে উহা সুদূরে চলিয়া যায়। কিন্তু যদি পথে প্রতিকূল তরঙ্গ পায়, তবে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং প্রবলতর তরঙ্গ ক্ষুদ্র তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। বহির্জগতে যে নিয়ম পরিদৃষ্ট হয়, অন্তর্জগতে তাহারই সূক্ষ্মাবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থূলজগতের নিয়ম সূক্ষ্মজগতের নিয়মেরই ছায়া বা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বাহিরের এই নিয়ম দেখিয়াই আমরা সহজে ভাবরাজ্যের কথা বুঝিয়া লইতে পারি এবং স্থিরচিত্ত হইলে ইহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারি। ভাবরাজ্য বলিতে কেহ ইহাকে কল্পনার রাজ্য মনে করিয়া মিথ্যা ও অনিত্য বলিয়া ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভাব সত্য ও নিত্য। বহিশ্চক্ষুতে পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় কার্য্য ভাবেরই অভিব্যক্তি। একই বস্তু ভাবের বৈষম্যে বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়। একই ব্যক্তি কাহারও নিকট পতি, কাহারও নিকট ভ্রাতা, কাহার নিকট দাস, কাহারও নিকট পুত্র বলিয়া গৃহীত হয়। একই নারীকে কেহ কামের চক্ষে দর্শন করেন, কেহবা প্রেমের মূর্ত্তিরূপে দর্শন করেন। সমগ্র জগতেই এই ভাবের খেলা হইতেছে, সর্ব্বত্রই এই ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে। এই তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতেই সমস্ত জীব আলোড়িত। নদীয়ানাগরীগণ যে ভাবে বিভাবিত ছিলেন, নরহরি সরকার ঠাকুরও সেই ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের ভাবতরঙ্গ আসিয়া যে, সরকার ঠাকুরের হৃদয় আলোড়িত করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সরকার ঠাকুরের কথাই বা বলি কেন? শান্ত অবস্থায় চিত্ত যখন স্থির হয়, তখন সকলের হৃদয়েই আসিয়া এই তরঙ্গ লাগে। গোবিন্দঘোষের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি মধুর রসের রসিক ছিলেন না; তিনি বাৎসল্যরসে বিভাবিত ছিলেন। তিনি এই বাৎসল্যরস হইতে নামিয়া আসিয়া শান্তরসের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া নাগরীগণের এই ভাবতরঙ্গ দর্শন করিয়া-

ছিলেন। শান্তরস দাস্য সখ্য প্রভৃতি চারিটী রসের ভিত্তিভূমি। এইভাবে বিচার না করিয়া সাধারণ জীবভাবে বিচার করিয়া দেখিলেও আমরা শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের কথা সম্পূর্ণ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনি শ্রীনবদ্বীপে বাস করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের তিনি অত্যন্ত অনুগত। তিনি নদীয়ানগরের অন্তঃপুরের কথা অবগত হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? আপনি আমিই যখন বহু অন্তঃপুরের কথা সহজে জানিতে পারি, তখন, নরহরি, যিনি এই ভাব লইয়া সর্ব্বদা বিচরণ করিতেন এবং শ্রীগৌররূপদর্শনে সরলচিত্তা প্রেমপ্রবণা কুলবালাগণের চিত্ত কিরূপ হইত ইহা জানিবার জন্য যিনি আগ্রহ করিতেন, তিনি যে নদীয়ার অন্তঃপুরের সংবাদ রাখিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ইহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর, সম্পূর্ণ সত্য। যাহা হউক, এই যে, নাগরীর কথাটী উপরে বর্ণনা করা হইল, সেই সম্বন্ধে নরহরি সরকার ঠাকুরের পদটী দেখুন। নাগরী বলিতেছেন—

শুন শুন ওগো সজনি, রজনী-স্বপন বলিয়ে তোরে।
অনেক যতনে নদীয়ার শশী আসিয়া মিলিল ঘরে॥
হেনকালে মোর দারুণ ননদী দুয়ারে দাঁড়ায়া কয়।
পর-পুরুষের সনে বিলসহ, ইথে না বাসহ ভয়॥
ভাল, ভাল, ভাই আইলে প্রভাতে এ সব জানাঞা তারে।
আপনার লাজ লইয়া যাইব না রব এ পাপ ঘরে॥
ইহা শুনি মনে বিচারিনু ভয় পাঞা পোহাইলে নিশি।
না জানি পতি কি বিপরীত ক্রিয়া করিবে গৃহেতে আসি॥
মোরে সবে কত গঞ্জনা করিবে তাহে না পাইব ব্যথা।
পাপলোকে পাছে প্রাণপিয়ারে বা কহয়ে কলঙ্ক কথা॥
যদি বিহি ইহা বেকত করয় তবে ত বিষম হব।
জনমের মত নদীয়াচাঁদেরে আর না দেখিতে পাব॥

এ পাড়ার পানে না আসিবে কভু মোরে না করিবে মনে।
মুই অভাগিনী জানিনু নিশ্চয় নহিলে এমন কেনে॥
এত বলি কাঁদি বেকুল হইনু সঘনে সে নাম লৈয়া।
নরহরি জানে প্রাণ বাঁচাইনু তুরিতে চেতন পাইয়া॥

এখানে দুইটী পদের ভাব গ্রহণ করুন। ননদী বলিতেছেন, তিনি আর এ 'পাপ ঘরে' থাকিবেন না, কারণ তাঁহার ভ্রাতৃবধূ 'পরপুরুষের' সঙ্গ করিতেছেন। তিনি যে পরম পুরুষ তাহা তিনি জানেন না। কাজেই তাঁহার ভাববিরোধা বিষয়কে তিনি পাপ মনে করিতেছেন। আবার নাগরী বলিতেছেন যে, পাছে পাপলোকে তাঁহার প্রাণবল্লভের অনর্থক কলঙ্ক করে, এইজন্য তিনি ব্যথিত হইতেছেন। তিনি জানিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রাণের পতি, আর তাঁহার ননদিনীর ভাই তাঁহার দেহের পতি। লোকে তাহা বুঝে না বলিয়াই তাঁহাকে মন্দ বলিবে তিনি এই আশঙ্কা করিতেছেন। তাই তিনি এতাদৃশ লোককে পাপলোক বলিলেন। পাপ বলিয়া কোন বস্তু বা কার্য্য নাই। স্বীয় ভাববিরোধী বস্তু বা বিষয়কেই লোকে পাপ বলিয়া মনে করে। কিন্তু শ্রীভগবদ্‌বিরোধী বিষয়ই প্রকৃত পাপ। নাগরী তাহাই বলিলেন। এই হিসাবে দৈহিক মঙ্গলের নিমিত্ত লোকে যে সকল ব্রতাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া থাকে, তাহাও পাপ, কারণ তাহাও জীবকে শৃঙ্খলিত করে, শ্রীভগবৎপ্রেম আস্বাদন করিতে দেয় না। তিনি কর্ম্মাতীত পরমপুরুষ।

এখানে নদীয়ানাগরীর প্রেমের গাঢ়তা দেখুন। তিনি বলিতেছেন, তাঁহাকে সকলে গঞ্জনা করিবে, তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই, কিন্তু তাঁহার প্রাণনাথের কলঙ্ক করিলে তাহা তাঁহার অসহ্য হইবে। তাঁহার দীনতা ও ভাবমাধুর্য্য কত! তিনি যখন বলিতেছেন যে, সকলে তাঁহাকে গঞ্জনা করিবে, তখন তিনি কাহাকেও পাপ-লোক বলিতেছেন না; কারণ তিনি

বুঝিতেছেন যে, লোকের দোষ কি? তাঁহারই প্রেম নাই। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে শুধু প্রাণের পতি করিতে পারিয়াছেন; দেহ মনঃপ্রাণ সকলের পতি করিতে পারেন নাই। সুতরাং, দেহের সম্বন্ধে যাঁহারা সম্বদ্ধ, তাঁহারা ত দৈহিক ভাবে মন্দ বলিবেই। এইজন্যই নাগরী পরে নিজকে নিজে বড় অভাগিনী বলিতেছেন। তাঁহার প্রাণনাথকে লোকে মন্দ বলিবে, ইহা তাঁহার সহ্য হইবে না। এই সময়ই তিনি লোককে পাপলোক বলিতেছেন—নিজের বেলা নহে।

এই নাগরীর নিকট আমরা আর একটী তথ্য শিখিলাম। যে পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্ প্রাণের সামগ্রী, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায় না এবং দৈহিক বন্ধনও ছুটে না। কিন্তু এই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে করিতেই দেহখানিও ক্রমে তাঁহাতে সমর্পিত হয়, তখন জড়দেহ চিন্ময় হইয়া যায় এবং ইহা লইয়াই শ্রীভগবৎসঙ্গ করিতে অধিকার হয়; তখন আর স্থূল ইন্দ্রিয়াদি বিরুদ্ধাচরণ করে না, বরং অনুকূল হয়। আমরা পরে দেখিতে পাইব, এতাদৃশ নদীয়ানাগরীগণের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

আর এক নাগরী স্বপ্ন দেখিতেছেন, রসিকশেখর গৌরাঙ্গ রায়. রজনীতে অতি গোপনে তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। কিন্তু ভুলে তাঁহার ননদীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া বসিলেন, ননদী সন্দেহ করিয়া পাহারা দিবার নিমিত্ত নাগরীর শয়নকক্ষেই শুইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় করপল্লবে ননদীর চিবুক ধরিয়া সোহাগ করিলেন। ভালবাসায় ত আর আপন পর ভেদ থাকে না! প্রেমিক ব্যক্তি বাছাবাছি করেন না। নাগরী তাহাকে ভালবাসেন, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিকট যাইবেন, আর ননদী প্রতিকূলাচরণ করেন বলিয়া তাহার প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্বেষ হইবে, ইহা শ্রীগৌরাঙ্গে সম্ভবে না। জীববুদ্ধিতে বিদ্বেষভাব থাকে। পরিপূর্ণ প্রেমের নিকট দ্বেষ হিংসা স্থান পায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ ভালবাসিয়াই ননদীর নিকট বসিলেন,

কিন্তু নাগরী ভাবিলেন যে, তিনি তাঁহারই নিকট আসিয়াছিলেন, ভুলে যাইয়া ননদীর নিকট বসিলেন। যথা পদ—

সজনি রজনী-স্বপন শুনহ এ বড় হাসির কথা।
মোরে আগুলিতে শুতিলা ননদী আমার শয়ন যথা॥
নদীয়ার শশী আসি প্রবেশিল অথির আনন্দ ভরে।
আমার ভরমে বসিলা ননদিনীর পালঙ্ক উপরে॥
ধীরে ধীরে করপল্লবে চিবুক পরশে হরিষ হৈয়া।
ননদী চেতন পাইয়া উঠে ঘন চমকি চৌদিকে চাঞা॥

ননদী প্রেমের ভাবে ভাবিত নহেন, স্থতরাং তিনি ভাবিলেন, চোর আসিয়াছে, তাই তিনি নাগরীকে জাগাইয়া বলিলেন, ঘরে চোর আসিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ আর কি করেন! তাঁহার প্রীতি তখনও ননদী সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই, কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন, পলাইয়া গেলেন না, কারণ তাঁহাকে একটু সময় দিয়া পরে কৃপা করিতে হইবে। ননদী তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া কত কটুকথা কহিলেন। কিন্তু কটু কহিলে হইবে কি? যে কোন ভাবেই হউক, সত্যবস্তুর সঙ্গ করিলেই কল্যাণ হয়। যিনি রসময়, ভালবাসা যাঁহার স্বভাব, যিনি হাসিমুখে ছাড়া কথা কন না, তাঁহাকে মন্দ বলিলে কি হইবে? তিনি হাসিমুখেই তাঁহার নিকট উদিত হইবেন এবং প্রেমরস প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইবেন। প্রেমিকের স্বভাব এই, তিনি ভালবাসা দিয়াই কৃতার্থ, ভালবাসা পাইয়া নহে। ভালবাসাই যখন তাঁহার ধর্ম্ম, তখন ননদী তাঁহাকে কটু বলিলে তিনি ছাড়িবেন কেন? কাজেই এহেন ভালবাসার কাছে ননদী পরাজয় স্বীকার করিলেন। ননদী তখন প্রেম পাইয়া নাগরীর অনুগত হইলেন, যথা পদ—

মোরে কহে জাগ জাগহ তুরিতে ঘরে সামাইল চোরা।
ইহা শুনি ভয়ে পলাইলা দূরে দাড়াঞা রহিলা গোরা॥

তার পাছে পাছে দারুণ ননদী ধাইল ধমক দিয়া।
কতদূর যাই পাইল পলাইতে নারিল পরাণ পিয়া॥
যৌবন গরবে মাতি অতিশয় ধরিয়া দুখানি করে।
কত কটুবাণী কহি রহি রহি লইয়া আইসে ঘরে॥
কিশোর বয়স রসময় গোরা চাহিয়া ননদী পানে।
বাঁধি ভুজপাশে করি পরাজয় কৈল যে আছিল মনে॥

তখন ননদীর কি অবস্থা হইল? না,

তেঁই অধোমুখে কহয়ে ঠেকিনু বিষম চোরের হাতে॥

আমরা যতই কেন শ্রীভগবান্‌কে সরাইয়া দিতে চাহিনা, তিনি সরিয়া যাইবার বস্তু নহেন! শ্রীল ঠাকুর মহাশয় * বলিয়াছেন—

আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা'
আপনা আপনি হইবে সাবধান।

ইহার কারণ এই, বহিরঙ্গ ব্যক্তির নিকট অন্তরঙ্গ কথা বলিলে সে ইহার রসাস্বাদন করিতে পারিবে না, তাহাতে রস-বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা, ভাবের লাঘব হয়। কিন্তু একই ভাবে ভাবিত লোকের নিকট প্রাণের কথা বলিলে আরো রসবৃদ্ধি হয়। এই নাগরীগণ সকলেই একই রসের রসিক। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের নিকট আপন কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতেছেন ও ইহাতে আরো রসপুষ্টি হইতেছে। নাগরীগণ পরস্পর মিলিত হইয়াছেন। গৌরছাড়া তাঁহারা কিছু জানেন না, অথচ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহারা তাঁহাকে পাইতেছেন না। তাঁহারা আর কি করিবেন! যিনি যেভাবে তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন, তাহাই পরস্পর পরস্পরের নিকট বলিয়া আনন্দ পাইতেছেন এবং ইহাতেই প্রাণের আশা কথঞ্চিৎ মিটাইতেছেন।

* ইঁহার জীবনী শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ কৃত নরোত্তম চরিতে সুললিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কোন নাগরী ভাবিতেছেন, তিনি গৌররূপে ভুলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ত স্বতন্ত্রতা নাই, তিনি পরাধীন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ স্বতন্ত্র পুরুষ। তিনি ত তাঁহার অধীন নহেন যে, তিনি আসিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, অথবা তাঁহাকে তাঁহার চরণান্তিকে লইয়া গিয়া চির আশ্রয়দান করিবেন। এই ভাবিয়া নাগরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কালযাপন করেন। চিদানন্দ পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট এই দীর্ঘনিশ্বাস পৌছিল। তিনি নাগরীকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন এবং আসিয়া তাঁহাকে কত আদর সোহাগ করিলেন। তাই নাগরী স্বপনের কথা অন্যান্য নাগরীর নিকট বলিতেছেন—

স্বপনে বন্ধুয়া মোর পালঙ্কে বসিল গো,
বারেক চাহিনু আঁখি কোণে।
পিরীতি মূরতি গোরা কত আদরিয়া গো,
আপনা অধীন করিয়া মানে॥
সে চাঁদ বদনে মোরে বারে বারে কয় গো,
পরাণ অধিক মোর তুমি।
ইহা বলি কোলেতে করিয়া সুখে ভাসে গো,
লাজেতে মরিয়া যাই আমি॥
সাজায়ে তাম্বুল মোর বদনে সঁপিয়া গো,
হরষে বিভোর হঞা চায়।
সে করপল্লবে পুনঃ অধর পরশি গো,
পরাণ নিছিয়া দেয় তায়॥
মধুর মধুর হাসি অমিয়া বরষে গো,
কিবা বা সে সুরসিক পণা।
নরহরির প্রাণপিয়া হিয়ার পুতলি গো,
যুবতী মোহিতে এক জনা॥

শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া বলিলেন, তিনি নাগরীর অধীন, ইহাতে নাগরী লজ্জিত হইলেন, এবং কোথায় তিনিই সেই প্রাণনাথের সেবা করিবেন। না, প্রাণনাথই আসিয়া তাম্বুল সাজিয়া তাঁহার বদনে অর্পণ করিলেন, ইহাতে তিনি আরো লাজে মরিয়া গেলেন। এমন করিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে প্রেমশিক্ষা দেন! তখন আর এক নাগরী বলিতেছেন, "সজনি গো, যুবতীর পরাণ-চোরা গোরা রায় এত রস জানে! কি জানি, সে কি এক অপূর্ব্ব রসে বিভোর! এহেন রস সে কোথায় শিখিল? এত রস কি মানুষে সম্ভবে? তবে শুন বলি, আমার সহিত তিনি কিরূপ রসিকতা করিলেন—

শুনরে স্বপন, আমা পানে চাঞা চাঞা গো,
যুবতী-পরাণ-চোরা গোরা।
জিনিয়া খঞ্জন যুগনয়ন নাচায় গো,
না জানি কি রসে হৈয়া ভোরা॥
হাসিয়া হাসিয়া আসি নিকটে বসিয়া গো,
ঘুঙট ঘুচায় নিজ করে।
'আহা মরি! মরি!' বলি চিবুক পরশি গো,
বদন নেহারে বারে বারে॥
কিবা সে পিরীতি তার মনে এই হয় গো,
গলায় পরিয়া করি-হার।
অঙ্গে অঙ্গে পরশিতে কত রঙ্গ বাড়ে গো,
নবীন মদন সাথী তার॥
অধরে অধর দিয়ে যত রসিকতা গো,
কি কব না শুনি কভু কাণে।
নরহরি প্রাণ পিয়া কোথায় শিখিল গো,
এত না রসের কথা জানে॥

এই কথা শুনিয়া আর এক নাগরী বলিতেছেন, 'সখিরে! আমারও দশা এইরূপ। তিনি আমার সহিত কিরূপ রসরঙ্গ করিলেন শুন,—

ওগো সই রসের ভ্রমর গোরা।
কে জানে মরম নব নবযুবতীর গো,
বদন-কমল-মধু-চোরা ॥ ধ্রু ॥
স্বপনে আসিয়া মোর নিকটে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা কয়।
না জানি কেমন সে অমিয় রস ঢালে গো,
ঘুচায় শ্রবণ-মনোব্যথা ॥
কত না আদরে মোর চিবুক পরশি গো,
কিবা সে ভঙ্গিমা করে ছলে।
অধরে অধর রাখি আঁখি না পালটে গো,
বদন ঝাঁপয়ে করতলে ॥
হিয়ায় ধয়য়ে হিয়া কি আর বলিব গো,
সঘনে কাঁপয়ে হেম দেহা।
নরহরি পরাণ বন্ধুয়া কিবা জানে গো,
সুখের পাথার তার লেহা * ॥

তখন আর এক নাগরী বলিলেন, 'সজনি গো, আমার সঙ্গে কাল কি কৌশলে আসিয়া মিলিলেন, তাহা বলি, শুন। স্বপ্নে দেখিলাম, রসরাজ গৌরাঙ্গসুন্দর কম্বল গায় দিয়া স্বীয় রূপমাধুরী ঢাকিয়া অলক্ষিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি ইহা দেখিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সাজের উদ্দেশ্য কি? তিনি বলিলেন, পাছে বা কাল ননদিনী তাঁহাকে চিনিতে পারে, এই জন্য ছদ্মবেশে আসিয়াছেন। যথা—

---

* লেহা—স্নেহ, ভালবাসা।

স্বপনের কথা শুন গো সজনি পরাণ-রসিক রায়।
অলখিত ঘরে প্রবেশিল কালি কম্বল উড়িয়া গায়॥
তাহা দেখি মৃদু হাসিয়া পুছিনু এ সাজ সাজিলে কেনে।
পিয়া কহে তুয়া ননদিনী কালি পাছে বা আমারে চিনে॥

শ্রীভগবান্ যে কত ছদ্মবেশে জীবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা ভক্তমাত্রেই জানেন। যিনি যেরূপ অধিকারী, তাঁহার নিকট তিনি সেই ভাবে আসেন এবং ক্রমে তাঁহার নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, কারণ হঠাৎ তিনি পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইলে জীব তাঁহাকে ধরিতে পারিবে না। নাগরী তখন কি করিলেন? নাগরী নিজেই তাহা বলিতেছেন—

এইরূপ কত কহিল, তা শুনি বসন ঝাঁপিয়া মুখে।
সুরুচির করে ধরি প্রাণনাথে পালঙ্কে বসানু সুখে॥
সে সময়ে মুখ-মাধুরী অধিক কি কব মনেতে বাসি।
কালিন্দীর জলে প্রফুল্লিত যেন কনক-কমলরাশি॥

এহেন মাধুরী দর্শন করিয়া ধৈর্য্য হারাইবার কথা। যদি সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিতেন, তবে ত একবারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িতেন! কেবল মুখখানি দেখিলেন, তাই অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। নাগরী বলিতেছেন—

তাহা হেরি ধরি ধৃতি সে কম্বল খসাঞা ফেলিনু মেন।
শরদের শশী ঘনঘটা হৈতে বাহির হইল যেন॥
হেনই সময়ে শাশুড়ী পুছয়ে ঘরেতে কিসের আলো।
তাহা শুনি তনু কাঁপিল অমনি পরাণ উড়িয়া গেল॥
তরাতরি গিয়া দাঁড়াঞা দুয়ারে চাহিয়া সভয় মনে।
সাহসে চাতুরী বচন কহিতে লাগিনু তাঁহার সনে॥
চন্দ্রব্রত মোর নিয়ম জানহ করিয়ে যতন পাইয়া।
কৃপা করি তেঁই দেখা দিল আজি পূজায় প্রসন্ন হৈয়া॥

বর দিতে চান কি বর মাগিব কিছু না জানিয়ে আমি।
আপনি যে কহ তাহা লই তাহে এথা না আসিহ তুমি ॥
ইহা শুনি ধীরে ধীরে কহে কত যতনে আনন্দ পাইয়া।
সম্পদ্ আয়ু-বৃদ্ধি শুভ সবার এতেক লেয়হ চাহিয়া ॥
ইহা শুনি শীঘ্র ঘরে সামাইল অতি আনন্দ বেশে।
বসন-অঞ্চলে অঙ্গ মুছাইনু বসিয়া পিয়ার পাশে ॥

অবোধকে ভুলাইতে অবোধের মত কথারই প্রয়োজন। যাহারা দৈহিক সুখসমৃদ্ধি লইয়া ব্যস্ত, তাঁহাদিগকে এই সব কথা কহিয়াই আপনার কাজ সাধিয়া লইতে হয়। অবশ্য সঙ্গগুণে তাঁহারাও বিষয়ের সুখ ছাড়াইয়া, সময়ে প্রেমানন্দরাজ্যে উপনীত হইবেন। হঠাৎ বিষয়ের সুখ ছাড়িতে বলিলে, বিষয়ের সুখ ত তাঁহারা ছাড়িবেন না, আরও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে এবং এই দ্বন্দ্বের ফলে, যে প্রেমটুকু অর্জ্জিত হয়, তাহাও নষ্ট হইবে।

সকলেই স্ব স্ব মনের কথা বলিতেছেন, এমন সময় আর এক নাগরী প্রেম-গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "প্রাণসজনি, আমি আর কি বলিব! তাঁহার ব্যবহারে আমি বড় লজ্জিত। তাঁহার সেবা করা দূরের কথা, তাহাকে লইয়া একদিন নিভৃতে বসিতেও পারিলাম না। কতলোকে তাঁহাকে কত শত প্রকারে ভালবাসে, আর আমি তাঁহাকে বিন্দুমাত্র ভাল-বাসিতে পারিলাম না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বিমুখ রহিলেন না। তিনি যে রসিকশেখর! প্রেমিক চূড়ামণি! কি আর কহিব! সখিরে!

সে নব নাগর রচয়ে আমার বেশ।
সিঁথির সিন্দূর সাজায় কত সে যতনে বাঁধিয়া কেশ ॥

শুধু তাহাই নহে—

আর কি বলিব—নাসার বেশর দিতে সুচঞ্চল হৈয়া।
অমনি শুতয়ে মোরে পরিসর বুকের উপর লৈয়া ॥"

শ্রীভগবান্ এইরূপেই অযাচিত ভাবে জীবগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন--

নরোত্তম দাসে কয় গোরা সম কেহ নয়
না যাচিতে দেয় প্রেমধন।

শ্রীগৌরাঙ্গ না চাহিতেই প্রেমধন দিয়া থাকেন। জীব জীববুদ্ধিতে আর কি চাহিবে! পাছে বা সে ধন, জন, ঐশ্বর্য্যাদি চাহিয়া বন্ধন-দশায় পড়িয়া প্রেমধনে বঞ্চিত হয়, এই জন্য তিনি প্রেমধন দিয়া জীবের হৃদয় পূর্ব্বেই পরিপূর্ণ করিয়া দেন, যেন বিষয়াদি চাহিতে সে আর অবসর না পায়। তিনি ত বাঞ্ছাকল্পতরু! তাঁহার নিকট কিছু চাহিলে তিনি ত আর না দিয়া পারেন না! ধ্রুব রাজ্যের কামনা করিয়া শ্রীহরিকে ডাকিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির দর্শন পাইলেন, তখন আর তাঁহার রাজ্যে স্পৃহা রহিল না বটে, তথাপি পূর্ব্ব বাসনার ফলে কিছুকাল তাঁহার রাজ্যভোগ করিতে হইয়াছিল ও সেই সময় শ্রীভগবৎসঙ্গ-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এ আখ্যান অতি পুরাকালের কথা। কলিকালের জীব আরো বিষয়বাসনায় বদ্ধ, তাই শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াধামে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বেই প্রেম বিলাইলেন, যেন জীবের আর চাহিবার কিছু না থাকে। জগতের যাবতীয় বিষয় ত প্রেমেরই অধীন! ভগবৎপ্রেমের সমুদয়ে বিষয়বাসনা জ্বালা না দিয়া প্রেমের পোষণ করে।

আমরা তাঁহার সেবা করিব কি? তিনিই আমাদের সেবা করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাকে ভক্তি করিব কোথা হইতে, তিনি যদি আমা-দিগকে ভক্তি না দেন! তাঁহার এক নাম যেমন ভক্তবৎসল, তেমনি আবার তাঁহার আর এক নাম ভক্তিদাতা। তিনি প্রথমতঃ জীবকে ভক্তি দান করেন, তারপর তিনিই আবার ভক্তবৎসল হন।

সে যাহা হউক, পরস্পর এইরূপ গৌরকথা কহিতে কহিতে নাগরী-

গণের মধ্যে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল। সকলেই এ তরঙ্গে বিচলিত হইলেন। এই অনুপম প্রীতিতে কেহ আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। ধৈর্য্যহারা হইয়া কোন রমণী বলিলেন, দুঃখভোগ করাইবার নিমিত্ত বুঝি বিধাতা আমাদিগকে নারী করিয়া সৃজন করিলেন। এ হেন গোরাচাঁদকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইলাম না। কেহ বলিলেন, রমণী হইয়াছি বলিয়া আর মনের আশা পূর্ণ হইল না। কিন্তু যখন রমণী হইয়াছি, তখন ত আর উপায়ান্তর নাই। ইহার মধ্যেই এক উপায় করিয়া লইতে হইবে। বিবিধ চাতুরী করিয়া গুরুজনের ত্রাস ঘুচাইব। কেহ বলিলেন, গুরুজনের আর কিসের ভয় করিব? প্রাণধন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের লাগিয়া নিশ্চয়ই গৃহ ছাড়িয়া দিব। আবার কেহ বলিলেন, এই নদীয়ার লোক বড়ই বিষম। প্রাণনাথকে কখন দেখি না, তথাপি লোকে কত কুবচন বলে। ইহাতে আর এক নাগরী বলিলেন, নদীয়ানগরে কলঙ্ক হইবে হউক, তথাপি প্রাণনাথকে ছাড়িতে পারিব না। প্রাণবল্লভকে হৃদয়ে রাখিয়া প্রাণের ব্যথা ঘুচাইব। কোন নাগরী বলিলেন, সজনি গো, দিবসরজনী আমারও এই বাসনা যে, শ্রীশচীনন্দন সনে আমার নিশ্চয়ই পরিবাদ হউক। কেহ বলিলেন, সখিরে, যাহাই কেন বল না, আর যে রহিতে পারি না, প্রাণ যে আনচান করিতেছে, বল কি উপায় করি! আবার, কেহ বলিলেন, সখি, আর কি বলিব, চল চল, কুললাজের কপালে আগুন দিয়া এখনি গিয়া প্রাণপতির সহিত অবিলম্বে মিলিত হই। তখন আর এক নাগরী বলিলেন, সখিরে! একি হইল! আমার যে বাম আঁখি স্পন্দিত হইতেছে। এ যে শুভলক্ষণ দেখিতেছি! তবে কি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আমাদের প্রতি কৃপা করিবেন!

এইরূপ নাগরীগণ হাহুতাশ করিতেন, আর উন্মনা হইয়া গৃহকর্ম্মাদিও করিতেন। আবার পরদিন রজনী প্রভাতে যুবতীগণ মিলিত হইয়া শুভ-

লক্ষণ দেখিয়া আনন্দ পাইতেন। কেহ বলিতেন, আজ বুঝি বিধি প্রসন্ন হইল। আজ আমাদের সকলের অভিলাষ পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয়। কেহ বলিতেন, আমরা যে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করি, তাহাতে আমার নিশ্চয় মনে হয় যে, প্রাণনাথকে পাইব। কেহ বলিতেন, আমি যে প্রত্যহ গৌরী আরাধনা করি, সেই গৌরী ভগবতী প্রাণপতি শ্রীগৌরাঙ্গকে মিলাইয়া দিয়া আমার সমস্ত দুঃখ দূর করিবেন। কেহ বলিতেন, আমি বিবিধবিধানে সূর্য্যদেবের আরাধনা করি, তিনিই কৃপা করিয়া আজ আমাকে নিশ্চয়ই শ্রীগৌর-নাগরকে মিলাইয়া দিবেন। আবার, কেহ বলিতেন, আজ যদি আমি আমার প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরচন্দ্রকে অবিরোধে প্রাপ্ত হই, তবে নানা উপহার দিয়া বুড়োশিবের পূজা দিব। এইরূপ কত প্রেমের আবেশে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনমানসে সকলেরই হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত।

এখানে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীগৌরপ্রাপ্তিই সকল সাধন-ভজন ব্রত-পূজাদির পরিসমাপ্তি। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ পরিপূর্ণ প্রেমময় পুরুষ। প্রেমই জীবের পরম প্রয়োজন। সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গকে চাহিতেছেন, অথচ ঈর্ষ্যা হইতেছে না। সাধারণতঃ জীব ব্রত-পূজাদি করিয়া থাকে ঐহিক সুখের নিমিত্ত, কিন্তু নাগরীগণ করিলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে পাওয়ার জন্য। এখন দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু! যে পর্য্যন্ত শ্রীগৌরপ্রাপ্তি না হয়, সেই পর্য্যন্তই জীব বিবিধ পূজাপদ্ধতির অধীন হয়, কিন্তু বিধির অতীত পরম-পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গকে পাইলে জীবের আর এই সকল বন্ধন থাকে না, সে পরমানন্দে বিচরণ করে।

এই নাগরীগণের মধ্যে আর একটী মাধুর্য্য দেখিতে পাই। ইঁহারা হাহুতাশ করিতেছেন, স্বপ্নে তাঁহার দর্শন পাইতেছেন, এবং তিনি যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন. তাহারও পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত

হইয়াছেন। সকল সুলক্ষণও দর্শন করিতেছেন এবং তাহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, অনতিবিলম্বেই তাঁহারা তাঁহাকে পাইবেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা ছুটিয়া শ্রীগৌরান্তিকে যাইতেছেন না; কারণ তাঁহারা অবলা। যিনি দুর্ব্বল, তাঁহার নিজের কি শক্তি আছে যে, তিনি ছুটিয়া চলিয়া যান। তাঁহাকে হাতে ধরিয়া না নিলে তিনি যাইতে পারেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে গোপীবল্লভ হইলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সংসার-বল্লভ হইলেন। গোপীগণ সংসারকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণান্তিকে ছুটিয়া চলিলেন। কিন্তু এতাদৃশ ভক্তি ও প্রেমের বল ক'জন জীবের মধ্যে আছে? তাই শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা করিতে আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মই কৃপা করা, আর জীবের কর্ত্তব্য, অবলার মত ক্রন্দন ও হাহুতাশ করা। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া জীবকে জানাইলেন যে, শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র পুরুষ, আর, সকল জীব তাঁহার প্রকৃতি বা সহজ কথায় জীব তাঁহার স্ত্রী। এখন, এই কথার ভাব গ্রহণ করুন! যে সকল নদীয়ানাগরী ননদীর সঙ্গে কলহ করিলেন অর্থাৎ স্বীয় শক্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গকে পাওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলেন, তাঁহারা সাময়িক তাঁহার দর্শন পাইলেও একবারে তাঁহাকে পাইলেন না। আর এই যে নাগরীগণের কথা বলা হইল, ইঁহারা সম্পূর্ণ অবলার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া ইঁহাদের সংসারকে কৃপা করিলেন। এখন দেখুন, নাগরীগণ কিরূপে শ্রীগৌরাঙ্গকে পাইলেন। তাঁহারা সংসার ছাড়িয়া গেলেন না, সংসারই তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরান্তিকে পাঠাইয়া দিল, এবং এমন কি সংসারও শ্রীগৌরচরণ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইল।

নাগরীগণ সর্ব্বসুমঙ্গল দর্শন করিয়া আশান্বিত হইয়াছেন; ভাবিতেছেন, যে কোন উপায়েই হউক, শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁহাদের মিলনের সুযোগ সমুদিত হইবে। এই সুযোগটী কি ভাবে উপস্থিত হইবে, তাহা তাঁহারা

জানেন না। কেবল সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন, আর, গৌরকথা আলাপ করিতেছেন, এমন সময় এক নাগরীর শাশুড়ী আসিয়া জানাইলেন, "বউ মা, এতদিনে বিধি আমার প্রতি প্রসন্ন হইল। গত দিন বেলা দুপ্রহরের সময় গৃহে একজন দৈবজ্ঞ আসিলেন। তাঁহার গুণের কথা আর কি বলিব! এমন আর দেখি নাই। সে সকলের মনের কথা কহিতে পারে। যে যাহা জিজ্ঞাসা করে, সে তাহার সদুত্তর পায়। আমি তাঁহার পা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে। দৈবজ্ঞ আমাকে অতিশয় কাতর দেখিয়া বিনয় বচনে কহিলেন, 'মা, চিন্তা করিওনা। তোমাদের এই গ্রামে শচীমা বাস করেন। তাঁহার মহিমা জান না! তিনি সকলের পরমপূজিতা। তাঁহার অলৌকিক চরিত্র জগতে সর্ব্বত্র বিদিত। তাঁহার পদরজ যে জন শিরে ধারণ করে, তাহার ধন জন হইবে, ইহা ত সামান্য কথা, তৎক্ষণাৎ তাহার ত্রিতাপ দূরে যায়। তাঁহার পদরজ ব্রহ্মারও দুর্লভ বটে, কিন্তু জীবের ভাগ্যে ইহা অতি সুলভ হইয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া যে তাঁহার মুখদর্শন করে, সে জন্মে জন্মে সুখসাগরে ভাসিতে থাকে; দুঃখ কারে বলে সে তাহা জানে না। মা, মনের কপটতা ছাড়িয়া বধূগণকে উপদেশ দিয়া নিশিপ্রভাতে অতিশয় যত্ন করিয়া শ্রীশচীদেবীর বাড়ী পাঠাইবে। তিনি কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন; তাহাতেই মনের আশা পূর্ণ হইবে। নিমাইচাঁদের মাতা পরের দুঃখে অত্যন্ত কাতর। তিনি প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিবেন। এই আশীর্ব্বাদের ফলে সকলের সমস্ত দুঃখ নাশ হয় এবং অনন্ত-সুখের উদয় হয়।' বউ মা, দৈবজ্ঞ এই সকল কথা কহিয়া অন্য বাড়ী চলিয়া গেলেন। এই সকল কথা শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। মনে ভাবিলাম, আমার সমস্ত অমঙ্গল যেন সেই মুহূর্ত্তেই চলিয়া গেল ও সর্ব্বসুমঙ্গল সমুদিত হইল। তোমরা শীঘ্র করিয়া সেখানে যাও। প্রত্যহই সেখানে যাইও। শ্রীশচীদেবীর বাড়ী

আমারই বাড়ী। তিনি আমাকে দিদি বলিয়া কত আদর করেন। তিনি কাহাকেও পর বলিয়া জানেন না। সেখানে গিয়া তোমরা তাঁহাকে প্রণাম করিও এবং তিনি যাহা জিজ্ঞাসা করেন, বিনয়-মধুর-বচনে তাহার উত্তর দিও। আর, তিনি যাহা বলেন, আহ্লাদের সহিত তাহা সম্পাদন করিও। তিনি তোমাদিগকে সেখানে থাকিতে বলিবেন। কিন্তু তোমরা কিছুক্ষণ সেখানে থাকিয়া কোন ছল করিয়া বাড়ীতে আসিও, কারণ আমিও সেখানে যাইব।"

শাশুড়ীর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নাগরীগণ আরো আদর বাড়াইবার নিমিত্ত মুখে বসন দিয়া হাসি সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আপনার কথা আমাদের শিরোধার্য্য। কিন্তু ঘরের কাজ ছাড়িয়া কিরূপে যাইব?" শাশুড়ী বলিলেন, "বাছারা, সে জন্য ভাবিও না। শেষে আসিয়া করিও, না হয়, সব কাজ আমিই সারিয়া রাখিব। আর দেরী করা উচিত নয়। তোমরা শীঘ্র করিয়া শ্রীশচীদেবীর বাড়ী যাও।"

শাশুড়ীর আজ্ঞা পাইয়া নাগরীগণ শ্রীগৌরান্তিকে চলিলেন। এইরূপ নাগরীগণের সংসার অনুকূল হইল। তাই বলিতেছিলাম, কৃপাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ এবার সংসারবল্লভ হইলেন। এবার তিনি শুধু কৃপা করিতে আসিয়াছেন, কাহাকেও বাকী রাখিবেন না। আমাদের সাধন-ভজন না থাকিলেও তাঁহারই অযাচিত কৃপাবলে সেই অসাধন চিন্তামণি শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমরা সকলে পাইব। তাই, আসুন, আমরা সকলে তাঁহারই জয়ধ্বনি দেই, সেই পতিতপাবন, অবলের বল, অপার করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরচন্দ্রেরই গুণগান করি। আমরা জীব, আর সাধন ভজন কি করিব! যখন আমরা এই সংবাদ পাইলাম যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর আমাদিগকে হাতে ধরিয়া নিতে আসিয়াছেন, আমাদিগের আর কোন চিন্তা নাই; আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়া পরমানন্দ দেওয়ার

জন্য তিনি স্বয়ং আসিয়া সমস্ত সংসারের ভার আপনি গ্রহণ করিয়া লইলেন ; তখন আর আমাদের ভাবনা কিসের ? আসুন, আমরা দুবাহু তুলিয়া 'প্রাণগৌর-নিত্যানন্দ' 'প্রাণগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া' বলিয়া নাচিয়া গাহিয়া বেড়াই। সংসারের দায় এড়াইয়াছি। আমার আমার বলিয়া যে সংসারের জন্য খাঁটিয়া খাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন স্বয়ং সেই সংসারখানি আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন, আমার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া, আমার যাতনা অসহ্য দেখিয়া, তিনি যখন এই সংসারের ভার লইয়া গেলেন, তখন আর আমাদের আনন্দের পরিসীমা কি ? শুধু নৃত্যগীত কেন ! আসুন, আমরা খোলকরতালের বাদ্য সহকারে উচ্চৈঃস্বরে এহেন দয়ার ঠাকুর, এহেন প্রেমের নাগর, রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের গুণগান করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিয়া বেড়াই। আমরা অনন্তকাল অনন্ত জিহ্বায়ও যদি এই সোণার ঠাকুরের গুণগান করিয়া বেড়াই, তথাপি এ ঋণ শোধ হইবার নহে। আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের আর সাধ্য কি ? আসুন, আমরা এই ক্ষুদ্রকণ্ঠেই সকলে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার নামের জয়ধ্বনি দেই। মা যে আমাদিগকে ভাল বাসেন, তিনি কি আমাদের নিকট হইতে কিছু প্রতিদান চাহেন ? আমরা যদি একবার 'মা' বলিয়া তাঁহাকে ডাকি, তাহা হইলেই যে তাঁহার প্রাণ জুড়ায় ! শুধু তাহাই নহে, তাঁহাকে ডাকিলে যে তিনি কৃতার্থ হন তাহা নহে ; আমরা যদি হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাহিয়া বেড়াই, সর্ব্বদা আনন্দ করি, তাহাতেই মা'র অপার আনন্দ। শ্রীভগবান্ চাহেন, আমরা সর্ব্বদা আনন্দ করি, এবং তিনি ইহার অনন্ত বিধান করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তাহাতেও তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া এই আনন্দরস আস্বাদন করিবার কৌশল দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, তিনি স্বয়ং আসিয়া

শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইলেন। আর আমরা চাই কি? শ্রীগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি দিয়া নৃত্যগীত ব্যতিরেকে আমাদের আর আছে কি?

এইরূপ নাগরীগণ শ্রীশচীমা'র আশ্রয় লইয়া শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাসুখ প্রাপ্ত হইলেন। শচীমাই জীবের একমাত্র আশ্রয়। ইনিই শুদ্ধসত্ত্বযোগমায়া। যে অপ্রাকৃত মায়া আমাদিগকে শ্রীভগবানের সঙ্গে যোগ করিয়া দেয়, তাহাই যোগমায়া নামে অভিহিত। অনন্ত চিচ্ছক্তি-বৃত্তিই যোগমায়া। ইঁহারই কৃপায় আমাদের চিচ্ছক্তি জাগ্রত হয়,—আমাদের স্বরূপের উদ্বোধন হয়। ইনিই লীলায় স্নেহস্বরূপিণী শ্রীশচী-দেবী। শাক্তগণ যে দশভুজা ভগবতীমূর্ত্তি অথবা চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন, তাহা যোগমায়ারই ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি, আর শ্রীশচীদেবী তাঁহার মাধুর্য্যমূর্ত্তি। সেই অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবীশক্তি শ্রীশচীমাতারই অন্তর্ভুক্ত।

(১৪)

শ্রীপ্রভু লোকশিক্ষার্থ ঐহিক কর্ম্ম পরিসমাপ্তির নিমিত্ত মায়ের আজ্ঞা লইয়া পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে গয়াধামে চলিলেন। আশ্বিন মাসে তিনি গয়ায় গমন করিলেন এবং পৌষ মাসের শেষে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। গয়াধামে বসিয়া তিনি কি লীলা করিলেন, তাহা শ্রীঅমিয়-নিমাইচরিতে সুললিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। নবদ্বীপে আসিয়া তিনি এক নূতন তরঙ্গ উঠাইলেন। কিন্তু আমরা ইত্যবসরে দেখিয়া লই, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বস্তুটী কি! শ্রীপ্রভু রায়রামানন্দের মুখ দিয়া এ সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহা মদনমোহনের আজ্ঞায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব পূর্ব্বে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে; এখানে আরও কিছু বলি।

শ্রীল রামানন্দরায় সাধ্যবস্তু নির্ণয় করিতে যাইয়া প্রথমতঃ বহিরঙ্গ

কথা বলিলেন, অর্থাৎ, স্তরে স্তরে সাধ্যবস্তু নির্ণয় করিলেন। অবশেষে তিনি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কথাও বলিলেন। পরে তিনি রাধা-ভাব ও শ্রীরাধার প্রেমের প্রগাঢ়তা বলিতে যাইয়া কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণনা করিলেন। প্রভু ইহার পর রামরায়ের মুখে বিলাস-মহত্ত্ব শুনিতে চাহিলেন। রামরায় রাধাকৃষ্ণের রাস-লীলা-বিলাস বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রভু রাস-লীলার উপরে আরো কিছু শুনিতে চাহিলেন—

প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেম-তত্ত্ব।*
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব॥

রামরায় স্ববশে নাই; প্রভু যাহা বলাইতেছেন, রামরায় তাহাই বলিতেছেন।

রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥

'ধীর ললিত' অর্থ রসিক, নবীনকিশোর, পরিহাসপটু নিশ্চিন্ত এবং প্রেমাধীন। এই ধীরললিত শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব কিরূপ? না—

নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত।

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত নিত্য লীলা-বিলাসাদি করেন। এ কাম প্রাকৃত নহে—ইহা অপ্রাকৃত কাম, অর্থাৎ, প্রেম। তার পর রামরায় বলিলেন—

রাত্রিদিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে॥

শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে নিত্য নিকুঞ্জ বিহার, নিত্য মিলন, ইহাই ভক্তগণের আরাধনার বিষয়। রামরায় এই পর্য্যন্ত সাধ্যের

* এই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব পাঠক পাঠিকাগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ হইতে পড়িয়া লইবেন।

নির্ণয় করিলেন; কিন্তু আমার প্রভু এই নিত্য নিকুঞ্জ-বিহারকেও সাধ্যের শেষ সীমা বলিয়া মনে করিলেন না। তাই,

প্রভু কহে, "এহ হয়, আগে কহ আর।"

শ্রীল রামরায় রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীরাধাই সর্ব্বসাধ্যশিরোমণি, এই পর্য্যন্ত তিনি জানেন; নিকুঞ্জসেবা পর্য্যন্ত তিনি যাইয়া পৌছিয়াছেন, এবং নিত্য নিকুঞ্জবিহার তিনি দর্শন করিতেছেন। ইহার পর আরো কিছু আছে, রামরায় ইহা জানেন না। তাই, প্রভু যখন আরো কিছু বলিতে কহিলেন, তখন

রায় কহে, "ইহা বই বুদ্ধির গতি নাহি আর।"

ইহা বলিতে বলিতেই রামরায়ের বুদ্ধি বিকশিত হইল। কারণ, তিনি প্রভুর কৃপা পাইয়াছেন। প্রভু দেখিলেন, রামরায় রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা আস্বাদন করিতে পূর্ণ অধিকারী; সুতরাং উপরের স্তরও প্রভু তাঁহার নিকট খুলিয়া দিলেন; তাই রামরায় পরমুহূর্ত্তেই বলিলেন,

যেবা প্রেম-বিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥

রামরায় বিপরীত বিলাসের কথা কহিলেন। এই বিপরীত রতি কি, তাহা তাঁহার গানেই ব্যক্ত করিলেন। রামরায় গাহিলেন,

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গী ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥

না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥

এ সখি! সো সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥

না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন।
তুহুঁকো মিলনে মধত পাঁচ বাণ॥
অব সোই বিরাগ! তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥

এই গানটী কৃষ্ণের প্রতি নবানুরাগের নহে—ইহা সেই প্রেমের পরিপক্কাবস্থা; ইহাতে নিকুঞ্জমিলনের পরের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তবে, আর এক নূতন ধরণের নবানুরাগ কিরূপে সঞ্জাত হইল, তাহা শ্রীমতী বলিলেন। শ্রীমতী বলিতেছেন, "তাঁহার নয়নকটাক্ষে আমার হৃদয় কাড়িয়া লইল। এই অনুরাগ আমার দিন দিন বাড়িয়া চলিল, ইহার আর অবধি নাই। এখন আমি তাঁহার প্রেমেতে এত বিভোর হইয়াছি যে, তিনি যে রমণ, আর আমি যে রমণী, এ জ্ঞান আমার নাই।"

নিকুঞ্জবিহার পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার রমণীজ্ঞান ছিল। তাঁহার পতি আয়ান ও শাশুড়ী ননদী জটিলা কুটীলার ভয়ে তিনি ভীত ছিলেন, এবং অতি ভয়ে ভয়ে গোপনে নিকুঞ্জে গমন করিতেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহার প্রেম এত গাঢ় হইয়াছে যে, আর তাঁহার রমণী রমণ জ্ঞান নাই। সাধারণতঃ রমণ দেখিয়া রমণী ভুলে, রমণের সঙ্গেই রমণী প্রেমবিলাস করেন। শ্রীমতীও এ পর্য্যন্ত তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেম পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীমতীর এই ভেদজ্ঞান চলিয়া গিয়াছে। ইহাই বিপরীত রতি। এই খানেই শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহ প্রকাশের সূচনা। আমরা গৌর অবতারে দেখিতে পাই, তাঁহাকে পুরুষেও প্রাণনাথ বলে, স্ত্রীলোকেও প্রাণনাথ বলে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কেবলমাত্র গোপিকাগণের প্রাণবল্লভ হইলেন; পুরুষেরা তাঁহাকে প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিলেন না; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে

পুরুষ স্ত্রী সকলেই প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিলেন। আত্মার যে কোন স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই, তিনি যে আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বজীবাশ্রয়, সকলেরই প্রাণের পরম প্রিয় সামগ্রী—প্রাণবল্লভ, তাহা কেবল গৌরলীলাতেই প্রকাশিত হইল। সর্ব্বজীবের প্রতিনিধি শ্রীরাধা ইহা সর্ব্বপ্রথম দর্শন করিলেন। শ্রীরাধা প্রথমতঃ নারীভাবে শ্রীকৃষ্ণসহ লীলা করিয়া দেখাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রমণ এবং গোপীগণ রমণী; আর শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ। কিন্তু অবশেষে তিনি এই অবস্থায় পৌছিলেন যে, প্রেমের প্রগাঢ়তায় তিনি দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শুধু গোপীজনবল্লভ নহেন, তিনি জীবজনবল্লভ—তিনি জগতেরই পতি। তখন শ্রীরাধা নিত্যমিলিত হইয়াও এই নূতন ভাবতরঙ্গে পড়িয়া বিরহ অনুভব করিতেছেন। বিরহে তিনি অধীর হইলেন। এ আর্ত্তি কাহার জন্য? কৃষ্ণের জন্য নহে। কারণ কৃষ্ণসহ তিনি মিলিত আছেন। তবে এই যে নূতন ভাবে পড়িয়াছেন, সেই ভাবের বস্তুটী চাহিতেছেন। তাই তিনি সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে সখি! কানুর কাছে এ সব প্রেমের কথা বল্‌বি। বিস্মৃত হইস্ না।" এই সখী কিরূপ? না, বিরাগ! তাঁহার যে বিশিষ্ট রাগ হইয়াছে, ইহাকেই দূতী বা সখী সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'হে বিরাগ! তুমিই এখন দূতী হইলে।' সখী আর দূতী এক বস্তু নহে। কিন্তু তিনি আর কাহাকেও না পাইয়া বিরাগকেই সখী এবং ইহাকেই দূতী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এ পর্য্যন্ত ললিতা বিশাখাদি তাঁহার সখী ছিলেন; তাঁহাদের সহায়তায় তিনি কৃষ্ণসহ মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি নূতন ভাবতরঙ্গে পড়িয়া আর সেই ভাবের অনুকূল ভাবমূর্ত্তি সখী দেখিতে পাইতেছেন না। এই যে বিশিষ্ট রাগ বা নূতন ধরণের প্রেম হইল, তাহাকেই তিনি সখী ও

দূতী করিলেন; তখনও তিনি এই সখীর মূর্ত্তি দেখিলেন না। শ্রীমতীর এই ভাবোপযোগী সখীই গৌরলীলাতে কাঞ্চনা, অমিতপ্রভা প্রভৃতি। শ্রীরাধা যে এতাদৃশ সখীকে দিয়া কান্নুর কাছে খবর পাঠাইলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ। কান্নুর সঙ্গেই তাঁহার চির প্রেম। কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠায় ভাবেতে যদিও তিনি একটী নূতন বস্তুর আস্বাদন পাইয়াছেন, তথাপি পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ কান্নুর নামই করিলেন, কারণ সে বস্তুটী তিনি এখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই।

শ্রীল রামরায় রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন; তিনি অতিশয় উচ্চ অধিকারী। এমন কি, ভজন করিতে করিতে তাঁহার এতদূর দেহবিস্মৃতি হইয়াছে যে, তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে দেবদাসীগণকে লইয়া ভজন করেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন। সেই লীলা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে তাঁহার নিকট আর একটী নূতন লীলা প্রকাশিত হইল। রামরায় পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিকুঞ্জবিহারের পর আর যে কি লীলা হইতে পারে, তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু প্রভুর কৃপায় তাহা তিনি দর্শন করিলেন। রামরায়ের হৃদয়কবাট খুলিয়া গিয়াছে, সুতরাং তিনি যদি তখন আরো কিছু বলিবার অবসর পাইতেন, তবে সেই সঙ্গে তিনি গৌরলীলাও বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিতেন। এই গানটীতে তিনি কেবলমাত্র তাহার সূচনা করিলেন; কিন্তু প্রভু দেখিলেন, তখনও ইহা প্রকাশ করার সময় হয় নাই, তাই—

প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল।

প্রভু রামরায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন, আর বলিতে দিলেন না। তবে রামরায় উচ্চ অধিকারী বলিয়া তাঁহার নিজের নিকট আর আত্মগোপন করিলেন না।

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ রামরায়কে বলিলেন, "রামরায়, ইহাই সাধ্যবস্তুর শেষ সীমা।" অনেকে মনে করেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সাধন, শ্রীকৃষ্ণ সাধ্য, অর্থাৎ, শ্রীগৌরাঙ্গকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জসেবা প্রাপ্ত হইলেই সাধনের শেষসীমায় পৌঁছিল, কিন্তু রামরায়ের মুখ দিয়া প্রভু জানাইলেন যে, তাহা নহে, নিকুঞ্জসেবার পর রাধাকৃষ্ণের বিবর্ত্তবিলাসে যে পরমানন্দ হয় এবং তাহাতে যে নব নব লীলারসাস্বাদন হয়, তাহাই জীবের প্রার্থনীয়। প্রভু দেখিলেন, সাধ্যবস্তু নির্ণীত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা সাধ্য বা সাধনার বিষয়ীভূত নহে। শত সাধনা করিয়াও জীব ইহা দর্শন করিতে পারে না। ইহা কেবল কৃপাসাপেক্ষ। তাই তিনি রামরায়কে বলিলেন—

সাধ্য বস্তু সাধন বিনা পাওয়া নাহি যায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়॥

প্রভু ইঙ্গিতে বলিলেন যে, রামরায় কৃপা করিয়া বলিয়া দিলেই জীবে ইহা সহজে পাইতে পারে। রামরায়ও প্রভুর কথায় প্রথমতঃ বহিরঙ্গভাবে উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন; এবং এ পর্য্যন্ত তিনি যে ভাব অবলম্বন করিয়া নিকুঞ্জ-সেবার অধিকার পাইয়াছেন, তাহা বলিলেন, যথা—

সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

রামরায় বলিলেন, রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা যে সাধ্য, তাহা পাইতে আর অন্য কোন উপায় নাই। তাই তিনি আবার বলিলেন—

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥

আবার বলিলেন—

* * *

বিধি মার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

রায় রামানন্দ ইহা বলিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত হইলেন না: এ সাধনে চেষ্টা আছে, ও এই চেষ্টার ফলেই তিনি রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর যাহা দর্শন করিলেন, তাহার জন্য তিনি কোন সাধনা করেন নাই; তাহা কেবলমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাবলেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই তিনি প্রভুর পায়ে ধরিয়া নিবেদন করিলেন, 'প্রভু তোমার কৃপাই একমাত্র অবলম্বন। তোমার কৃপায় তুমি আত্মপ্রকাশ কর; মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও তোমাকে পায় না;' যথা—

ইষ্ট গোষ্টী কৃষ্ণকথা করি কতক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন॥
কৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার।
রস-তত্ত্ব লীলা-তত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥

তারপর রামরায় বলিলেন, 'প্রভু তুমি বাহিরে কিছু বল না বটে, কিন্তু তুমি কি বস্তু, তাহা হৃদয়ে প্রকাশ কর। এটী তোমার কৃপা।' যথা—

অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে॥

রামরায় বস্তুটী দর্শন করিলেন বটে, কিন্তু চিনিলেন না, তাই তিনি প্রভুর নিকট প্রশ্ন করিলেন—

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥

সে সংশয়টী কি? না—

পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥

শুধু তাহাই নহে,—

তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥

রামরায় প্রথমতঃ সন্ন্যাসী দেখিলেন, পরে সেই সন্ন্যাসীর স্থলে শ্যামসুন্দর দর্শন করিলেন ও সেই শ্যামসুন্দরের সম্মুখে একটী সুবর্ণবর্ণ পুত্তলিকা দেখিলেন। এই সুবর্ণবর্ণ পুত্তলিকার গৌরকান্তিতে আবার শ্যামসুন্দরের শ্রীঅঙ্গ আবৃত দেখিলেন; অর্থাৎ, গৌরসুন্দর ও তাঁহার সম্মুখে একটী সুবর্ণপুত্তলিকা দর্শন করিলেন। এ গৌরসুন্দর কিরূপ? না, রামরায় বলিতেছেন—

তাহাতে প্রকট দেখি বংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন॥

অর্থাৎ, বংশীবদন শ্রীগৌরসুন্দর দর্শন করিলেন ও তাঁহার চঞ্চলনয়ন-কটাক্ষে মুগ্ধ হইলেন। ঐ যে প্রেমবিবর্ত্ত বিলাসের 'পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গী ভেল' গানটী গাহিয়াছিলেন, সে নয়নভঙ্গী শ্যামসুন্দরের নহে, এই নূতন বস্তুটীর। ইঁহারই নয়নভঙ্গীতে নূতন করিয়া আর এক অপূর্ব্ব

রাগের সঞ্চার হইল এবং ইঁহারই প্রতি এই রাগ অনুদিন বাড়িয়া চলিল—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ নহে; কারণ সে অনুরাগ ত নিকুঞ্জমিলনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, এবং ইহা ত রামরায় পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছেন; প্রভু তাহাতে বলিয়াছেন, 'এহো হয়, আগে কহ আর।' ইহার পরে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, রামরায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। রামরায় গান করিবার সময় শ্রীরাধার এই একটী নূতন ভাব পাইলেন; কিন্তু ভাবের মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত দর্শন করেন নাই; এখন এই ভাবের মূর্ত্তি শ্রীগৌর-নাগরবর দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। শুধু গৌরনাগর নহে, তাঁহার সম্মুখে আবার একটী সুবর্ণবর্ণ পুত্তলিকা দেখিলেন। এই সুবর্ণ পুত্তলিকাটী শ্রীরাধা নহেন; তাহা হইলে ত তিনি সুবর্ণপুত্তলিকা না বলিয়া শ্রীরাধা বলিলেই পারিতেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন, শ্রীরাধা তাঁহার আরাধ্য বস্তু। তাঁহাকে তিনি চিনেন। নিত্য তিনি তাঁহার দর্শন পান। এ বস্তুটী তাঁহার নিকট নূতন এবং নূতন বলিয়াই বস্তুটীর পরিচয় লইবার নিমিত্ত শ্রীপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করিলেন। যদি কেহ বলেন, এই কাঞ্চনপুত্তলিকাটী শ্রীরাধা, এবং এই শ্রীরাধা বস্তুটী দ্বারাই শ্যামনাগরের দেহ আবৃত হইল ও দুই বস্তু মিলিত হইয়া একটী গৌরদেহ হইল, তবে তাঁহার নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, তিনি একটু অনুবাধন করিয়া রামরায়ের কথাগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। রামরায় বলিলেন, 'তাঁর গৌরকান্তিতে শ্যাম অঙ্গ ঢাকা।' 'তাঁহা দ্বারা শ্যাম অঙ্গ ঢাকা' এরূপ কথা বলিলেন না। কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌরকান্তিতে শ্যামদেহ আবৃত হইয়া বংশীবদন গৌরনাগররূপে প্রকাশিত হইলেন এবং কাঞ্চন-পুত্তলিকাও পৃথক্‌রূপে তাঁহার সম্মুখে রহিলেন। এই দুইটি বস্তুই রামরায়ের নিকট নূতন। কাঞ্চন-পঞ্চালিকা বস্তুটী আরো নূতন। তাই রামরায় প্রভুর নিকট প্রশ্ন করিলেন,—

অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার।

প্রভু রামরায়ের নিকট হইতে প্রশ্নটী আরো পরিষ্কার করিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ বহিরঙ্গ ভাবে উত্তর দিলেন। প্রভু বলিলেন, 'রামরায়, শ্রীকৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম, তাই তুমি প্রেমের স্বভাবে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছ।' যথা—

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
যাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

প্রভু এখানে পরমভাগবতের সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনের কথা বলিলেন। কিন্তু পাছে বা রামরায় আবার প্রশ্ন করেন যে, তিনি ত একটী মূর্ত্তি দর্শন করেন নাই, দুইটি মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। সেইজন্য প্রভু আবার বলিলেন—

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমার স্ফুরয়॥

রামরায় প্রভুর একথায় ভুলিবেন কেন? রাধাকৃষ্ণ ত তিনি প্রত্যহই দেখিয়া থাকেন। এই দুই বস্তু যদি সেই রাধাকৃষ্ণই হইবেন, তবে আর তিনি প্রশ্ন করিবেন কেন? তাই, বড় দুঃখিত হইয়া অথচ ভক্তজনোচিত স্পর্দ্ধা সহকারে রামরায় কহিলেন—

* * প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥

রামরায় এই দুইটি বস্তু দর্শন করিয়াছেন, তাহা হয়ত বিদ্যুতের মত

ক্ষণকালের জন্য, তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নিকুঞ্জলীলার পর শ্রীভগবানের এই আর একটী নূতন লীলা, ইহা আরো রসায়ন, আরো পরমানন্দদায়ক। তাই তিনি প্রভুকে বলিলেন, 'প্রভু, আমার কাছে তোমার স্বয়ংরূপ লুকাইওনা।'

রামরায়ের নিকট হইতে প্রভু প্রশ্নটী আরো পরিষ্কার করিয়া লইলেন। রামরায় বলিলেন, 'প্রভু, তুমি যে শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া নিজরস আস্বাদন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা আমি জানি। প্রেম আস্বাদন করা তোমার নিজ গূঢ়কার্য্য, এবং সেই সঙ্গে তুমি ত্রিভুবন প্রেমময় করিলে।' যথা—

রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥

রামরায় প্রকাশ করিলেন যে, তিনি এই গৌর-অবতারে কথা পূর্ব্বেই ভাবে জানিতে পারিয়াছেন। এখন তাঁহার সংশয় রহিয়াছে কাঞ্চন-পুত্তলিকাটী সম্বন্ধে। তাই তিনি অতি দীনভাবে ব্যগ্রতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপটকর তোমার কোন্ ব্যবহার॥

রামরায় বলিলেন, "প্রভু কোন সাধনের বলে আমি তোমাকে পাই নাই। তুমি নিজেই কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে আসিলে এবং তুমি নিজেই কৃপা করিয়া সেই অপূর্ব্ব যুগলমূর্ত্তি দর্শন করাইলে। আমি ত এতদিন রাধাকৃষ্ণ যুগলসেবা লইয়াই থাকিতাম। ইহার পর যে আর কিছু আছে, তাহা ত আমি জানিতাম না। তুমি নিজেই কৃপা

করিয়া প্রকাশিত হইলে, এখন আবার লুকাইতেছ কেন? প্রভু হে! এই বিবর্ত্তবিলাসের পর তোমার সেই স্বয়ংরূপের লীলাবিলাসমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর।”

রামরায় কৃষ্ণলীলায় বিশাখা সখী। তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ ঋণী। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনে বিশাখা প্রধান সহায়। এই বিশাখা ব্রজরস পরিপূর্ণ মাত্রায় পাইয়াছেন। ইহার পর যে আর একটী অপূর্ব্ব রস আছে, তাহা হইতেই বা তাঁহাকে তিনি বঞ্চিত করিবেন কেন! আর বঞ্চিত করিতে পারিবেনই বা কেন! প্রভুরই প্রদত্ত প্রেম-বলে তিনি জানিতে পারিয়াছেন; আর প্রভু লুকাইবেন কিরূপে! তাই প্রভু স্বীয়রূপ দেখাইলেন,—

তবে হাসি প্রভু তাঁরে দেখাইল স্বরূপ।

এ স্বরূপটী কি? এ স্বরূপ রাধাকৃষ্ণ নহে, অথবা রাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া একতনু গৌরদেহ নহে। তবে কি? না—

রসরাজ মহাভাব দু-ই একরূপ॥

রসরাজ ও মহাভাব দুইটি মূর্ত্তিই দর্শন করিলেন, দুইটিই একরূপ— দুই-ই গৌরবর্ণ। এ বিষয়ে কেহ সন্দিহান হইতে পারেন না। রামরায়ের কৃপাভিক্ষা করিলে সকলেই প্রেমবিবর্ত্ত-বিলাসমূর্ত্তি বুঝিতে পারিবেন। রামরায় প্রশ্ন করিলেন—গৌরনাগরমূর্ত্তি ও কাঞ্চনপুত্তলিকা এই দুই মূর্ত্তি সম্বন্ধে। প্রভু দেখাইলেনও রসরাজ ও মহাভাব এই দুই মূর্ত্তি। তবে এই মূর্ত্তিদ্বয় কিরূপ? না—উভয়ই গৌরবর্ণ। এই শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ই শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।

এই শ্রীমূর্ত্তি দুইটি দর্শনে রায় রামানন্দের হৃদয়ে প্রেমের এক নূতন তরঙ্গ খেলিল। এ পর্য্যন্ত তিনি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসাগরে ভাসিতেছিলেন; সেই সাগরে আজ এক নূতন তরঙ্গ উঠিল। এই তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তিনি আর

স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহ আউলাইয়া গেল। তিনি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাধাকৃষ্ণরূপ-সাগরে তিনি ভাসমান ছিলেন। প্রত্যহই তিনি এই রূপসুধা আস্বাদন করিতেন, তাহাতে মূচ্ছিত হইতেন না। আজ প্রেমের এই এক নূতন পরমোজ্জ্বলমূর্ত্তি দর্শনে তিনি অধীর হইলেন। প্রভু তাঁহাকে চেতন করাইয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন—

মোর তত্ত্বলীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে॥

বৈষ্ণব গোস্বামিগণ যে বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরাধার ভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ. ইহাতে এই ভাবের অসঙ্গতি হয় না। ইহাতে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্ব আরো পরিস্ফুট হয়। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীরাধা। শ্রীরাধা বিষ্ণুপ্রিয়া নহেন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াই শ্রীরাধা। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বস্তুটী তত্ত্বতঃ নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীরাধা তাঁহার পরিচয়াত্মক একটী বিশেষণ মাত্র—শ্রীরাধা তাঁহার একটী বিলাসমূর্ত্তি। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, যেমন—দেবদত্ত কায়স্থ। ইহা বলিলে 'দেবদত্ত' এই 'কায়স্থ' বিশেষণে বিশিষ্ট, ইহা ছাড়াও তাঁহার অন্য পরিচয় আছে, এইরূপ বুঝায়। সেইরূপ 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীরাধা' বলিলে এই বুঝায় যে, তিনি শ্রীরাধা এবং আরো কিছু। অর্থাৎ সীতা, রাধা, রমা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি সকল ভাবের মূর্ত্তিরই পরিপূর্ণ শ্রীবিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন যে, গোলোকাধিপতিই স্বীয় পরিকরবৃন্দ লইয়া নদীয়াধামে ভূলোকে অবতীর্ণ হইলেন। এখন এই গোলোকাধিপতি বস্তুটী কি? ঠাকুর লোচনদাস বলিতেছেন—

বৈকুণ্ঠ উপরি স্থান গোলোক তাহার নাম
গৌরাঙ্গসুন্দর তাহে রাজা।

শ্রুতিতে যে রুক্মবর্ণ (সুবর্ণবর্ণ) ব্রহ্মযোনি পরমপুরুষের কথা বলা হইয়াছে, ইনিই এই গোলোকাধিপতি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। তাই লোচনদাস বলিতেছেন—

গোলোকনাথের স্থান ইহা বই নাহি আন
আগমে কহিল এই ধ্যান

আর শ্রুতিতে যে 'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনিই এই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। এই গোলোকাধিপতির সঙ্গিনী শ্রীরাধা ও রুক্মিণী এবং তাঁহাদের অংশভূতা নাগরীবৃন্দ; যথা—

রাধা আর রুক্মিণী এই দুই ঠাকুরাণী
তাঁর অংশে যতেক নাগরী।

ইঁহাদিগের নিকট হইতেই ভক্তির শত শত শাখা বাহির হইয়াছে।

শত শত শাখা ভক্তি এ দোঁহার লঞা শক্তি
সেবা করে সব অনুচরী॥

এই যে গোলোকস্থিত নাগরীর কথা বলা হইল, ইঁহারা কৃষ্ণ-লীলায় কেহ বৃন্দাবনধামে গোপী হইলেন, কেহ দ্বারকাধামে মহিষী হইলেন। গোপিকারা শ্রীরাধার সঙ্গিনী এবং মহিষীবৃন্দ রুক্মিণী সত্য-ভামার গণ। অর্থাৎ, দ্বাপরযুগে শ্রীভগবান্ বৃন্দাবনে আদর্শ প্রেমের খেলা দেখাইলেন, আর দ্বারকাধামে আদর্শ সংসারের লীলা করিলেন। সেই দুই লীলাই সম্মিলিত হইয়া নদীয়াধামে প্রকাশিত হইল। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপধামে আদর্শ প্রেমিক—তিনি ভুবনমোহন নদীয়া-নাগর, আবার আদর্শ সংসারী। এই উভয়বিধ নাগরীই আসিয়া নদীয়ানগরে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ায় এই দুই ভাবেরই পরিপূর্ণ সমাবেশ আমরা দেখিতে পাই। তিনি একদিকে যেমন পরিপূর্ণ প্রেমময়ী শ্রীরাধা, অন্যদিকে আবার তেমনি আদর্শ গৃহিণী শ্রীরুক্মিণী,

সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীবৃন্দের পরিপূর্ণ বিকাশ। শ্রীরাধা আদর্শ-প্রেমিকা, কিন্তু আদর্শ পত্নী বা গৃহিণী নহেন। প্রেম কতদূর প্রগাঢ় হইলে জীব সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে, শ্রীরাধা তাহার পরিপূর্ণ আদর্শ দেখাইয়াছেন। তিনি বন্ধন ছিন্ন করিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছেন, কিন্তু শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমের প্রগাঢ়তায় দেখিতে পাই, তিনি ছুটিয়া পলায়ন করেন নাই, তিনি চঞ্চল হন নাই; স্থির ভাবে প্রেমের বস্তুটীকে হৃদয়ে ধ্যান করিলেন, আর তাঁহার প্রেমের শক্তিতে প্রেমের বস্তুটী স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। একথা আমরা পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে বলিয়াছি।

শ্রীরাধা নির্ভীক ছিলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম করিয়া সর্ব্বদা ভীত থাকিতেন, কখন তাঁহার পতি আয়ানের নিকট এই গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত হইয়া পড়ে। প্রেমের একস্তরে ভয়ের অস্তিত্ব থাকে বটে এবং ইহাতে প্রেমের মধুরতা আরো বৃদ্ধিও করে বটে, কিন্তু ইহার আর এক স্তরে ভয়শূন্যতা আসে, তখন অন্যাপেক্ষা একবারে থাকে না। শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইলেও তিনি এত তন্ময় হন নাই যে, তিনি আয়ানের পত্নী বলিয়া আপনাকে একবারে ভুলিতে পারিয়াছিলেন। প্রেমের নিকট স্ত্রীপুরুষ ভেদ থাকিবে না, দেহস্মৃতি থাকিবে না। প্রেম চির বিশুদ্ধ পরম পবিত্র। শ্রীরাধারও দেহস্মৃতি ছিল না বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে সমালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, 'তিনি যে আয়ানের পত্নী' এ বোধ তাঁহার অনেক সময় ছিল। বন্ধন ছিন্ন করিয়া গেলে তাঁহার একবারে এ স্মৃতি না থাকুক, কিন্তু যে পর্য্যন্ত গৃহবন্ধনে বদ্ধ থাকিতেন, সে পর্য্যন্ত এ স্মৃতি নিশ্চয়ই ছিল। প্রেম চির স্বাধীন, ইহাতে সকল ভুলাইয়া দেয়, কেবলমাত্র প্রেম ও প্রেমিকদ্বয়েরই অস্তিত্ব বোধ থাকে। তখন দুইটী বস্তু মিলিত

হইয়া প্রায় এক হইয়া যায়, পৃথক্ সত্তা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যায়, উভয়কে উভয়ের পরস্পর ভুল হইয়া যায়, তখন উভয়ই উভয়কে নিজের মধ্যে দেখে বা সে-ই হইয়া যায়; আবার নিজকে নিজের ভুল হইয়া যায়। এই উভয়ের একত্বাবস্থা সত্ত্বেও আবার উভয়ে পৃথক রহিয়া যায়; ইহাই শ্রীবৈষ্ণবগণের অচিন্ত্য ভেদাভেদ। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। আপনি শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন। সুতরাং আপনার যে যে দ্রব্যে রুচি হয়, তাহা আপনি স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিলে যতদূর তৃপ্ত হইবেন, আপনি গ্রহণ করিলে ততদূর তৃপ্ত হইবেন না। এক্ষণে আপনার এই বৃত্তিটী শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তিতে পরিণত হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের সুখে আপনার সুখ হইল। এই পরিমাণে আপনি আর শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়া গেলেন, কিন্তু তথাপি পৃথক্ রহিলেন। এইরূপে যে পরিমাণে আপনি স্বীয় সুখ কৃষ্ণ-সুখে পর্য্যবসিত করিতে পারিবেন, সেই পরিমাণে আপনি কৃষ্ণের সঙ্গে এক হইয়া গেলেন, তথাপি পৃথক্ রহিবেন। আপনি আমি জীব। আমরা সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণসুখে সুখী হইতে পারিব না। প্রেমের পরিপূর্ণ আদর্শ শ্রীরাধাই ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরাধার এই আত্মবিস্মৃতি প্রথম অবস্থায় দেখা যায় নাই। এই যে উপরে বলা হইল যে, প্রেমের পরিপক্কাবস্থায় দুইটী বস্তু মিলিত হইয়া প্রায় এক হইয়া যায়, পৃথক্ সত্তা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যায়, শ্রীরাধার ইহা নিকুঞ্জমিলনের পরিপূর্ণাবস্থায় হইয়াছিল; তখনই প্রেমের বিবর্ত্তবিলাস-লীলা হইল—তখনই 'না সো রমণ না হাম রমণী' এই জ্ঞান হইল। এই প্রেমবিবর্ত্তবিলাস মূরতিই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। আমরা গৌরলীলায় দেখিতে পাই, বালা বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রকে দর্শন মাত্র ভালবাসিলেন। তিনি পরনারী নহেন, এবং আপনাকে পর নারী

বলিয়া কখন আশঙ্কা করেন নাই যে, তাঁহার পিতামাতা এ মিলনে অন্তরায় হইবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রেম চিরস্বাধীন। তাঁহার হৃদয় তাই নির্ম্মল, নির্ম্মুক্ত। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে ভালবাসিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। হৃদয়ের রাজা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে হৃদয়ে বসাইয়া রাখিলেন। 'শ্রীগৌরাঙ্গ পুরুষ, আর তিনি নারী, উভয়ে বিবাহ বন্ধনে সম্বদ্ধ হইবেন, এ সকল ধারণা তাঁহার নাই। তাঁহার হৃদয়ে এ সকল ভাব আসিবার স্থানও নাই, কারণ ইহা প্রেমে পরিপূর্ণ। তাঁহার প্রেমের প্রাবল্যে তিনি ছুটিয়া চলিলেন না, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর স্বয়ং আসিয়া মিলিত হইলেন এবং তাঁহারই প্রেমের বলে, বিষ্ণুপ্রিয়া যে গৃহে বসতি করিতেন, সেই গৃহের সকলেই এবং প্রতিবেশিবর্গ এবং এমন কি নদীয়াবাসী সর্ব্বসাধারণেই প্রেম প্রাপ্ত হইলেন ; আর, শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ার এই ভাবের প্রাবল্যেই নরহরি, বাসুঘোষ প্রভৃতি পুরুষগণও শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণনাথ বলিয়া প্রীতি করিলেন ; আর, নাগরীগণ ত করিলেনই। এই যে পবিত্র প্রেমের নিকট পুরুষ নারী ভেদ থাকে না, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাহা দেখাইলেন। বৃন্দাবনে নিকুঞ্জলীলার পরিসমাপ্তিতেই ইহার প্রারম্ভ, নবদ্বীপ-লীলায় ইহার প্রকাশ ও বিস্তার।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বিবাহ-লীলা হইল, ইহা রুক্মিণী ভাবে সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে শত্রু দমন নাই। একদিকে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া যেমন আদর্শ প্রেমময়ী, অন্যদিকে আবার তেমনি তিনি রুক্মিণীর মত আদর্শ পতিব্রতা পত্নী। ঐ যে গোলোকের বর্ণনা করা হইল, উহাই ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণরূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ শ্রীরামচন্দ্র অবতারে পতি-পত্নী ভাব ও আদর্শ সংসার-লীলা প্রকট করা হইল। পরে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে আদর্শ সংসার ও আদর্শ

প্রেমের লীলা বিভিন্ন করিয়া দুই স্থানে প্রকট করা হইল, এবং অবশেষে শ্রীগৌর অবতারে এই উভয়ের মিলন একত্র প্রকট করিয়া পরিপূর্ণরূপে জীবের নিকট অতি সহজ ও অতি মধুর করিয়া প্রকাশ করা হইল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াই এই উভয় ভাবের পরিপূর্ণ আদর্শ মূর্ত্তি।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা হইল, এখন নদীয়ানাগরী সম্বন্ধে কিছু বলি। শ্রীগৌরাঙ্গ বামা ও দক্ষিণা এই উভয়বিধ নাগরী লইয়া লীলা করিলেন। জীবের মধ্যে যে বাম্য বা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ ভাব রহিয়াছে, তাহারই পরিপূর্ণ মধুর ভাব-মূর্ত্তি বামা নাগরী; এবং জীবের যে দাক্ষিণ্য বা ভগবদুন্মুখ ভাব রহিয়াছে, তাহারই পরিপূর্ণ মধুর ভাব-মূর্ত্তি দক্ষিণা নাগরী। বাম্য ভাবাপন্নজীবের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ দাক্ষিণ্য ভাব গ্রহণ করেন, অর্থাৎ, যে জীব যতই বহির্ম্মুখ, শ্রীভগবান্ তাহার নিকট ততই অনুকূল বা কৃপাপরায়ণ। জগাই মাধাই, চাঁদ কাজী, সরস্বতী প্রকাশানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ বাম্যভাবের দৃষ্টান্তস্থল। শ্রীপ্রভু প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিতে কাশী পর্য্যন্ত গেলেন, তথাপি প্রকাশানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে উন্মুখ হওয়া দূরের কথা, তাঁহাকে আরো অযথা নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ আসিয়াছেন জীব উদ্ধার করিতে; তিনি ছাড়িবেন কেন! তিনি স্বয়ং যাইয়া প্রকাশানন্দের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং তাঁহাকে কৃপা করিলেন। জগাই মাধাই, সার্ব্বভৌম, নারোজী, বারমুখী প্রভৃতি সকলেই এইরূপ বহির্ম্মুখ থাকিয়াও অযাচিত কৃপা প্রাপ্ত হইলেন। এইভাবে শ্রীভগবান্ পতিতপাবন, কৃপাবতার। যে যত পতিত, তাহার প্রতি তাঁহার তত কৃপা। এ পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্ পতিতপাবন বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা

যায় নাই। পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ পতিত জীবকে সত্য সত্যই দণ্ড ভোগ না করাইয়া উদ্ধার করিলেন এবং এই পতিতপাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। আমরা বহিরঙ্গ ভাবে শ্রীভগবান্‌কে পতিতপাবন ও কৃপাবতার বলিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক তিনি কৃপাবতার নহেন,—তিনি প্রেমাবতার। জীব তাঁহার নিজজন। নিজজনের প্রতি কৃপা হয় না, স্বাভাবিক প্রীতি হয়। জীব যে বহির্ম্মুখ থাকে, ইহা তাহার অজ্ঞানতা বশতঃ। এই অজ্ঞানতাও জীবের স্বকৃত নহে। সুতরাং শ্রীভগবান্ দেখিলেন যে, জীবের দোষ কি? তাঁহারই দুর্লঙ্ঘ্য মায়াশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া জীব হাবুডুবু খায়। তাই তিনি জীবের দুঃখে কাতর হইলেন এবং স্বতঃই তিনি স্নেহবশে জীবকে এই দুঃখ হইতে উদ্ধার করিলেন। তাঁহারই মায়াবশে জীব পাপ করে, আবার তাঁহারই অপার করুণা বা স্নেহবশে সে পাপমুক্ত হয়। শ্রীপ্রভু জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া স্বয়ং শ্রীমুখে একথা বলিলেন। ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিতেছেন—

এ দুয়েরে পাপী হেন না করিও মনে।
এ দুয়ের পাপ মুঞি লইনু আপনে॥
সর্ব্বদেহে করোঁ বোল চাল খাও।
তবে দেহপাত যবে মুঞি-চলি যাও॥

* * * *

তবে যে জীবের দুঃখ করে অহঙ্কার।
মুঞি করোঁ বলোঁ বলি পায় মহামার॥
এতেক যতেক কৈল এই দুই জনে।
করিলাম আমি, ঘুচাইলাম আপনে॥

প্রভু বলিলেন, মায়াশক্তিতে তিনিই জীবের মধ্য দিয়া অহঙ্কার [illegible] রন,

আবার চিচ্ছক্তিতে তিনিই মায়ামুক্ত করিয়া অভিমান দূর করেন এবং ভক্তি দিয়া পরমানন্দ দান করেন।

জীবের এই বাম্যভাবে শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ দাক্ষিণ্য বা অনুকূল ভাব অবলম্বন করিয়া জীবকে আকর্ষণ করিয়া লয়েন, এবং অবশেষে যখন জীব দাক্ষিণ্যভাব গ্রহণ করে, অর্থাৎ, শ্রীভগবানের দিকে উন্মুখ হয়, তখন তিনি বাম্যভাব অবলম্বন করিয়া একটু দূরে সরিয়া পড়েন, এবং জীবকে বিরহ দিয়া কাঁদিতে অবসর দেন। জগাই মাধাই, প্রকাশানন্দ প্রভৃতির তাহাই হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাঁহারা বহির্ম্মুখ রহিলেন, অবশেষে যখন প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার শ্রীচরণে টানিয়া লইলেন—তাঁহারা উন্মুখ হইলেন, তখন প্রভু সরিয়া পড়িলেন, এবং ক্রন্দন তাঁহাদের সম্বল হইল। এই ক্রন্দন জীবের বাঞ্ছনীয়। ইহাতে হৃদয় নির্ম্মল হয়, অপরকেও নির্ম্মল করে, এবং ইহাতে উত্তরোত্তর আনন্দবর্দ্ধন করে।

দাক্ষিণ্যভাবের দৃষ্টান্তস্থল রাজা প্রতাপরুদ্রপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর জন্য কাঁদিয়া আকুল ; এমন কি তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া যোগী হইতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত। কিন্তু দাক্ষিণ্যভাবের নিকট প্রভুর বাম্যভাব। তাই প্রভু তাঁহাকে উপেক্ষার ভাব দেখাইতে লাগিলেন। এ উপেক্ষায় রাজা প্রতাপরুদ্রের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল না, ইহাতে তাঁহার প্রেম আরো বর্দ্ধিত হইল। তিনি আপনাকে প্রেমহীন এবং শ্রীপ্রভুর অযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন। এই দৈন্যে তিনি আরো প্রেম পাইলেন এবং অবশেষে প্রভুর সঙ্গ পাইয়া ধন্য হইলেন।

এই যে বাম্য ও দাক্ষিণ্যভাবের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, ইহা বহিরঙ্গ ভাব। ইহার অন্তরঙ্গ ভাব আরো মধুর—আরো রসায়ন। অন্তরঙ্গ বাম্যভাবে ভক্ত শ্রীভগবানের সহিত মান করেন, আর রসিকশেখর শ্রীভগবান্ তখন যেন কত অপরাধীর ন্যায় ভক্তকে সাধিতে থাকেন। এই ভাবেরই পরিপূর্ণ

লীলামূর্ত্তি শ্রীরাধা, এবং শ্রীগোপিকাগণ এই ভাবের সর্ব্বদা পোষণ করেন। অন্তরঙ্গ দাক্ষিণ্যভাবে ভক্ত স্থিরানুকূল থাকিয়া পতিব্রতা পত্নীর ন্যায় শ্রীভগবানের সেবা করেন। কিন্তু এখানে আত্মসুখবাঞ্ছা আছে, শ্রীভগবান্ ভক্তের এই সুখবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং ভক্ত ভগবানের একটু কৃপা পাইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। এখানেও মান আছে বটে, কিন্তু ইহা তত গভীর নহে। এই দাক্ষিণ্যভাবের পরিপূর্ণ লীলামূর্ত্তি শ্রীরুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি, এবং মহিষীবৃন্দ এই ভাবের পোষণ করেন। অবশ্য এই ভাবের ক্রমোৎকর্ষেই ইহা আবার গোপীভাবে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। তাই আমরা দেখিতে পাই, শ্রীপ্রভুর কৃপায় সকলেই গোপীপ্রেম পাইল—মুরারি গুপ্তকেও তিনি গোপী-প্রেমামৃত আস্বাদন করাইলেন। এই যে বাম্য ও দাক্ষিণ্যভাবের লীলামূর্ত্তির কথা বলা হইল, ইঁহারা কৃষ্ণলীলায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ লীলা করিলেন এবং ইঁহারাই আবার গৌরলীলায় একত্র মিলিত হইয়া নাগরীরূপে শ্রীনবদ্বীপে প্রকাশিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এই দুই ভাবেরই পরিপূর্ণ সমাশ্রয় এবং নাগরীগণ ইঁহার কায়ব্যূহ বা লীলা-পোষণকারিণী।

গয়া হইতে আসিয়া প্রভু তিনভাবে প্রকাশিত হইলেন। একটী তাঁহার ভক্তভাব, অন্যটী তাঁহার ঈশ্বরভাব এবং অপরটী স্বয়ংভাব। ভক্ত-ভাবে তিনি আদর্শভক্ত; ঈশ্বরভাবে তিনি বিরাট্‌রূপ, এই রূপে তিনি সর্ব্বাবতারতারী; স্বয়ংভাবে তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি প্রেমময় শ্রীগৌরবিগ্রহ। প্রথমতঃ তিনি ভক্তভাবে স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে ভক্তিধর্ম্ম শিখাইলেন, এবং এই ভক্তির অনুশীলনে যে ভগবৎপ্রেম লাভ হয়, তাহাও দেখাইলেন। আদর্শ ভক্তভাবে যে তিনি 'কৃষ্ণ' বলিয়া অঝোরনয়নে কাঁদিলেন, সেইটী তাঁহার শ্রীরাধাভাব। তাঁহার ক্রন্দনে কঠিন হৃদয় দ্রব হইল। কৃষ্ণপ্রেম কি, তাহা জীব বুঝিল। যিনি পূর্ণ, তাঁহার সকল ভাবই পূর্ণ। জীবপ্রকৃতি

তিনি জানেন। কাহার নিকট কি ভাবে প্রকাশিত হইলে জীবের কল্যাণ হইবে এবং কে কি ভাবে তাঁহাকে ধরিতে পারিবে, তাহা তিনি অবগত আছেন। তাই তিনি বহিরঙ্গভাবে ভক্তরূপে আচরণ করিয়া জীবের ভক্তি জাগাইয়া দিলেন এবং তিনি কি বস্তু তাহা জীবকে জানিতে সুযোগ দিলেন। আবার সন্দিগ্ধচিত্ত জীবের নিকট তিনি ঈশ্বরভাবে নৃসিংহ, বামন, বরাহ প্রভৃতি অবতাররূপে এবং বিরাট্ বিশ্বরূপমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া জানাইলেন যে, তিনিই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর। ইহা দ্বারা তিনি ভয় ও সম্মানমিশ্রিত ভক্তি আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু সরলহৃদয়া অবলা নাগরীর নিকট তিনি ভুবনমোহন নবীননাগররূপে প্রকাশিত হইয়া, তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিলেন। যে যাহা চায়, সে তাহা পায়। প্রভু এবার জীবের স্বভাবের মধ্য দিয়া কৃপা করিতে আসিলেন। যাহার যে স্বভাব, প্রভু তাহার নিকট সেই ভাব ধরিয়া প্রকাশিত হইলেন, এবং সর্ব্বশেষে জীবকে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম দান করিলেন। জগাই মাধাইএর মদ্যপান করা স্বভাব। প্রভু নিতাইকে লইয়া দেখাইলেন, তাঁহারা নামের মদিরা পান করিয়া আরো মাতোয়াল। যাহারা মদ খায়, তাহারা ক্রমেই, যে মদে বেশী নেশা হয়, সেই মদ ধরে। জগাই মাধাই দেখিলেন, এই নূতন মদে নেশা বেশী, তাহারা এ সুযোগ ছাড়িবেন কেন! এই নামের মদিরা পান করিয়া তাঁহারা মত্ত হইলেন,—প্রভুর নিকট চিরবিক্রীত হইয়া গেলেন। আজকাল যেরূপ অনেকে গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়া সেই দাসত্বের অভিমান করেন এবং তাহাতেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই সময়ও অনেকে মুসলমান রাজার দাসত্ব করিয়া তাহারই স্পর্দ্ধা করিতেন। প্রভু আসিয়া দেখাইলেন যে, যদি দাস হইতে হয়, তবে আপনাকে 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া অভিমান করিলে তাহাতে যত সুখ হয়, অন্য দাসত্বে তাহার কোটীভাগের এক ভাগও হইবে না। অন্য দাসত্বে সাময়িক সুখ আছে বটে, কিন্তু বন্ধনজনিত দুঃখও অনেক—সে দুঃখ

অসহনীয়। আর শ্রীকৃষ্ণের দাসত্বে জ্বালা একবারে নাই, পরন্তু তাঁহার শ্রীচরণের দাসত্ব করিতে পারিলে জীব ধন্য হইয়া যায়। তাই তিনি আদর্শ কৃষ্ণদাস হইলেন। প্রতিষ্ঠালাভ করা যাহার স্বভাব, তাহাকে তিনি কার্য্যতঃ আচরণ করিয়া দেখাইলেন যে, প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করিলেই প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; প্রতিষ্ঠা চাহিয়া বেড়াইলে তত প্রতিষ্ঠা হয় না, বরং তাহাতে অতৃপ্ত বাসনাজনিত একটা জ্বালা আসে, এবং সেই প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তথাপি তাহা মিলে না; উহাতে আরো প্রতিযোগিতা বশতঃ শত্রুতার সৃজন করে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এত বড় পণ্ডিত হইয়া এত তৃণাদপি সুনীচ হইলেন যে, তিনি বিনয় ও দৈন্যের পরিপূর্ণ আদর্শ। প্রতিষ্ঠাকে তিনি যতই উপেক্ষা করিলেন, ততই তিনি সকলের নিকট প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সকলে সম্মান চায়, তিনি অমানী হইয়া সকলকে মান দিলেন। এই সকল লোক তাঁহার দীনতাগুণে আকৃষ্ট হইলেন। পরের কুৎসা করা, বিশেষতঃ পরনারীর সমালোচনা করা ও কুলটাগণের চরিত্রচর্চ্চা করা অনেকের স্বভাব। প্রভু আসিয়া জানাইলেন. শ্রীরাধা এবং গোপিকা-গণ অপেক্ষা অধিক কুলটা আর কে হইতে পারে! তাঁহারা পরপুরুষ বা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে পড়িয়া কুলশীলে জলাঞ্জলি দিলেন—তাঁহারা কলঙ্কের ডালি মাথায় লইলেন। প্রভু বলিলেন, 'ইঁহাদের চরিত্র সমালোচনা কর; তোমাদের স্বভাব চরিতার্থ হইয়া যাইবে।' তাই প্রভু পরিপূর্ণ আদর্শরূপে শ্রীরাধা ও গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেম কীর্ত্তন করিলেন, যেন সকল ভাবের লোকই ইহাতে আকৃষ্ট হয়। নির্ম্মল চিন্ময় বস্তুর যে ভাবেই সঙ্গ করা যায়, তাহাতেই সঙ্গ-প্রভাবে হৃদয় বিশুদ্ধ ও চিদানন্দময় হইয়া যায়। আবার নর্ত্তন কীর্ত্তন সকল জীবেরই স্বভাব। প্রভু এই নাচা গাওয়াকেই ধর্ম্ম করিয়া দিলেন, এবং কিরূপে নাচিতে গাহিতে হয়, তিনি আপনে নাচিয়া তাহা শিখাইলেন। ভোজন করা জীবের স্বভাব, রসনার তৃপ্তির

জন্য অনেকে ব্যস্ত। প্রভু আসিয়া জানাইলেন, "যে কিছু উত্তম উত্তম দ্রব্য তোমার আস্বাদন করিতে অভিলাষ হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া লও, দেখিবে উহাতে রসনার অপূর্ব্ব তৃপ্তিসাধন করিবে, সেই সব জিনিষের আস্বাদন আরো মধুর হইবে।" ইহাও তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইলেন। এইরূপে জীবের অনন্তভাব লইয়া প্রভু পরিপূর্ণ আদর্শ ভক্ত-ভাবে প্রকাশিত হইয়া বহির্ম্মুখজীবকে আকর্ষণ করিলেন।

আবার যাঁহারা রূপের মোহে মুগ্ধ, সংসারের পতিপুত্রাদির ভালবাসায় বদ্ধ, সেই সকল সরলচিত্তা নারীগণেব নিকট তিনি পরম রূপবান্ পুরুষ ও অখিল রসামৃতমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন। নারীগণ দেখিলেন, এ রূপের তুলনা নাই, এ লাবণ্যের অবধি নাই, এ প্রেমময় শ্রীবিগ্রহ অনন্তরসের সাগর। তাই তাঁহারা গৌরপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া কামময় ভালবাসা ভুলিয়া গেলেন। নাগরীগণ তাঁহাকে কিরূপ দেখিলেন ? না—

চাচর চিকুর চারু ভালে। বড়িয়া মালতীর মালে॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা। পত্রের সহিত ফুলশাখা॥
কষিল কাঞ্চন জিনি অঙ্গ। কটিমাঝে বসন সুরঙ্গ॥
চন্দন তিলক শোভে ভালে। আজানুলম্বিত বনমালে॥
নটবর বেশ গোরাচাঁদে। রমণীকুলের কিবা ফাঁদে॥

বাসুঘোষ বলিতেছেন,—

তা দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে। প্রাণ মোর স্থির নাহি বাঁধে॥

এই যে নবীননাগর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, ইনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন। এই প্রেমময় মূর্ত্তিই জীবের প্রাণের পরম প্রিয়সামগ্রী, কারণ প্রেমেই জীবের চির অবস্থিতি। এই প্রেমময় গৌরতনু দর্শন করিয়া নাগরীগণের কি অবস্থা হইল দেখুন। এক নাগরী আর এক নাগরীর নিকট বলিতেছেন,—

সই গো ! গোরারূপ অমৃত পাথার ।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার ॥

গৌররূপ-সাগরে নাগরীর মনঃপ্রাণ ডুবিয়া গিয়াছে। এখন তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে পাইতে বড় সাধ হইয়াছে, কিন্তু কি সাধনের বলে তাঁহাকে পাইবেন, তাহা তিনি জানেন না। তিনি জানেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার বক্ষোবিলাসিনী। এ বস্তু যে: সকল সাধনার অতীত, নাগরী তাহা ধারণা কবিতে না পারিয়া, প্রাণের আবেগে আইঢাই করিয়া ভাবিতেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া না জানি কত সাধনার বলে এহেন বস্তু পাইয়াছেন। নাগরী আবার ভাবিলেন, তিনি যে একবার তাঁহার দর্শন পাইযাছেন, এজন্যও ত তিনি কোন সাধনা করেন নাই। তিনি ত স্বয়ং কৃপা করিয়া তাঁহার নিকট উদিত হইয়াছেন। এখন যে তাঁহার রূপসুধা তিনি নিত্য আস্বাদন করিতে চান, ইহাও তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ।

আবার প্রেমের স্বভাবে তাঁহার দীনতা আসিল। তিনি দৈন্যসহকারে ভাবিলেন, তাঁহার প্রেম নাই, কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গকে পাইতেছেন না। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার সহিত নিত্য মিলিত, কারণ তাঁহার প্রেম অগাধ— তিনি সরলতার পরিপূর্ণ ছবি। তাই নাগরী বলিলেন,—

সখি রে ! কিবা ব্রত কৈল বিষ্ণুপ্রিয়া।

এই প্রশ্নের মীমাংসা তখনই তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হইল। তিনি দেখিলেন কোন ব্রত তপস্যায় এহেন বস্তু মিলাইয়া দিতে পারে না। যিনি অপার প্রেমের সাগর, সর্ব্বরসের রসিক, যিনি রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি, তিনি তাঁহারই যোগ্যা রসিকার নিকট নিত্য বিরাজ করেন ; তাই নাগরী বলিতেছেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া কিরূপ ? না—

অগাধ অথল তাঁর হিয়া ॥

অর্থাৎ প্রেমের পারাবার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়খানি অনন্তমাধুর্য্যের খনি।

আপনাকে যখন নাগরী প্রেমহীন মনে করিলেন, এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিপূর্ণ প্রেমময়ী বলিয়া স্থির করিলেন, তখন স্বভাবতঃ তাঁহার মনে হইল যে, যদি তিনি শ্রীমতীর পায়ে পড়িয়া থাকেন—তাঁহারই অনুগা হইয়া চলেন, তবে তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া তাঁহারই কৃপাবলে তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের রূপমাধুরী নিত্য আস্বাদন করিতে সুযোগ পাইবেন।

সুন্দরের সকলই সুন্দর। যিনি সুন্দরের সেবা করেন এবং একবার যাঁহার হৃদয়ে গৌরাঙ্গ-সুন্দরের অপার সৌন্দর্য্য লাগিয়া রহিয়াছে, তাঁহার সকল কথা ফুরাইয়া যায়। তিনি তখন অপার সুন্দর নাগরবর দর্শন করিয়া কেবল বলেন, 'কি সুন্দর! কি সুন্দর! এ যে সবই সুন্দর! সবই সুন্দর!' পদকর্ত্তা শেখররায় সৌন্দর্য্যসায়রে ডুবিয়া গিয়াছেন, তাই তিনি আর কিছু বলিতে না পারিয়া কেবলমাত্র বলিতেছেন,—

সুন্দর সুন্দর গৌরাঙ্গ-সুন্দর, সুন্দর সুন্দররূপ।
সুন্দর পিরীতি রাজ্যের যেমতি সুঘড় সুন্দর ভূপ॥
সুন্দর বদনে সুন্দর হাসনি সুন্দর সুন্দর শোভা।
সুন্দরনয়ানে সুন্দর চাহনি সুন্দর মানস লোভা॥
সুন্দর নাসাতে সুন্দর তিলক সুন্দর দেখিতে অতি।
সুন্দর শ্রবণে সুন্দর কুণ্ডল সুন্দর মেঘের পাতি।
সুন্দর গীমেতে সুন্দর দোলয়ে সুন্দর কুসুম হারা॥
সুন্দর নদীয়ানগরে বিহার, সুন্দর গৌরাঙ্গচাঁদ।
সুন্দরলীলার সৌন্দর্য্য না বুঝে শেখর জনম আঁধ॥

এখন দেখুন আমার গৌরাঙ্গসুন্দর কি সুন্দর! এ যে চির সুন্দর! এ যে নবীন সুন্দর! সুন্দর—সুন্দর—অতিসুন্দর—সুন্দর হইতেও সুন্দর—পরম সুন্দর। জগতের অসীম সৌন্দর্য্য যে আমার গৌরাঙ্গসুন্দর হইতেই আসিয়াছে! তিনি যে অনন্ত সৌন্দর্য্যের নিধান! এখন ভাবুন আমাদের

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বস্তুটী কি! যাঁহারা সৌন্দর্য্যের উপাসনা করেন, তাঁহারা এই গৌরাঙ্গসুন্দরকে একবার দর্শন করিয়া নয়ন তৃপ্ত করুন। আমাদের গৌরাঙ্গসুন্দরকে দর্শন করিয়া জগতের দিকে একবার চাহিয়া দেখুন, দেখিবেন, এ যে সকলই সুন্দর! জগৎ সংসার সকলই সুন্দর! গৌরাঙ্গ-সুন্দরকে লইয়া জগৎখানি আস্বাদন করুন, দেখিবেন, সকলই সুন্দর! সকলই মধুর! সকলই সুখময়!

শেখর দুঃখ করিয়া বলিতেছেন যে, যিনি গৌরাঙ্গসুন্দরের সুন্দরলীলার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে না পারিলেন, তিনি চক্ষু থাকিতে অন্ধ।

কাঞ্চন পাইলে আর কাচের প্রতি স্পৃহা থাকে না। নাগরীগণও যখন এহেন গৌরাঙ্গনিধির দর্শন পাইলেন, তখন আর তাঁহাদের ছার কুলশীলের দিকে লক্ষ্য রহিল না। নাগরী বলিতেছেন,—

ওরূপ নেহারি, চিত উমতাওল,
সরম ভরম গেও, হইনু অথির।
সজনি। গোরারূপের কতই মাধুরী।
সতী কুলবতী হাম, ঐছন বেয়াকুল,
নিমিখেতে হইল বাউরি॥

আবার কাচের মধ্য দিয়া কাঞ্চন দর্শন করিলে অনেক সময় সুন্দর বোধ হয়। তাই, কোন নাগরীর সরম রহিয়া গেল তিনি বলিতেছেন,—

আজু গৌরক দরশন বেলি।
মাইরি দিঠে * ভারি, মাধুরী পীবইতে,
লাজ বৈরিণী দুঃখ দেলি॥

শ্রীগৌরাঙ্গ পরিপূর্ণ ভাবময়; সুতরাং তিনি যে ভাবেই বিচরণ করুন

* দিঠে—দৃষ্টিতে।

না কেন, তাঁহাকে সকলেই স্ব স্ব ভাবানুরূপ দর্শন করিতেন। প্রভু ভক্তভাবে কৃষ্ণবিরহে অঝোরনয়নে কাঁদিতেন, ভক্তগণ ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদন পাইতেন; কিন্তু নাগরীগণ তাঁহাকে কখন ভক্তরূপে গ্রহণ করিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিভাব বা কৃষ্ণপ্রেম দর্শন করিয়া নাগরীগণ ভক্তিভাব বা কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিবেন, এভাব নাগরীগণের হৃদয়ে একেবারে ছিল না। তাঁহারা গৌররূপ দেখিয়া ভুলিয়াছেন—গৌররূপেই মজিয়াছেন; আর কোন বাসনা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাই তাঁহারা তাঁহাদের সোণার গৌরাঙ্গচাঁদকে যে ভাবে দর্শন করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের স্ব স্ব ভাবেরই পোষণ হইত, তাঁহাদের গৌররসই বৃদ্ধি পাইত। গৌরাঙ্গসুন্দরের নয়নজল দেখিয়া তাঁহারা ভাবিতেন,—তাঁহারা যেমন গৌরাঙ্গের জন্য বিরলে বসিয়া কাঁদিতেন, আর গুরুজনের ভয়ে গৃহের বাহির হইতে না পারিয়া আরো অস্থিরচিত্ত হইতেন, গৌরাঙ্গও সেইরূপ তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া তাঁহাদেরই সহিত মিলিত হইবার জন্য নাগরীর প্রেমে অশ্রুজল ফেলিতেন। ইহাতে নাগরীর প্রেম আরো বর্দ্ধিত হইত। যথা—

ওরূপ সুন্দর গৌরকিশোর।
হেরইতে নয়নে আরতি নাহি ওর॥
লোল বিলোচন লোলত লোর।
রসবতী হৃদয়ে বাঁধিল প্রেমডোর॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে নৃত্য করিতেন, আর ভক্তগণও কৃষ্ণপ্রেমে সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেন। নাগরীগণ সেই নর্ত্তনমাধুরী দর্শন করিয়া আরো মুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা দেখিতেন, নৃত্যের সময় তাঁহার প্রতি অঙ্গ দিয়া ঝলকে ঝলকে রূপমাধুরী ক্ষরিত হইতেছে। তাঁহারা দেখিতেন, তাঁহার রসাল দুটী আঁখি, চঞ্চল নয়নতারা, সুন্দর অধরে সুমধুর হাসি, বাহুর দোলনি, কটির

শোভা, নূপুরের ঝুনুর ঝুনুর শব্দ, দেহের নানাবিধ সুললিত ভঙ্গী, সকলই তাঁহাদের মনঃপ্রাণ আরো কাড়িয়া লইতেছে। নাগরীগণ ভাবিতেন, তাঁহাদের মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লইবার নিমিত্তই এই সুমধুর রসনৃত্যের অবতারণা। আবার কোন কোন নাগরী ভাবিতেন, নাগরবর তাঁহাদেরই প্রেমে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কে বলিতে পারে সত্য সত্যই তিনি নাগরীর মন ভুলাইবার জন্য নৃত্য করেন নাই? সত্য বস্তু সম্বন্ধে যিনি যাহা ভাবেন, তাহাই সত্য। নাগরীগণ ত তাঁহাকে কিশোর গৌরাঙ্গ ছাড়া অন্যরূপে দর্শন করিতেন না। সত্য সত্যই তিনি নবীননাগর, নাগরী-জনবল্লভ। তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্যই নটনমাধুরী প্রকাশ করিলেন। এইটী তাঁহার অন্তরঙ্গভাব।

নাগরীগণ পরস্পর মিলিত হইয়া যখন সমস্বরে মধুরকণ্ঠে গৌরগীতি গাহিতেন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত। নিম্নে একটী গান দিতেছি—

মধুকররঞ্জিত-মালতীমণ্ডিত-জিতঘনকুঞ্চিতকেশম্।
তিলকবিনিন্দিত-শশধররূপকযুবতীমনোহরবেশম্॥
সখি কলয় গৌরমুদারম্।
নিন্দিত হাটককান্তিকলেবরগর্ব্বিতমারকমারং॥ ধ্রু॥
মধুমধুরস্মিত-লোভিত-তনুভৃতামনুপমভাববিলাসম্।
নিধুবন-নাগরীমোহিত-মানসবিকসিত-গদগদভাষম্॥

গৌরগতপ্রাণা নাগরীবৃন্দ যখন উত্তালনয়নে, এই জড় জগৎ ছাড়াইয়া যাইয়া সেই অপ্রাকৃত চিদানন্দ বস্তু অশেষ গুণধাম শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের গীতি গাহিতেন, তখনকার চিত্রটী দর্শন করুন। সকলেরই দৃষ্টি ঊর্দ্ধে, নয়ন দিয়া অবিরল অশ্রুধারা পড়িতেছে, সে ধারা গণ্ড বাহিয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিতেছে, মাঝে মাঝে বদনকমলে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিতেছে, আবার ক্ষণপরেই আরো বেগে নয়নধারা পড়িতেছে, বেশভূষার দিকে লক্ষ্য নাই,

বহির্জগতের দিকে দৃক্‌পাত নাই, সকলেই নিশ্চল নিস্পন্দ। নাগরীগণের এই চিত্রটী হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়া আপনারাও একবার গুর্জরী রাগিণীতে এই পদটী গান করুন, আপনারাও নাগরীব মত অপার আনন্দ পাইবেন।

নাগরীভাবে শ্রীভগবানের ভজন করা সহজ ও মধুর, কারণ ইহা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সাধারণতঃ মানুষের হৃদয় স্ত্রীলোকের দুঃখ দেখিয়া দ্রব হয়। কোন নারী যদি করুণস্বরে অঝোরনয়নে ক্রন্দন করেন, তবে তাহা অসহ্য হয়। তখন স্বতঃই তাঁহার দুঃখ-নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করে, এবং এই দুঃখ দূর করা যদি সাধ্যায়ত্ত না হয়, তবে ঐ নারীর সঙ্গে নিজেরও কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। এ দুঃখ দেখিয়া স্বভাবতঃই নয়নে জল আসে। নাগরী গৌররূপ দর্শন করিয়া নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন। দ্বিতীয়বার আর গৌরাঙ্গের দর্শন পাইতেছেন না। তিনি বলিতেছেন,—

না হেরি গৌরাঙ্গ মুখ, বিদরিয়া যায় বুক।

গৌরমুখ দর্শন না করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তিনি আর কি করেন, কুলশীল সব ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। তিনি সখীর নিকট বলিতেছেন,—

লও কুল লও মান, লও শীল লও প্রাণ,
লও মোর জীবন যৌবন।

পরাণসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জন্য কুল মান ত দূরের কথা, জীবন যৌবন পর্য্যন্ত ছাড়িতে প্রস্তুত। তারপর যখন নাগরী দেখিলেন, আর তাঁহার প্রাণবল্লভের দর্শন পাইতেছেন না, তখন তিনি সুরধুনীতে যাইয়া এ অসার দেহ বিসর্জ্জন করিতে চলিলেন। নাগরী বলিলেন,—

নতু সুরধুনী নীরে পশিয়া ত্যজব প্রাণ
পরাণের পরাণ মোর গোরা।

প্রাণের প্রাণ গৌরাঙ্গসুন্দরকেই যদি না পাওয়া গেল, তবে আর এ ছার

দেহ রাখিয়া লাভ কি? নাগরীর এ হেন অসহনীয় দুঃখ দেখিয়া আপনি নাগরীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিবেন, গৌরাঙ্গের ইহা অন্যায়ই বটে। আপনিও তখন নাগরীর সঙ্গে সঙ্গে সুরধুনীতে দেহ বিসর্জ্জন করিতে যাইবেন। কিন্তু প্রেমে ভক্ত দেহ ত্যাগ করিতে চাহিলেও ভগবান্ তাহা দেন না। তখন তখনই তিনি আসিয়া দর্শন দেন। আপনিও নাগরীর সঙ্গে থাকিয়া সেই সুযোগে গৌর দর্শন পাইবেন।

নাগরী নিত্য চিন্ময় বস্তু। আপনি যদি নাগরীর সঙ্গ করেন, তবে আপনিও নিত্য চিন্ময় হইয়া যাইবেন, এবং গৌরভজনের আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন। মহাজনগণ নাগরীভাব বর্ণনা করিয়া বহু পদ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই সব অমূল্য পদই আমাদের প্রধান অবলম্বন, ইহার আশ্রয়েই আমরা নাগরীগণের সঙ্গ করিতে পারি। ইহাকেই বলে অনুগ-ভজন।

(১৫)

শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানগরে সংকীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইয়াছেন অবধি নাগরী-গণের মধ্যে প্রেমের এক নূতন তরঙ্গ খেলিল। যাঁহারা সংসারের বাধা অতিক্রম করিয়া এ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরান্তিকে যাইতে পারেন নাই, হরি-সংকীর্ত্তনের ঢেউ লাগিয়া তাঁহাদের পতি, ভ্রাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতির হৃদয় বিশুদ্ধ হইল। সুতরাং তাঁহারা আর কাহারও নিকট হইতে বাধা প্রাপ্ত হইলেন না, পরন্তু তাঁহাদের ঐহিক আত্মীয়স্বজন তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছায় শ্রীগৌরান্তিকে যাইতে অনুমতি দিতে লাগিলেন। প্রভু প্রকাশিত হইয়াছেন পর ইহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নিমাই-পণ্ডিত বস্তুটী কি। কেহ বুঝিলেন, ইনি পরম ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। ইনি যে পরম জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, এবং শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি ইঁহার মধ্যে ক্রীড়া করে, ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল

না। শ্রীগৌরাঙ্গের দেহ হইতে সর্ব্বদাই, বিশেষতঃ সংকীর্ত্তন সময় এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইত, এবং এমন এক মধুর আভা বিচ্ছুরিত হইত যে, তাহা দেখিয়া কেহই তাঁহাকে এ জগতের বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। সুতরাং যাঁহারা তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া চিনিয়াছিলেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই, যাঁহারা তাঁহাকে এতাদৃশ অপার্থিব বস্তু, অশেষ গুণসম্পন্ন, সুমধুর প্রকৃতি বিশিষ্ট একজন লোকাতীত মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাদের স্ব স্ব পত্নীকে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্নিধানে পাঠাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। নাগরীগণ শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় এহেন অনুকূল পতি পাইয়া উল্লসিত হইলেন। এক নাগরী বলিতেছেন,—

মোর পতি অতি সুজন সজনি !
শুনলো তাঁহার রীতি।
গত দিন তেঁই বিরলে বসিয়া
কহয়ে পিতার প্রতি ॥
"নদীয়া-নগরে নিমাই-পণ্ডিত
ঈশ্বর-শকতি তাঁর।
কেবা সিরজিল না জানি এ রূপ-
গুণের নাহিক পার ॥
হেন জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক কখনো
না দেখি আপন আঁখে।
দুর্ম্মতি জনের প্রতি অতি দয়া
ভাসয়ে কীর্ত্তন সুখে ॥
তাহে বলি নিজ- বধূগণে কভু
ভুলি না নিষেধ তুমি।

তাঁর দরশনে অশুভ বিনাশে
নিশ্চয় জানিয়ে আমি॥
ভাগ্যবতী সব বহু, (বৌ) কি কহব
অধিক কহিতে নারি।
তাহে ধন্য এই নারী জনমের
বালাই লইয়া মরি॥
মিছা অভিমানে মাতি রাত্রি দিনে
রহিয়ে অন্ধের পারা।
নদীয়ার মাঝে হেন অপরূপ
চিনিতে নারিয়ে মোরা॥
ব্রজে ব্রজনাথে দ্বিজে না জানিল,
পাইল দ্বিজের নারী।
সেইরূপ এথা, ইথে না সন্দেহ,
বুঝিনু বিচার করি॥"

পতির মুখে এরূপ অনুকূল কথা শুনিয়া নাগরীর আনন্দ আর ধরে না। পতি তাঁহার পিতাকে বলিতেছেন, তিনি যেন বধূগণকে শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে যাইতে ভুলেও নিষেধ না করেন। এ কথায় নাগরীর উৎফুল্ল হইবারই কথা। আজ যদি আমাদের সংসাররূপ পতি আমাদের গৌরদর্শনে এরূপ সহায়তা করে, তবে আমাদেরও আর আনন্দের সীমা থাকে না, আমরা তাহা হইলে আনন্দে নাচিয়া বেড়াই, আর মনের সাধ পূরাইয়া নিভৃতে বসিয়া গৌরাঙ্গমাধুরী আস্বাদন করি। তবে সংসারকে অনুকূল করার একমাত্র উপায় এই সংকীর্ত্তন যজ্ঞ। এই সংকীর্ত্তনে হৃদয় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইলে সংসার আর প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে না। হৃদয়ে যে পরিমাণে মলিনতা থাকে, সংসারও সেই পরিমাণে

প্রতিকূলাচরণ করে। প্রভুর নামসংকীর্ত্তনের চিন্ময় শক্তির প্রবল প্রভাবে নাগরীর হৃদয় সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইয়াছিল। পূর্ব্বে গৌররূপ দর্শনে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে হয় ত কিঞ্চিৎ কামময় বাসনা ছিল। গৌরাঙ্গকে শুধু রূপবান্ পুরুষ বলিযাই মনে করিয়াছিলেন ও রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এখন সংকীর্ত্তন-প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন, তিনি পরম পুরুষ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাই নাগরী তাঁহাকে একমাত্র পতি বলিয়া স্থির করিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পতিও স্বয়ং অনুকূল হইয়া অন্যান্য সকলকেও নাগরীর গৌরপ্রাপ্তি-বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। নাগরী ইহা শুনিয়া উল্লসিত চিত্তে সখীর নিকট বলিলেন,—

এইরূপ পিতা- পুত্র দুহে কথা
কহয়ে অনেক মতে।
আড়ে থাকি তাহা শুনিয়া শুনিয়া
হনু উলসিত চিতে॥
মনে হ'ল হেন বেলে যদি গোরা-
চাঁদেরে দেখিতে পাতুঁ॥
নয়নের কোণে এ সব কাহিনী
তাঁহারে কহিয়া দিতুঁ॥
এই কালে পাড়া- পানে ঘন ঘন
উঠিল আনন্দধ্বনি।
তরাতরি পথে দাঁড়াইনু গিয়া
গৌর গমন জানি॥
দূরে থাকি আঁখি ভরি নিরখিলুঁ
কিবা অপরূপ শোভা।

ঝলমল করে চারিদিকে হেন
জিনিয়া অঙ্গের আভা॥
তাঁর বামে গদা- ধর, নিত্যানন্দ
দক্ষিণে আনন্দ-রাশি।
চারি পাশে আর পরিকর তারা
নিরখে ও মুখশশী॥
নিজগণ সঙ্গে রসিকশেখর
আইসে রসের ভরে।
সে চাহনি চারু হেরিয়া এমন
কে আছে পরাণ ধরে॥
হাসি হাসি কথা- ছলে সুধারাশি
বরিখে ন'দের চাঁদ।
অঙ্গভঙ্গী ভারি ভুলালে ভুবন
যেন সে মদন ফাঁদ॥
প্রাণনাথ গতি জানি পাড়াবাসী
যুবতী আসয়ে ধাঞা।
তা সবার শাশুড়ী ননদী দারুণ
নিবারি অনেক কৈঞা॥
মোরে কেহ নাহি নিবারিল মুই
পূরালুঁ মনের সাধা।

নাগরীর এহেন সুযোগ ও আনন্দ দেখিয়া

নরহরি কহে যার পতি অতি
প্রসন্ন তার কি বাধা॥

পতির প্রসন্নতায় নাগরীর প্রাণে এত বল হইয়াছে যে, অন্যান্য

নাগরীর শাশুড়ী ননদাকেও তিনি বারণ করিয়া রাখিলেন। এইরূপে এক ভক্ত অপর ভক্তকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

বৃদ্ধদের হৃদয় বড় কঠিন। তাঁহারা যে সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া আছেন, তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া বড় দুরূহ ব্যাপার। পতি অনুকূল হইয়াছেন, পিতাকেও বলিতেছেন যে, তিনি যেন ভুলেও পুত্রবধূকে শ্রীগৌরাঙ্গান্তিকে যাইতে নিষেধ না করেন। কিন্তু তথাপি তিনি বিবিধবিধানে শিবপূজা করেন, এবং গলবস্ত্র হইয়া দুই কর যুড়িয়া শিবের নিকট বর মাগেন যে, বধূগণ যেন স্থির হইয়া ঘরে থাকে। গৌরাঙ্গ নদীয়াবাসী সকলকে পাগল করিল। তাঁহার বৌ ঝিরা যেন পাগল হইয়া ঘরের বাহির না হয়—তাহারা যেন এ পাগলামীতে যোগ না দেয়। নাগরী বলিতেছেন,—

শাশুড়ী ননদ যেরূপ আমার
তাহা কি না জান সই।
শ্বশুরের গুণ কহিতে না হয়
কিঞ্চিৎ তোমারে কই॥
ঘরে বসি থাকে চলিতে শকতি
নাহিক, নিপট কুঁজা।
নানাদ্রব্য লৈয়া বিবিধ-বিধানে
করয়ে শিবের পূজা॥
গলায় বসন দিয়া, দুই কর
যুড়িয়া মাগয়ে বর।
থির হইয়া রহে বধূগণ যেন
তিলেক না ছাড়ে ঘর॥

বৃদ্ধ না জানিতে পারেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু। কিন্তু শিব ত আর এবিষয়ে অনভিজ্ঞ নহেন। তিনি ত জানেন, শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের প্রাণের

প্রাণ—একমাত্র আরাধ্য বস্তু। বৃদ্ধ শিবপূজা করিয়াছেন। যদিও তিনি শিবের নিকট তাঁহারই পরিমাণানুরূপ বর চাহিয়াছেন, শিব তাহা শুনিবেন কেন! পূজার যাহা চরম ফল, তাহাই তিনি প্রদান করিবেন। বৃদ্ধ কি বর মাগিলেন, আর কি ফল পাইলেন, দেখুন। একদিন ঐ রাস্তা দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর পরিকরবৃন্দ লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছেন; মৃদঙ্গের মধুরধ্বনি শুনিয়া নাগরী বাহির হইলেন। বৃদ্ধ জানেন, মৃদঙ্গের ধ্বনি শুনিলেই বধূ চঞ্চল হইবেন। তিনিও সচকিত হইলেন, আর বাস্তবিকও দেখিলেন, তাঁহার পুত্রবধূ গৌরদর্শনের নিমিত্ত একটু বাহিরে আসিয়াছেন। তখন বৃদ্ধ কি করিলেন? না—

তার পাছে পাছে ধাইয়া আইলা
বিষম লগুড় লৈয়া।
কি করিবে তিহো পরাণ উড়িল
শ্বশুরের পানে চাঞা॥

বৃদ্ধ পুত্রবধূকে মারিতে গেলেন। পুত্রবধূ ভয় পাইলেন। কিন্তু ক্ষণপরেই বৃদ্ধ ভাবিলেন, তাঁহার বধূর দোষ কি! গৌরাঙ্গেরই যত দোষ। ইনিই সকলকে পাগল করিতেছেন। তাই, বৃদ্ধ

কোরধ নয়ানে সে পুনঃ বারেক
হেরিল গৌরাঙ্গচাঁদে।
আঁখি ফিরাইতে নারিল অমনি
পড়িল প্রেমের ফাঁদে॥
পরম হরষ হইয়া হাতের
লগুড় ফেলাঞা দিলা।
হরি হরি বলি তুলিয়া দুবাহু
নাচিয়া বিহ্বল হৈলা॥

নাগরী ইহা দেখিয়া কি করিলেন?

এহেন কৌতুক দেখিয়া নাগরী
আনন্দে চলিল ঘরে।

শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। আর বৃদ্ধ গৃহে আসিয়া নাগরীকে কত প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন।

কতক্ষণে তেঁই যাইয়া কতনা
প্রশংসা করিল তারে॥
করে ধরি তাঁর আপনার দোষ
কহিতে আতুর হৈলা।

নাগরীর ইহাতে অভিমান হইল না। তিনি

দেখি বেয়াকুল চরণ বন্দিল
তাহাতে আনন্দ পাইলা॥

এই সব দেখিয়া শুনিয়া

নরহরি কহে এতদিনে যেন
সকল সঙ্কোচ গেল।
বধূর কৃপায় বুড়ার বিষম
হৃদয় হইল ভাল॥

এইরূপে গৌরাঙ্গ কেবল যে নাগরীবল্লভ হইলেন, তাহা নহে, তিনি জীবজনবল্লভ হইলেন। গয়া হইতে আসিয়া তিনি অধ্যাপনা কার্য্য ছাড়িয়া ছিলেন, এবং শিষ্যমণ্ডলী লইয়া প্রথম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শিষ্যগণকে তিনি সকল বিদ্যার পরিপূর্ণ ফল প্রেম দান করিলেন। "নাম-সংকীর্ত্তন হয় আনন্দস্বরূপ।" শিষ্যগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। আদর্শপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ দেখাইলেন যে, দানের মধ্যে বিদ্যাদানই প্রধান

দান, এবং সর্ব্বোপরি প্রেমদানই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান। ইহার একমাত্র উপায় সংকীর্ত্তন। নামসংকীর্ত্তন করিতে সকলেই অধিকারী, সকলেই সমর্থ। প্রভু শুদ্ধ নামসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, যেন, সকলেই ইহাতে যোগদান করিতে পারে। যাঁহার তানলয় জ্ঞান না আছে, তিনিও নামসংকীর্ত্তন করিতে পারেন। ইহাই প্রকৃষ্ট সাধনা। পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন, বালক বৃদ্ধ, নরনারী সকলের জন্য তিনি এই সহজ ব্যবস্থা করিলেন। টোলে প্রথমতঃ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া পরে নিজগৃহে বসিয়াই সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রভু আদর্শ সংসারী, আদর্শ গৃহী। ইহা দ্বারা তিনি দেখাইলেন, প্রত্যেক গৃহীই স্ব স্ব গৃহে বসিয়া পরিবার পরিজন লইয়া সংকীর্ত্তন করিবেন। প্রতি গৃহই ভজনমন্দির হইয়া যাইবে। তাহা হইলেই জগত সংসার সুখময় হইবে। সেই আনন্দ-নিকেতন শ্রীগোলোকধামে যাইতে হইলে একাকী যাইয়া সুখ নাই। সকলকে লইয়া নাচিয়া গাহিয়া চলিয়া যাইতে পারিলেই পরমানন্দ, আমারই সুখের তরে যে সকল আত্মীয়স্বজন কত শত চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে সেই পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। আপনি হয়ত বলিবেন, ইঁহারা ঐহিক সুখের বিধান করেন, এবং ইহাতে কেবল মাত্র বন্ধন হয়। ভাল কথা; ইঁহারা ত ইঁহাদের পরিমাণানুরূপ কার্য্য করেন, ইঁহারা যাহা সুখ বলিয়া বুঝিয়াছেন, সরলচিত্তে তাহারাই বিধান করিতেছেন; আপনি যদি ইহা অপেক্ষা স্থায়ী নিত্য সুখের সন্ধান পাইয়া থাকেন, তবে ইঁহাদিগকে তাহার ভাগ দেওয়া আপনার একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে আপনার ভাগ কমিয়া যাইবে না, উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইবে। এরূপ সহজ সুন্দর পন্থা থাকিতে, আমরা আর কেন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই। জগতের যাবতীয় কার্য্যই সুখময়, প্রতি কার্য্যই এক একটী সুখের বিধান। তবে এই কার্য্য ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ ভাবে করিলে বন্ধনের

হেতু হয়, এবং সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ আনয়ন করে। প্রতিগৃহে নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইলে, নামের প্রভাবে স্রোত ফিরিয়া যাইবে, এই সংসারের সুখই নিত্য-সুখে পরিণত হইয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। যিনি ধরিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন—তিনিই বিশ্বসংসার সুখময় দেখিতেছেন ; তবে আসুন, আমরা এই পরিপূর্ণ আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পদানুসরণ করিয়া, গৃহে গৃহে স্ব স্ব পরিজন লইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেই—ভূলোকে গোলোক প্রতিষ্ঠিত হউক।

কিছুদিন নিজগৃহে সংকীর্ত্তন করিয়া প্রভু শ্রীবাসের বাড়ীতে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, এবং তারপর পরিকরবৃন্দ লইয়া নগরে নগরে সংকীর্ত্তন করিলেন। ইহাদ্বারা প্রভু দেখাইলেন, প্রথমতঃ সংসার সীমাবদ্ধ থাকে—জীব সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া অল্পকয়েক জন লোককে নিজজন বলিয়া মনে করে। কিন্তু সংকীর্ত্তন-যজ্ঞদ্বারা অল্প কয়েক জন লইয়া শ্রীভগবানের ভজনা করিতে করিতে ক্ষুদ্র সীমা ছাড়াইয়া যায়, সংসার ক্রমেই বাড়িয়া যায়, এবং অবশেষে বিশ্বসংসার সকলই আপন হইয়া যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ নদীয়াবিনোদ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যখন কীর্ত্তন লইয়া নগর দিয়া নাচিয়া যাইতেন, তখন নাগরীগণের সাধ হইত, তাঁহারা নদীয়া জুড়িয়া দেহখানি বিছাইয়া দেন এবং তাহার উপর দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নাচিয়া যান। এ হেন ননীর পুত্তলী কঠিন রাস্তা দিয়া নাচিয়া যাইবেন, নাগরীগণের ইহা সহিত না। তাই, নাগরী বাঞ্ছা করিতেন,—

মনে করি ন'দে যুড়ি এবুক বিছাই।
তাহার উপরে আমি গৌরাঙ্গ নাচাই॥
মনে করি ন'দে যুড়ি হোক মোর হিয়া।
বেড়ান গৌরাঙ্গ তাতে পদ পসারিয়া॥

নাগরী বলিতেন,—

বলুক বলুক লোকে গৌর-কলঙ্কিনী।
ধিক্ যারা কুল রাখে কুলের কামিনী॥

যে কুলে গৌর-প্রাপ্তিতে বাধা দেয়, সে ছার কুলে ধিক্, আর গৌরকে ছাড়িয়া যে কুলকামিনী কুল রাখিতে চায়, সে রমণীকে শত ধিক্। এখন দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু!

নাগরীগণ এইরূপে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগতা হইলেন। কারণ, তাঁহারা দেখিলেন, এহেন রূপের নাগর রসের সাগর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটই নিত্য বিরাজ করেন, তিনিই এই রসময় বিগ্রহের নিত্য সঙ্গ পাইতে পরিপূর্ণ অধিকারিণী। সুতরাং শ্রীমতীর অনুগতা হইলে, তাঁহারাও শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গসুখ আস্বাদন করিতে পারিবেন। দলে দলে নাগরীবৃন্দ তাই শ্রীশচীমা'র বাড়ী আসিতে লাগিলেন, স্নেহের আধার শচীমাও সকলকে আদর সোহাগ করিতেন, এবং সকলকে তাঁহার বধূমাতার সঙ্গিনী করিয়া দিতেন।

নবদ্বীপ-দেবীগণের প্রথমতঃ পরকীয়া রতি সঞ্জাত হইল, কারণ তাঁহারা পরনারী—গুরুজনের ভয়ে ভীত। গৌরনাগরবরকে না পাইয়া বিরলে বসিয়া কাঁদিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবে এই গুরুজনগণের হৃদয় শুদ্ধ করিলেন। তাঁহারা অকপট চিত্তে নাগরীগণকে শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ী যাইতে অনুমতি দিলেন। শচীমা'র বাড়ী আসিয়া তাঁহাদের স্বকীয়া রতি সঞ্জাত হইল; কারণ, শ্রীগৌরাঙ্গ আর পর রহিলেন না। বিশেষতঃ যখন শ্রীমতীর সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অতি নিজজন হইয়া গেলেন। এখানে তাঁহাদের অবাধ গতি হইল। কিন্তু রসের পরিপুষ্টির জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর আবার পরকীয়া রতির অবতারণা করিলেন। তাঁহারা বড় সাধ করিয়া শ্রীমতীর কুঞ্জে আসিতেন। তাঁহাদের

বাসনা, শ্রীমতাকে সাজাইয়া পরাইয়া তাঁহাকে দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত রসবিলাস করাইয়া আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাসের কীর্ত্তনকুঞ্জে নিশি যাপন করিতেন। নাগরীগণ শ্রীমতীকে লইয়া উৎকণ্ঠায় কাল কাটাইতেন। কোন দিন মিলন হইত, কোন দিন হইত না। শ্রীগৌরাঙ্গ আপন হইয়া পর হইলেন! এ পরকীয়া রতির গাম্ভীর্য্য কত! শ্রীগৌরাঙ্গ হয় ত কোন দিন কীর্ত্তনে যাইতেন না, নাগরীগণের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীমতীর নিকট রহিতেন; কিন্তু ও দিকে আবার ভক্তগণের আকুল ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় দ্রব হইত। তিনি আর গৃহে স্থির থাকিতে পারিতেন না। কীর্ত্তনে চলিয়া যাইতেন। কোন দিন হয়ত প্রভুর কীর্ত্তনে যাইতে বিলম্ব দেখিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তন লইয়া প্রভুর আঙ্গিনায় আসিতেন। প্রভু তখন নাগরীগণের সুখ ভঙ্গ করিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। কোন দিন ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাসের বাড়ী চলিয়া যাইতেন। আবার কোন দিন ভক্তগণ কিছুকাল কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গসুখ আস্বাদন করিয়া স্ব স্ব আলয়ে যাইতেন, এবং নাগরীগণকেও প্রভুর সঙ্গসুখ আস্বাদন করিতে অবসর দিতেন। এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া কীর্ত্তন-বিলাস ও নাগরীগণকে লইয়া রস-বিলাস করিলেন।

যমুনা পুলিনে রাস বিলাসাদি
যেরূপ করিল শ্যাম।
সেইরূপ গোরা সুরধুনী তীরে
রচিল রসের ধাম॥